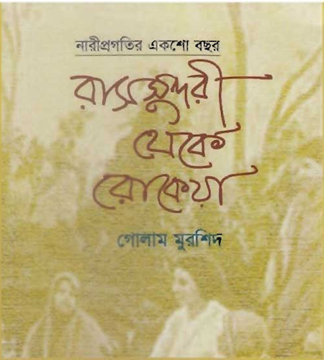
নারীপ্রগতির একশো বছর

রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া

গোলাম মুরশিদ

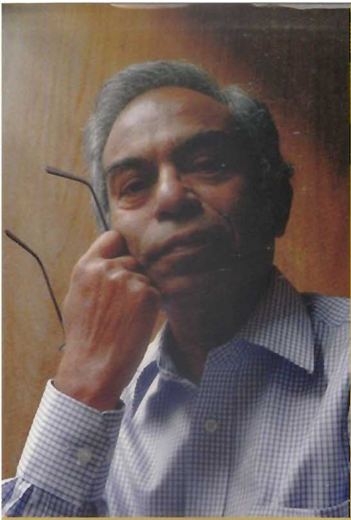


একুশ শতকের বাংলাদেশে নারী আর পর্দার আড়ালে লুকিয়ে নেই। তাকে দেখা যায় জনজীবনের সর্বত্রই। তার সামাজিক মর্যাদা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ঘরের বাইরে। সেখানে সে ছোটোবড়ো নানা পদে অধিষ্ঠিত – ঝাড়ুদারনি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত। স্কুলের শিক্ষিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা; কেরানি থেকে বিচারপতি পর্যন্ত। লেখাপড়ায় সে এগিয়ে গেছে ছেলেদের প্রায় পিছনে ফেলে। হিমালয় থেকে আরম্ভ করে অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে বাঙালি নারী।

কিন্তু দেড় শো বছর আগেও মেয়েদের জন্যে লেখাপড়া, ঘরের চার দেয়ালের বাইরে যাওয়া, গাড়িতে চড়া, জুতো পায়ে দেওয়া, দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করা অথবা কথা বলা ছিলো একেবারে নিষিদ্ধ। পুরুষ-শাসিত বাঙালি সমাজে নারীরা তখন ছিলো একটা জন্তুর মতো। তার ভূমিকা ছিলো একের ভিতরে পাঁচ – একই সঙ্গে সে ছিলো রাঁধুনি, পরিচারিকা, আয়া, সন্তানের মা এবং শয্যাসঙ্গিনী।

তারপর দেড় শো বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে সেই অবস্থার। কিন্তু কী করে? কাদের চেষ্টায়? কোন নারীরা প্রথমে পথ দেখিয়েছিলেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার? মাত্র দেড় শো বছরে এতো বড়ো সামাজিক পরিবর্তন কী করে সম্ভব হলো?

এই গ্রন্থে সেই কথাই লেখা হয়েছে, কয়েকজন নারীর দৃষ্টান্ত দিয়ে। রাসসুন্দরী দেবী অবিশ্বাস্যভাবে নিজে নিজে লেখাপড়া শিখে বাঙালিদের মধ্যে সবার আগে আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী সবার আড়ালে স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখে তিনখানা বই লিখেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বাঙালি নারীদের শাড়ি পরা শিখিয়েছিলেন। নিজে গিয়েছিলেন বড়োলাটের সঙ্গে ডিনার করতে। কৃষ্ণভাবিনী দাস বিলেতে গিয়ে একটি চমৎকার ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীদের জন্যে পুরুষের সমান অধিকার এবং মর্যাদার দাবি তুলেছিলেন। মোট কথা, ইতিহাস রচনা করেছিলেন তাঁরা।



আলোকচিত্র : ইফতিখার ওয়াহিদ ইফতি

তাঁর *রিল্যাক্টেন্ট ডেবিউট্যান্ট* (১৯৮২) গ্রন্থ লিখে গোলাম মুরশিদ দক্ষিণ এশিয়ার মানবী ইতিহাসে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সে গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো *সংকোচের বিহ্বলতা* নামে। তারপরও বাঙালি নারীদের নিয়ে লিখেছেন আরও দুটি বই – *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* আর *নারী ধর্ম ইত্যাদি*। কেবল নারীদের ইতিহাস নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস – নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। তাঁর মাইকেল-জীবনী – *আশার ছলনে ভুলি* – সমগ্র বাংলা জীবনী সাহিত্যের একটা মাইল-ফলক বলে বিবেচিত হয়েছে। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*; *কালাপানির হাতছানি : বিলেতে বাঙালির ইতিহাস*; *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*; *কালান্তরে বাংলা গদ্য*; *সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*; *The Heart of a Rebel Poet*; *Lured by Hope: a Biography of Michael Madhusudan Dutt* ইত্যাদি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নারীপ্রগতির একশো বছর

রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া

নারীপ্রগতির একশো বছর

রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া

গোলাম মুরশিদ

অবসর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩
প্রথম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
অবসর সংস্করণ
বইমেলা ২০১৩

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

প্রচ্ছদলিপি
এ কে আজাদ উজ্জ্বল

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 -984 - 8796 - 47 - 4

Rasasundari Theke Rokeya : Naripragatir Eksho Bachar (A Century of Women's Progress : from Rasasundari to Rokeya) by Dr. Ghulam Murshid
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Enlarged & Scoured Abosar Edition : Book Fair 2013. Price : Taka 325.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Online Distributor : www.rokomari.com, www.akhoni.com
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com

উৎসর্গ

হাসান আজিজুল হক
সনৎকুমার সাহা

মুখবন্ধ

মুদ্রণের অভাবে কিছুকাল অদৃশ্য থাকার পর রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া আবার আত্মপ্রকাশ করলো। এ গ্রন্থে যে-পথিকৃৎ নারীদের কথা প্রথম সংস্করণে লিখেছিলাম, তাঁরা নারীপ্রগতির ইতিহাস খানিকটা তুলে ধরলেও, তার বাইরেও বঙ্গদেশের মানবী-ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সেসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত নারীদের অবদানের কথা আমরা আলোচনা করিনি। যেমন, কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কথা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী বসুর সঙ্গে একত্রে এনট্র্যান্স, এফএ এবং বিএ পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। আর বাঙালি নারীদের মধ্যে সবার আগে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। ডাক্তার হতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে তাঁকে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছিলো। বাঙালি নারীরা যে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাতে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমি এবারের সংস্করণেও তাঁকে নিয়ে লিখতে পারিনি। সরলা দেবী বিএ পাশ করে সুদূর হায়দারাবাদে গিয়ে চাকরি করেছিলেন। পরিবারের চাপের মুখেও তাঁদের পছন্দ অনুসারে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন। পরবর্তী কোনো কোনো নারী হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাঁর কথা ভেবে সাহস সঞ্চার করেছিলেন। এ গ্রন্থে তাঁর কথাও নেই। প্রথম মহিলা কবির কথা নেই; প্রথম মহিলা নাট্যকারের কথা নেই; প্রথম চাকুরের কথা নেই; প্রথম ঘোড়ায় চড়া নারীর কথা নেই, নেই অনেকের কথাই। কিন্তু কিছু ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেছি।

যে-নারীরা পরিবার, সমাজ এবং লোকাচারকে অস্বীকার করে কালাপানি পার হয়ে ইউরোপে গিয়েছিলেন, তাঁরা বাঙালি নারীদের প্রগতির ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, তাঁদের সাহসের প্রমাণ দিয়ে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অন্য নারীরা নিজেরা বিলেতে যেতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এবারের সংস্করণে সেই সাহসী নারীদের কয়েকজনের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া, শত শত পুরুষের ঘৃণা এবং প্রলোভনের দৃষ্টি এড়িয়ে যে-মহীয়সী নারীরা নাটকের মঞ্চে উঠে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের কথাও লেখা হয়েছে এই সংস্করণে। এই নারীরা অন্য নারীদের পর্দা ভাঙার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। কথাবার্তায়, চলাফেরায়,

পোশাকে–আশাকে, নাচেগানে সংস্কৃতিবান হওয়ারও দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। বাঙালি নারীরা যে আজ আধুনিকা হতে পেরেছেন, তার পেছনে এই নারীদের অবদান আছে নিঃসন্দেহে।

এই দুটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করা ছাড়াও, গোটা বইটাই নতুন করে লিখেছি। নতুন তথ্য ছাড়াও এতে আছে নতুন বিশ্লেষণ।

যত্ন করে এই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করার জন্যে আলমগীর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

গোলাম মুরশিদ
লন্ডন
২৫ ডিসেম্বর ২০১২

সূচিপত্র

নারীপ্রগতির একশো বছর

রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া

পটভূমি

মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর রীতি বঙ্গদেশে, তথা গোটা ভারতবর্ষে কোনো কালেই বিশেষ জোরালো ছিলো না। নিজেদের কলঙ্ক ঢাকার জন্যে গার্গী কি মৈত্রেয়ীর মতো দু চারজন বিদুষীর কথা বারবার উল্লেখ করা হয় ঠিকই; কিন্তু তাঁরা দু চারজনই—নিতান্তই ব্যতিক্রম। মহিলারা লেখাপড়া জানবেন অথবা সংগীতের মতো কোনো গুণাবলি আয়ত্ত করবেন—সাধারণভাবে এটা প্রত্যাশিত ছিলো না। গুরুত্বপূর্ণ কোনো অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক ভূমিকা তাঁরা পালন করবেন—সেটা তো নয়ই। তবে ব্রিটিশ যুগের আগে পুরুষদের লেখাপড়ার হারও যে খুব বেশি ছিলো, তা নয়। লেখাপড়া যেটুকু প্রচলিত ছিলো, তা প্রায় একচেটিয়া ছিলো ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর বৈদ্যদের মধ্যে। মুসলমানদের মধ্যে কারা লেখাপড়া করতেন, তা বলা আরও মুশকিল। বোধ হয় কেবল মোল্লামুনশি আর রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই ধর্মীয় ভাষা ছাড়া অন্য কিছু পড়তেন। তখনকার বঙ্গদেশের, তথা ভারতবর্ষের, সমাজ বহু শতাব্দী ধরে সামান্যই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলো। সেকালে প্রযুক্তি বিদ্যার নিত্যনতুন উন্নতির ফলে জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিলো না। শত শত বছর ধরে উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থাও থাকতো অপরিবর্তনীয়। মোগলরা এসেছিলেন ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। তাঁরা হয়তো তাঁদের সঙ্গে নতুন কোনো পদ্ধতি নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেননি, বা করতে পারেননি। তাঁরা ভারতবর্ষের উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থাকেই ন্যূনতম সংস্কারের মাধ্যমে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিলো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও। এ সময়ে বহু শতাব্দীর বিনিময় অর্থনীতিও রাতারাতি মুদ্রা অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছিলো মানুষের জীবনযাত্রায়। এর জন্যে দায়ী নগরায়ণ এবং নতুন কাঠামোবিশিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ইংরেজ রাজত্বে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র, ব্যবসার পণ্য, এমন কি, ঝোঁক পর্যন্ত পাল্টে যায়। মুর্শিদাবাদ থেকে বাজারটা হঠাৎ কলকাতায় স্থানান্তরিত

হওয়ায়, যাঁরা এ যাবৎ প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁদের জায়গায় দেখা দিলেন নতুন একদল ব্যবসায়ী—যাঁরা আগে থেকেই কলকাতায় কম্পানির লোকদের সঙ্গে কমবেশি একটা যোগাযোগের সূত্র রচনা করেছিলেন। এই লোকেরা বেশির ভাগই ছিলেন কুলগত বৃত্তিহীন উচ্চবর্ণের হিন্দু, আর সেই সঙ্গে সামান্য কিছু বসাক, বণিক ইত্যাদি পদবি বিশিষ্ট নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী হিন্দু। নতুন যুগে এঁরাই প্রাধান্য লাভ করলেন। কোনো কুলগত বৃত্তি না থাকায়, এঁরা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য, দালালি, মুৎসুদ্দিগিরি এবং বেনিয়ানগিরিকেই তাঁদের নতুন বৃত্তি হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। পুরোনো পণ্যের ব্যবসা ছেড়ে যাঁরা দ্রুত রেশম, নীল, লবণ অথবা আফিমের ব্যবসা ধরতে পারলেন, তাঁরাও নতুন অবস্থার ফয়দা নিতে সমর্থ হলেন। আর লাভবান হলেন নগদ টাকা হাতে থাকায় যাঁরা জমিদারির পালা বদলের সময়ে নিলামে জমিদারি কিনে নতুন বাবু হলেন। এ ছাড়া, রাজভাষা বদলে যাওয়ায়ও, পুরোনো গোষ্ঠীর জায়গায় নতুন একদল লোক আকস্মিকভাবেই নিজেদের দেখতে পেলেন সুবিধাজনক অবস্থানে। এমন কি, যাঁরা নতুন ভাষা জানতেন না, কিন্তু তা শেখার ব্যাপারে খোলা মন নিয়ে এগিয়ে গেলেন, তাঁরাও ছিটেফোঁটা ইংরেজি শিখে অচিরেই লাভবান হলেন। মোট কথা, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ইংরেজদের কল্যাণে বঙ্গদেশে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিলো। যাঁরা এই পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করতে তৈরি ছিলেন, তাঁরা এন্তার ইহলৌকিক লাভ করেছিলেন। এবং তাঁদের সাফল্য আরও অনেক বেশি সংখ্যক লোককে এই দিকেই আকৃষ্ট করেছিলো। অপর পক্ষে, যাঁরা পুরোনোকে আঁকড়ে থাকলেন এবং পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে ব্যর্থ হলেন, অথবা স্বাগত জানাতে দ্বিধা করে দেরি করে ফেললেন—তাঁরা এই নতুন কালের ভোজে পিছিয়ে পড়লেন।

নতুন সুযোগসুবিধার দ্বার খুলে যায় কলকাতার মতো শহরে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শহর, বিশেষ করে কলকাতা, বিবেচিত হয় সৌভাগ্যের কেন্দ্র হিশেবে। এবং গ্রাম থেকে শহরে ভিড় জমায় ভাগ্যান্বেষী বহু মানুষ। শহরে যাওয়া, শিক্ষা নেওয়া ইত্যাদি উন্নতির নতুন অগ্রাধিকার হিশেবে দেখা দিলো। আলোচ্য কালে যাঁরা কলকাতায় বাস করতেন অথবা কলকাতায় এসেছিলেন, ব্যবসা করে অথবা শিক্ষা গ্রহণ করে স্বভাবতই তাঁরা সুযোগটা পেয়েছিলেন একটু বেশি পরিমাণে। তারপর একবার লাভবান হয়ে তাঁরা আবার তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কলকাতায় নিয়ে আসছিলেন গ্রাম থেকে। এমনিভাবে নতুন যুগের সুযোগসুবিধা ধীরে ধীরে নিচের দিকে চুইয়ে নামতে থাকে। এবং কয়েক দশকের মধ্যে ব্যবসায়ী বাবুদের এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হলো। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথমে সীমাবদ্ধ ছিলো কলকাতা থেকে হাঁটা পথের মধ্যে। তারপর সেই বৃত্তটাই ক্রমশ দূর থেকে আরও দূরে সম্প্রসারিত হয়েছিলো। সে জন্যেই কলকাতা থেকে, এবং সীমিত মাত্রায় অন্যান্য প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে, যাঁদের

অবস্থান যতো দূরে ছিলো, তাঁদের উন্নতি হলো ততো দেরিতে। ইংরেজ রাজত্বের ফলে সমাজ বদলে গেলো ঠিকই কিন্তু সমানভাবে বদলালো না, অথবা সর্বত্র একই সঙ্গে বদলালো না।

কেবল শহর থেকে দূরত্ব নয়, আরও একটা বড়ো কারণ ছিলো যার জন্যে পরিবর্তন সমান তালে অথবা সমান মাত্রায় এলো না। এই কারণ দৃঢ়ভাবে যুক্ত ছিলো এদেশের সমাজের একেবারে গভীরে। ভারতবর্ষে মানুষের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতো তাদের কুলগত বৃত্তি দিয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং বর্ণাশ্রমকেও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই ব্যবস্থাকে একটা চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছিলো। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হবার পর যাঁদের সুনির্দিষ্ট কোনো কুলগত বৃত্তি ছিলো না, তাঁরা অনেকেই নতুন সুযোগ নেবার জন্যে প্রথমেই আগ্রহ দেখান। কিন্তু পুরুত, কর্মকার, নাপিত, কুমোর, জেলে কি চাষীদের মতো যাঁদের কোনো স্থায়ী আয় হবার মতো উপযোগী কুলগত বৃত্তি ছিলো, তাঁরা নতুন সুযোগসুবিধা নেবার জন্যে কলকাতা অথবা অন্য কোনো নগরকেন্দ্রের দিকে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছোটেননি। এর ফলে পরবর্তীতে অন্তত এক শতাব্দী ধরে উচ্চবর্ণের স্বল্প সংখ্যক হিন্দুই ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে থাকলেন বিপুল সংখ্যক মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তুলনায়। আবার শিক্ষায় এগিয়ে থাকার ফলে তাঁরাই গড়ে তুললেন তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভদ্র গোছের চাকরিবাকরি প্রায় সবই থাকলো কুলগত বৃত্তিহীন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন, বসু, মিত্র, ঘোষ ইত্যাদি পদবি বিশিষ্ট গোটা বঙ্গদেশের শতকরা পাঁচ ভাগের চেয়েও কম লোকের একচেটিয়া। এমন কি নগদ অর্থের মালিক হওয়ায় ছোটোখাটো জমিদারিও চলে গিয়েছিলো তাঁদের হাতে। অপর পক্ষে, মুসলমানরা অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাঁদের পুরোনো কুলগত বৃত্তি নিয়েই দীর্ঘদিন পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকলেন। এবং একবার পিছিয়ে পড়ার পর অসমান দৌড়ে তাঁরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকলেন। (বিস্তারিত তথ্য আমার *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ* [২য় সং; ঢাকা: বাংলা অ্যাকাডেমি, ১৯৯৩] গ্রন্থে পাওয়া যাবে।) মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে মহিলারা যে লেখাপড়ার দিকে অনেকটা দেরি করে এগিয়ে এলেন, তারও প্রধান কারণ এটাই।

এই পরিবেশে প্রথমে কলকাতায় এবং ছ সাত দশক পরে অন্যান্য নগরকেন্দ্রে ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করে। এই শিক্ষার পেছনে অনুপ্রেরণাটা ছিলো প্রধানত অর্থনৈতিক। তবে মুখ্য অথবা আদি লক্ষ্য যাই হোক, ইংরেজি শেখার ফলে তার প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকলো না, জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং মনোভাবও দ্রুত বদলে যেতে আরম্ভ করলো। এবং তার প্রভাবে জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। বিবাহ, মহিলা এবং দাম্পত্যসম্পর্ক সম্বন্ধে এমন চেতনা জন্ম নিলো, এমন অভাব বোধ দেখা দিলো, যার অস্তিত্ব পূর্বপুরুষরা কখনো অনুভব করেননি।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গদেশে নারীদের সামাজিক মর্যাদা যে উন্নত ছিলো না, এ বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ধারণা সবারই আছে। কিন্তু নারীদের মর্যাদা কতোটা নিচুতে ছিলো, সে বিষয়ে সবার জ্ঞান সমান নয়। তখনকার অত্যাচারিত কোনো মহিলা এ সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ রেখে না-গেলেও, পুরুষদের রচনা থেকেও মহিলাদের হীনাবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জানা যায়। ১৮১৯ সালে রামমোহন রায়ের মতো আধুনিক মানুষ যেমন সমাজে মহিলাদের অতি নিম্ন মর্যাদার উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন :

> বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে,...

রামমোহন আরও উল্লেখ করেন যে, এসব সত্ত্বেও, স্ত্রীর ওপর স্বামী নানা ধরনের অত্যাচার করেন। প্রাত্যহিক জীবনে মহিলাদের ক্রীতদাসীর মতো দৈহিক শ্রম করতে হয়—কেবল এ কথা বলেই রামমোহন তখনকার পুরুষ সমাজের সমালোচনা করেননি। মহিলাদের মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কেও পুরুষ সমাজে যে নিতান্ত নিচু ধারণা ছিলো, তিনি তারও সমালোচনা করেন। মেয়েদের মনন শক্তি অথবা মেধা নেই—এটাই ছিলো সেকালের জনপ্রিয় বিশ্বাস। কিন্তু নতুন যুগের শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি আঠারো শতকের ইংল্যান্ডীয় যুক্তিবাদ এবং উদারনৈতিকতার মূল্যবোধ আয়ত্ত করেছিলেন। সে জন্যে তাঁর পক্ষে মহিলাদের সম্পর্কে প্রচলিত পুরোনো মূল্যবোধ মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই এই জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি। প্রশ্ন করলেন : স্ত্রীলোকের মেধা আছে কিনা তা কি কোনো দিন পরীক্ষা করে দেখেছেন? সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের এ রচনা অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী। ব্যতিক্রমধর্মী, কেননা তখনকার পুরুষ সমাজ নারীদের হীন দশা সম্পর্কে সজাগ অথবা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। অপর পক্ষে, নবলব্ধ উদারতা এবং যুক্তিবাদের পথ ধরেই হয়তো রামমোহন এবং তাঁর বন্ধুরা মেয়েদের দুর্গতি সম্পর্কে কমবেশি সচেতন হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে যে জিনিশগুলো রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন, স্বদেশের তুলনায় সে দেশে মহিলাদের তুলনামূলক উন্নত অবস্থা তাদের অন্যতম।

মেয়েদের বিষয়ে তাঁর মূল্যবোধ যে বদলে গিয়েছিলো, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যেখানটাতে সন্দেহ জাগে, সে তাঁর বিশ্বাস আর বাস্তব জীবনের মধ্য কতোটা সামঞ্জস্য ছিলো, সে ব্যাপারে। সমাজে এবং

সংসারে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তিনি কি নিজের ঘরে কোনো রকমের সংস্কার করতে পেরেছিলেন? অথবা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা, সুখদুঃখ ভাগ করে নিতে পেরেছিলেন? পারেননি, সেটা বোধ হয় প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়। এবং সেই লোকসান কি তাঁকে কম হতাশ করেছে?

বস্তুত, রামমোহন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলেন না। এ ছিলো সেকালের সদ্যশিক্ষিত সমাজেরই স্ববিরোধ। এই হতাশা এবং দুঃখবোধ থেকেই বস্তুত গত শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে ভদ্রলোক সমাজ অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো। কেবল যে রামমোহন অথবা তাঁর প্রগতিশীল বন্ধুরা—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখের মতো প্রগতিশীল লোকেরাই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন, তাই নয়; রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল মানুষও স্ত্রীশিক্ষার ভালো দিকগুলো সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের নির্দেশ এবং আনুকূল্যেই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন ১৮১৯ সালে।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তরুণদের মধ্যে এই সচেতনতা ছিলো প্রবলতর। ১৮৩০-এর দশকে যে তরুণরা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখেছিলেন, অথবা ঐ কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীতে বঙ্গদেশের তথাকথিত নবজাগরণ অথবা রেনেসান্সে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু গোড়াতে তাঁরা প্রবল ঘৃণা এবং প্রতিবাদী মনোভাব দেখিয়েছিলেন ধর্মীয় আচার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং চিরাচরিত বহু মূল্যবোধের প্রতি। বিবাহ ছিলো এমনি একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁদের কারো পক্ষেই, অভিভাবকের কথা অনুযায়ী আট/ন বছরের একটি বালিকাকে বিয়ে করা সহজ কাজ ছিলো না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দু কলেজের ১৮ বছর বয়স্ক একটি উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে তাঁর পিতা অপূর্ব সুন্দরী একটি জমিদার কন্যার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন ১৮৪২ সালের শেষ দিকে। সনাতন সমাজের অন্য সবার মতোই তাতে সে তরুণের খুশি হবারই কথা ছিলো। কিন্তু নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত, রোম্যানটিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত এই তরুণ খুশি হওয়া তো দূরের কথা, কোথায় পালিয়ে এই *ভয়ানক* অবস্থা থেকে রক্ষা পাবেন, তাই বুঝতে পারছিলেন না। সত্যি বলতে কি, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, কলকাতার কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ঘটনা ঘটার আগেই তিনি একটি রচনা লিখেও মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নতুন মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। মেয়েদের অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে একটা জাতি যে উন্নতির পথে যেতে পারে না, সেটাই তাঁর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। কিন্তু যা তখন লেখেননি, অথচ অতো বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমাণ করলেন, তা হলো : নিজে শিক্ষিত একটি মেয়েকে পছন্দ না করে তিনি বিয়ে করতে পারেন না। এই তরুণ—মধুসূদন দত্তের মধ্যে এই যে পরিবর্তন এসেছিলো, সেটা কেবল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এমনটা মনে করার কারণ নেই। ধর্ম ত্যাগ করার

মতো সাহস না হলেও, বিবাহ এবং স্ত্রী সম্পর্কে এ চেতনাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি পুরুষের মনে দানা বেঁধেছিলো।

এই যে মেয়েদের সম্পর্কে, স্ত্রী সম্পর্কে নতুন সচেতনতার উন্মেষ এই অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা সমসাময়িক পত্রপত্রিকা অথবা রচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৩৮ সালের *সমাচার দর্পণে* একটি লেখায় নব্য শিক্ষিতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

অন্য একজন লেখক আরও স্পষ্ট ভাষায় কমবেশি একই মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন : শিক্ষিত সম্প্রদায় একটি বিষয়ে খুব অসুখী—এঁরা ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে সুখ এবং মানসিক শান্তি পান না। যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করে *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকা লিখেছিলো : ছেলেদের শিক্ষা দিও না, তা হলে মেয়েদের শিক্ষা দেবারও দরকার হবে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখতে পাবো, এর অর্ধ শতাব্দী পরেও, সমাজের কোনো কোনো অংশে অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হয়নি, বেগম রোকেয়া তা লক্ষ্য করেছিলেন। স্বামী–স্ত্রীর এই বিষম উন্নতি এবং তার ফলে সংসারে যে অশান্তি দেখা দিয়েছিলো, জুতসই উপমা দিয়ে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : একটা গাড়ির দুটো চাকা সমান না হলে সে গাড়ি যেমন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না, পুরুষ এবং মহিলাদের অসমান অগ্রগতির ফলেও সংসারে তেমনি অনাসৃষ্টি হয়েছে। কৌতুক এবং বিদ্রূপে শাণিত ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে অশিক্ষিত স্ত্রীর মানসিক ব্যবধান কতো দুস্তর। এবং তার ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক কী দারুণ অসুখের উৎস হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের এক অংশে সচেতনতা জেগে উঠলেও, মহিলাদের শিক্ষা এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সেকালের ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধিতা ছিলো সুতীব্র। বর্তমান গ্রন্থে যে অসামান্য নারীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের কথা পড়ার সময়ে দেখা যাবে, তাঁদের সবারই প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং দুস্তর অসুবিধার মুখেই লেখাপড়া শিখতে হয়েছিলো। বিশেষ করে রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী আর বেগম রোকেয়ার কথা পড়ার সময়ে আমরা দেখতে পাবো, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধিতা কী প্রচণ্ড এবং ব্যাপক ছিলো। সে জন্যেই, সরকারি আনুকূল্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বেথুন স্কুল দীর্ঘদিন পর্যন্ত খুব সীমিত সাফল্যই লাভ করেছিলো। হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো যাঁরা সে স্কুলে কন্যা দিয়েছিলেন, সম্ভাব্য অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁদের কেউ কেউ পুলিশ ডাকতেও বাধ্য হয়েছিলেন। যে ঈশ্বর গুপ্ত ভুসি পেলেই খুশি হবেন, ঘুসি খেলে বাঁচবেন না বলে অংশত ব্যঙ্গ করে, অংশত গুরুত্বের সঙ্গে অনুগত ব্রিটিশ প্রজার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, তিনিও বেথুন স্কুল চালু হবার পর তার প্রতি বিরোধিতা

প্রকাশ না করে পারেননি। এ থেকেও প্রমাণ মেলে, যাঁরা ইংরেজ আমলের এবং ইংরেজি শিক্ষার সুফলভোগী হয়েছিলেন, তাঁরাও স্ত্রীশিক্ষার নামে কী বিচলিত বোধ করতেন। তা ছাড়া, সচেতনতা ছড়িয়ে পড়লেও, গত শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ আদৌ প্রশস্ত ছিলো না। সে অবকাঠামোই তখনো তৈরি হয়নি। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং তা পরিচালনা করা অত্যন্ত শক্ত কাজ ছিলো। সে স্কুলের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা জোগাড় করাও ছিলো দুঃসাধ্য। মোট কথা, স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করতে এবং মহিলাদের পক্ষে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে লাভবান হতে অনেকটা সময়ই লেগে গিয়েছিলো।

তিন

স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের তখন যেসব অন্তরায় ছিলো, ঐতিহ্যিক সমাজের প্রতিকূল মনোভাবকেই বোধ হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল বলে গণ্য করা যায়। তবে মেয়েরা যে চিরকাল অন্তঃপুরে বন্দী থাকতেন, তাঁদের যে কোথাও যাবার অনুমতি ছিলো না; দিনের বেলায় কোনো পুরুষের, এমন কি, স্বামীর সঙ্গেও দেখা করার রীতি ছিলো না—এও স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের প্রতি কিছু কম বাধা ছিলো না। বস্তুত, স্ত্রীশিক্ষা এবং মেয়েদের অবরোধ মোচনের প্রশ্নদুটি ছিলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেকালে অবরোধ অথবা পর্দা প্রথা বলতে কী বোঝা যেতো, রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং বেগম রোকেয়া তার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলো পড়ার সময়েই এই প্রথার কঠোরতা এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানতে পাবো। মেয়েদের তখন কেবল পুরুষদের সঙ্গেই নয়, পর্দা পালন করতে হতো শাশুড়ি এবং এ জাতীয় অন্য মহিলাদের সঙ্গেও। হিন্দু সমাজে মেয়েদের অবরোধ পালন করতে হতো সাত/আট বছরের সময়ে বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই। আর মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের বন্দিত্ব আরম্ভ হতো আরও আগে থেকে। ফলে, যদি ধরেও নিই যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের অন্যান্য সুযোগ ছিলো, তবু এতো অল্প বয়স থেকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হবার ফলে তেমন পরিবারের মেয়েদেরও বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখার কোনো উপায় ছিলো না। বস্তুত, মেয়েদের শিক্ষা, উন্নতি এবং আধুনিকতার পূর্বশর্ত হিশেবে প্রথমেই প্রয়োজন ছিলো তাঁদের অবরোধ মোচনের। এবং গোড়ার দিকে অবরোধ মোচনকেই মেয়েদের স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হতো। যদিও অবরোধ মোচন করলেই, একজন মহিলা স্বাধীনতা লাভ করেন না—স্বাধীনতা অবরোধ মোচনের তুলনায় অনেক ব্যাপক একটা ধারণা, এটা তখনকার চিন্তকরা খুব তলিয়ে দেখেননি। তাঁরা আসলে অবরোধ মোচনকেই স্বাধীনতার সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা যতোই সীমিত হোক, এই তথাকথিত "স্বাধীনতা"র ধারণা ঠিক কখন বাঙালি সমাজে দানা বাঁধতে থাকে? নিচের আলোচনায় আমরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

স্ত্রীস্বাধীনতা, নারীমুক্তি ইত্যাদি শব্দ এবং নারীদের অগ্রগতি সম্পর্কিত ধারণা মোটেই দেশের মাটিতে প্রোথিত ছিলো না। বস্তুত, এসব শব্দ এবং ধারণা বাংলা ভাষায় গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে আদৌ ছিলো না। ধারণা হিশেবে "স্ত্রীস্বাধীনতা" বঙ্গদেশে ঠিক কখন অঙ্কুরিত হয়, এবং *স্ত্রীস্বাধীনতা* জাতীয় শব্দাদি ঠিক কখন প্রথম ব্যবহৃত হয়, তা গবেষণার বিষয়। তা ছাড়া, মহিলারা ঠিক কোন সময়ে এ ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং *স্ত্রীস্বাধীনতা* বলতে প্রথম দিকের মহিলারা নিজেরা ঠিক কী বুঝতেন, তাও তলিয়ে দেখার বিষয়। তবে মহিলাদের নিজেদের লেখা তেমন বেশি না থাকায়, সমাজের উপর তলার বিচ্ছিন্ন কিছু মহিলার চিন্তাভাবনার কথা অস্পষ্টভাবে জানতে পারলেও, এ বিষয়ে ব্যাপক ইতিহাস উদ্ঘাটন করা এখন প্রায় অসম্ভব। বস্তুত, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের বিষয়ে গের্ড লার্নার ভাষায়, এখন কিছু "কম্পেনসেটরি" ইতিহাস লেখা হলেও, স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে গোড়ার দিকের মহিলাদের, বিশেষ করে বৃহত্তর সমাজের মহিলাদের ধারণা কী ছিলো, তা আমাদের প্রায় অজ্ঞাত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ১৮৩০-এর দশকে ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকে সমাজে মহিলাদের অত্যন্ত নিচু অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁরা *জ্ঞানান্বেষণের* পাতায় যখন মহিলাদের সমানাধিকারের কথা লেখেন, তখন ধারণা হিশেবে তা ছিলো নিতান্তই অভিনব। এ ধারণার দ্বারা সে সময়ে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁদের হাতে গোনা যেতো। বৃহত্তর সমাজ এই যুবকদের রচনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। তবে তাঁদের এসব রচনা যে কারো চোখে পড়েনি, তা নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের সমকালীন একটি রচনা (১৮৪২) থেকে দেখা যায়, তিনি অন্তত তরুণদের বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি লেখেন, "ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন, যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন...।" "স্বাধীনা হউন" কথাটার ব্যাখ্যা দিয়ে, তিনি বলেন, "অর্থাৎ সর্বত্র ভোজন, সর্বত্র গমন, সকলের সহিত কথোপকথন করুন।" তরুণরা এটা চাইলেও, অক্ষয় দত্ত নিজে এর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। পরের বাক্যেই তিনি তাই লিখেছেন, এ ধরনের স্বাধীনতার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাই বলে যুক্তিবাদী অক্ষয় দত্ত মহিলাদের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখতে চাননি। তাঁদের স্বাধীনতা দেবার পূর্বশর্ত হিশেবে তিনি বরং তাঁদের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপণ করতে চান।

কয়েক বছর পরে, ১৮৪৬ সালে, তিনি যখন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* নারীদের অবস্থাকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ এবং দাসীদের সঙ্গে তুলনা করেন, তখনো *স্ত্রীস্বাধীনতা* শব্দটি তিনি চিন্তা করেননি। বস্তুত, *বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (১৮৫১-৫২) এবং *ধর্মনীতিতেও* (১৮৫৬) এ শব্দের ব্যবহার অনুপস্থিত। মনে হয় নারীদের প্রতি সে যুগের তুলনায় তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও, এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সচেতন হলেও, "স্ত্রীস্বাধীনতা" সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিলো না।

অক্ষয় দত্তের সমকালে আরও কেউ কেউ সীমিত অর্থে মহিলাদের স্বাধীনতার কথা লিখেছিলেন। *দুর্জনদমনমহানবমী* পত্রিকার রক্ষণশীল সম্পাদক মহিলাদের *স্বাধীনা* হবার কথা লিখেছেন বিদ্রূপ করে (১৮৪৭)। *সম্বাদ ভাস্কর* পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য "হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান" শীর্ষক এক সংবাদে এ শব্দের ব্যবহার করেন ১৮৪৯ সালে। এ সংবাদ তিনি প্রকাশ করেন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে এবং মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েই। তবে সমাসবদ্ধ *স্ত্রীস্বাধীনতা* পদ তিনি ব্যবহার করেননি। কয়েক বছর পরে (১৮৫৭) রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন এবং সমকালীন মহিলাদের তুলনা প্রসঙ্গে "স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ও বিদ্যাশিক্ষার আধিক্য" বিষয়ে লেখেন। সেকালে বিদ্যাসাগরের মতো নারীদরদী সমাজসংস্কারক বাঙালি সমাজে কেউই ছিলেন না। ১৮৫০-এর দশকে নারীদের বিষয়ে একাধিক রচনা প্রকাশ করলেও, কোথাও তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার কথা লেখেননি। মহিলাদের প্রতি সহমর্মিতা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার ধারণা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়, এ থেকে তা বেশ বোঝা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাও এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে। তিনিও নারীদরদী ছিলেন, কিন্তু ধারণা হিশেবে স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থন করতে পারেননি।

বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালের অগস্ট মাসে। গোড়া থেকেই এ পত্রিকায় মেয়েদের অগ্রগতির জন্যে জোরালো যুক্তি দেখানো হয়। বস্তুত, এ পত্রিকার উদ্দেশ্যই ছিলো বামাগণের উন্নতি। এতে বলা হয় যে, এ দেশের নারীরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, অশিক্ষিত এবং পুরোপুরি পুরুষদের মুখাপেক্ষী। সমাজের অগ্রগতি এবং নারীজীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে নারীদের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা আবশ্যক, এ দাবি এ পত্রিকায় বারবার উত্থাপিত হয়। সম্ভবত এ পত্রিকাতেই প্রথম বারের মতো *স্ত্রীস্বাধীনতা* শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৬৬ সালে *ধর্মতত্ত্বে* প্রকাশিত একটি রচনায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ দশকের শেষে *স্ত্রীস্বাধীনতা* নামক পুস্তিকায় মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানান।

স্ত্রীস্বাধীনতা সমাসবদ্ধ পদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় ১৮৭২ সাল থেকে। উপাসনার সময়ে মহিলারা পর্দার আড়ালে বসবেন, না পর্দার বাইরে পুরুষদের সঙ্গে বসবেন, এ নিয়ে এ বছরের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের দুই উপদলের মধ্যে কোন্দল আরম্ভ হয়। এই কোন্দলকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় যে রচনাগুলো প্রকাশিত হয়, তাতে *স্ত্রীস্বাধীনতা* পদটি বারবার ব্যবহৃত হয়। "প্রগতিশীল" ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের *ধর্মতত্ত্ব* এবং *বামাবোধিনী পত্রিকা*য়ই নয়, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, মধ্যস্থ* ইত্যাদি পত্রিকায়ও এ সময়ে এই পদটি ব্যবহৃত হতে থাকে। দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগির, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যেহেতু মেয়েদের পর্দার বাইরে বসার দাবিকে সমর্থন করেন, সে কারণে তাঁদের দলের জনপ্রিয় নাম হয় *স্ত্রীস্বাধীনতা দল*। (অবশ্য *হালিসহর পত্রিকা* ব্যঙ্গ করে কেশব সেনের দলকে *বক্তৃতামূলক* এবং দুর্গামোহন দাসের দলকে

স্ত্রীসর্বস্ব বলে ব্যঙ্গ করে। *মধ্যস্থ* এদের নাম দেয় যথাক্রমে *উন্নতিশীল* ও *বেড়ে উন্নতিশীল*।)

কিন্তু নাম যাই হোক, ধারণা হিশেবে স্ত্রীস্বাধীনতা তখন অত্যন্ত সীমিত অর্থে প্রচলিত ছিলো। অবরোধ মোচন করে প্রকাশ্য স্থানে গমন, পুরুষদের সঙ্গে কথোপকথন, শিক্ষা দান, স্বাধীনভাবে ধর্মপালন ইত্যাদিকে তখন স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হতো। ১৮৬৬ সালে মেরি কার্পেন্টারের সংবর্ধনা সভায় নব্যশিক্ষিত এবং *প্রগতিশীল* ব্রাহ্মরা তাঁদের স্ত্রীদের স্বাধীনতার যে মহড়া দেন, তা থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের মনে এক ধরনের ধারণা দানা বাঁধছিলো। সেই সংবর্ধনা সভায় তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং আলাপ করতে উৎসাহিত করেন। মহিলাদের সম্বোধন করে তাঁদের একজন বলেন,

> ভগিনীগণ! আপনাদের স্বামীরা যদি আপনাদের মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনারা সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাঁহাদের নীচতাকে অতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার হার তাহা কণ্ঠদেশে পুনর্বার পরিধান করুন।

অন্য একজন বলেন,

> আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে তোমরা দূর কর। তোমরা জড় বস্তু নও, পশু নও যে, স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে।...আমাদিগের ন্যায় তোমাদিগেরও চিন্তা ও কার্য্যসকল বিষয়ে তুল্য স্বাধীনতা আছে। ...আমরা তোমাদিগের মত চলিতে পারি না এবং তোমরাও শুদ্ধ আমাদিগের আদেশে চলিতে পার না।

এই উভয় উক্তি থেকে পুরুষদের আন্তরিকতা এবং মহিলাদের প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় সহানুভূতি প্রকাশ পেলেও, স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে তাঁরা কী বোঝাচ্ছিলেন, তা ঠিক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেন, তা আরও অস্পষ্ট। তিনি বলেন,

> যাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিতেছেন তাঁহাদিগের জানা কর্তব্য যে, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হওয়া অর্থাৎ ধর্ম্মপথে চলাই স্বাধীনতা। স্বীয় ইচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিলে স্বেচ্ছাচারী হওয়া হয়, ...কেহ যেন স্বাধীনতা লইতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ না করেন।

এখানে স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রায় হেঁয়ালি বললেই চলে। ধর্মভাবনায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৈপ্লবিক হলেও, মহিলাদের স্বাধীনতা দেবার প্রশ্নে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন বলে ওপরের মন্তব্য থেকে অন্তত মনে করা শক্ত। বরং এখানে তাঁর যে সতর্কতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে প্রায় স্বাধীনতাবিরোধী বলেই মনে হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মীয় নেতা কেশব সেনও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ সতর্কতা এবং স্ববিরোধ প্রকাশ করেছিলেন।

তবে দ্বিধা, বিতর্ক এবং সংশয়ের মধ্যেও, স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রগতিবাদীদের ধারণা বেশি কাল ধোঁয়াটে ছিলো না। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৈলাসবাসিনী দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবো, তাঁর *বিশ্বশোভা* গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে

অবোধবন্ধু পত্রিকা পুরুষ এবং মহিলাদের মননশীলতায় তারতম্য না করার জন্যে যুক্তি দেখিয়েছিলো :

> আজিকালি ইউরোপ ও আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির সমকক্ষতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক। আমরা মনে করি যে, অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম, অনিত্য, আগন্তুক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক।

পত্রিকার সম্পাদক সেকালের বিচারে এতো প্রগতিশীল বক্তব্য রেখেছিলেন যে, তিনি এ কথা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, নাকি গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমরা পরে দেখতে পাবো, *অবোধবন্ধু পত্রিকা* প্রকাশিত হয়েছিলো কৈলাসবাসিনী দেবীর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের প্রেস থেকে এবং সম্ভবত তাঁর অর্থানুকূল্যে। সুতরাং এ যে বিদ্রূপ করে বলা নয়, সেটা এক রকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কেবল তাই নয়, এক শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁর মন্তব্য বাংলাদেশ অথবা পশ্চিম বঙ্গের সমাজে এখনো পুরোপুরি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজে প্রায় দৈববাণীর মতো সত্য বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।

স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে পুরুষদের মধ্যে প্রথমে যে নীহারিকাবৎ এবং খণ্ডিত সংজ্ঞা ছিলো, তা যখন ধীরে ধীরে স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে, তখন মহিলাদের নিজেদের মধ্যেও স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। তবে সে ধারণা যে পুরোপুরি নিজস্ব, তা নয়। সত্যি বলতে কি, পুরুষপ্রধান এবং পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের চিন্তাও পুরুষ প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যদি অপ্রচলিত এবং অপ্রতুল হয়। এ জন্যেই, অত্যাচার যতোই মর্মান্তিক হোক এবং সামাজিক মর্যাদা যতোই নগণ্য হোক, সেকালের বাঙালি মহিলারা তাকেই স্বাভাবিক মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অনেকের মধ্যেই হয়তো ক্ষোভ ছিলো, যদিও তার কোনো লিখিত প্রমাণ তাঁরা রেখে যাননি। তবে এ বিষয়ে সরাসরি সাক্ষ্য রেখে না-গেলেও, স্ত্রীশিক্ষার সামান্য বিকাশ এবং নগরায়ণসহ অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে বাঙালি মহিলারা গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতনতা লাভ করতে আরম্ভ করেছিলেন—সেটা তাঁদের রচনায় পরোক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে (১৮৬৫) এ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, কমবয়সী বাঙালি মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের একটা আকাঙ্ক্ষা যেন জেগে উঠেছে। নিজে এটা সমর্থন না করলেও, তিনি উল্লেখ করেন যে, নব্যশিক্ষিত মহিলারা তখন যুক্তি দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই এক বিধাতার সৃষ্টি এবং সে কারণে উভয়ের অধিকার সমান, এবং তাঁদের অধিকার সমান বলে সংসারের কাজও পুরুষ এবং মহিলাদের সমান ভাগ করে নেওয়া উচিত।

কৈলাসবাসিনীর এই মন্তব্য থেকে এ সাক্ষ্য পেলেও, তিনি যাঁদের সমালোচনা করেছিলেন, সেই তথাকথিত নব্যমহিলারা নিজেরা এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। সংসারে নারীর ভূমিকা কী—সে সম্পর্কেও তাঁদের মতামত জানার উপায় নেই। বরং তখন যাঁদের রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেসব লেখা থেকে যাঁদের মতামত জানা যায়, তাঁদের মোটেই কৈলাসবাসিনীর বিবরণ অনুযায়ী সমানাধিকারবাদী বলে মনে হয় না। তবে তাঁরা আগের তুলনায় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের মধ্যে বোধ হয় লক্ষ্মীমণি দেবীই সবার আগে সরাসরি স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে একটি রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত এই লেখাটির নাম "পরাধীনতা কি কষ্ট"। এতে তিনি যা বলেন, সংক্ষেপে তা হলো : পরাধীন স্ত্রীর দুঃখ ও যাতনা অপরিসীম। তাকে জীবন যাপন করতে হয় পশুর মতো। স্বামী তথা পুরুষদের তোষামোদ করে বেঁচে থাকা যথার্থই কষ্টকর। মেয়েদের হীনদশার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, দেশাচারই এর জন্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী। লক্ষ্মীমণির এই প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অবরুদ্ধ এবং স্বামীর মুখাপেক্ষী স্ত্রীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকে যা স্পষ্ট বোঝা যায় না, তা হলো, স্বাধীনতা বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চান।

এ বিষয়ে "বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা"র বক্তব্য (১৮৭১) বরং তুলনায় খানিকটা পরিষ্কার। হয়তো শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের স্ত্রী হিশেবেই তাঁর এ সম্পর্কে ধারণা অতোটা স্পষ্টতা লাভ করেছিলো। তিনি বলেন, দেশাচার এমন পক্ষপাতদুষ্ট যে, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে গিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে এক সঙ্গে উপাসনা করারও উপায় নেই। এমন কি, বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে, তাও দোষ বলে গণ্য হয়। অথচ, তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, স্বাধীনতা না-থাকায় বঙ্গমহিলারা জড় পদার্থের মতো। তাঁরা না কোনো ভালো স্থান দেখতে পান, না শুনতে পান কোনো সাধুজনের বাণী। তাঁর মতে, ইংরেজ মহিলাদের তুলনায় দেশীয় মহিলাদের যে এক শতাংশও গুণ নেই, তার কারণ স্বাধীনতার অভাব। বোঝা যায়, বোয়ালিয়ার এই মহিলা বাইরে গমন, সবার সঙ্গে উপাসনায় মিলিত হওয়া, অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ, আরও বেশি অধিকার ইত্যাদিকেই স্ত্রীস্বাধীনতার অত্যাবশ্যক উপাদান হিশেবে বিবেচনা করেছিলেন।

মহিলাদের বাইরে যাবার অধিকার না-থাকার প্রশ্নটি সমকালীন অন্য একজন লেখিকা উত্থাপন করেছিলেন অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন (১৮৭৫) :

> স্ত্রীলোকের কিছুই দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শুনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিলাম না।

গঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণের পর মহিলারা যে তা দেখতে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন, অন্তত আরও দুজন মহিলার লেখা থেকে তার প্রমাণ পেয়েছি। কৈলাসবাসিনী এর উল্লেখ করেছিলেন। আর অন্যজন এই সেতু দেখতে না-পাওয়ার

জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে যা বিশেষ নজরে পড়ে, তা হলো : সেতু দেখতে না পাওয়ার চেয়েও, মহিলা হওয়ার ফলেই যে তিনি সেতু দেখতে পাননি— এটাই তাঁর বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছিলো। এবং এ থেকে বোঝা যায়, নির্যাতিত নারীসমাজের সদস্য হিশেবে তিনি নিজে খানিকটা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

আসলে প্রাত্যহিক জীবনের যেসব সীমাবদ্ধতা নব্যশিক্ষিত তরুণীদের সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছিলো, সে সম্পর্কেই তাঁদের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্ণতর সংজ্ঞা তাঁদের তেমন ভাবিত করেনি। তা ছাড়া, যে ধরনের শিক্ষা থাকলে এ বিষয়ে তাঁরা ভাবতে পারতেন, তাও তাঁদের তেমন ছিলো না। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের মাধ্যমে হোক, অথবা পাশ্চাত্য জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হেতু হোক, যাঁদের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা তৈরি হবার মতো অনুকূল অবস্থা ছিলো, ১৮৭০-এর দশকে, এমন কি, তার পরের দশকে, এ বিষয়ে তাঁরা কেউ তেমনি কিছু লিখেছেন বলে আমার চোখে পড়েনি। তরু এবং অরু দত্ত দু বোন ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো কিছু ভেবে থাকলেও, তেমন কিছু লেখেননি। ১৮৭১ সালে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইংল্যান্ডে গিয়ে আট মাস কাটিয়ে আসেন। সেখানে প্রধানত ইউনিটারিয়ানদের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর স্বামীও তরুণ ব্রাহ্মদের স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে কোথাও কিছু লিখেছিলেন বলে আমার জানা নেই।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেখতে পাবো, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইংরেজ মহিলাদের এবং তাঁর স্বামীর কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা না হলেও, সে যুগের তুলনায় খুব ভালো শিক্ষা, বিশেষ করে বিদগ্ধ হয়ে ওঠার শিক্ষা পেয়েছিলেন। নিজে তিনি ইংরেজি এবং বাংলা বহু বই পড়েন। তা ছাড়া, স্বামীর উৎসাহে তিনি স্বাধীনভাবে ভাবতে এবং স্বাধীনতার কথা ভাবতে শেখেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সন্তানদের নিয়ে ইংল্যান্ডে যান এবং বছর আড়াই ইংল্যান্ডে আর কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে দেশে ফিরে আসেন। সেকালের একজন ইংরেজি শিক্ষিত অত্যাধুনিক মহিলা স্বাধীনতা সম্পর্কে কী ভাবতেন, তাঁর রচনা থেকে হয়তো তা জানা যেতো। এবং তিনি লিখতেনও—১৮৭১ সালে তাঁর প্রথম রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। স্ত্রীস্বাধীনতা এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে ঐতিহ্যিক মনোভাব ছিলো, অসম্ভব নয় যে, তা-ই হয়তো তাঁরও মনে দৃঢ়মূল ছিলো। ১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে প্রকাশিত তাঁর কোনো কোনো লেখা থেকে সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীলতাই বরং প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৮০-র দশকে ইংরেজি শিক্ষিত মহিলা হিশেবে যাঁরা তখনকার সমাজে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিলেন—চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগির প্রমুখ, তাঁরা ছিলেন হয়

প্রগতিশীল সাধারণ ব্রাহ্ম নয়তো দেশীয় ধর্মের বন্ধন–কাটানো দেশীয় খ্রিস্টান। আশ্চর্যের বিষয়, এঁরাও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেননি। আসলে পুঁথিগত বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও এবং সেই সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতিতে অনৈতিহ্যিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত স্বাধীনতার ধারণা হয়তো তাঁদের ছিলো না। অথবা এমনও হতে পারে যে, ঐতিহ্যিক সমাজকে চটিয়ে দেবার ভয়ে তা লেখার মতো সাহসও তাঁদের হয়নি। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখতে পাবো, কৃষ্ণভাবিনী দাসই প্রথম ইংল্যান্ডে বসে লেখা তাঁর একটি বই–এ স্ত্রীস্বাধীনতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা অতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিলো সম্ভবত প্রায় এক দশক ইংল্যান্ড বাস করার ফলে।

চার

স্ত্রীস্বাধীনতা ঠিক কী বস্তু—এ সম্পর্কে গত শতাব্দীর মহিলাদের ধারণা সুস্পষ্ট চেহারা নিতে পারেনি। তাঁরা কী করার স্বাধীনতা চান, অথবা কিসের হাত থেকে স্বাধীনতা চান—এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই খুব নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের শেষে এসে বাঙালি মহিলারা স্বাধীনতা বললে কিছু একটা বুঝতেন—লেখাপড়ার অধিকার, সীমিত অবরোধ, বিয়ের ব্যাপারে খানিকটা নিজেদের মতামত দেবার অধিকার, সংসার পরিচালনায় বর্ধিত অধিকার ইত্যাদি হয়তো এসবের মধ্যে ছিলো। বিয়ের ব্যাপারে সেকালে মহিলাদের সামান্যতম অধিকারও ছিলো না। তা ছাড়া, তাঁদের বিয়ে হতো এতো কম বয়সে যে, তাঁদের মতামত নেবারও কোনো অর্থ হতো না। পরবর্তীতে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার শিকার হতে হতো মহিলাদেরই। যে মহিলারা তখন নারীদের উন্নতির কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা এটা মেনে নিতে পারছিলেন না। সে জন্যে সেকালের মহিলা–সমাজ সংস্কারকরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের সংস্কার দরকার, এটা অনুভব করেছিলেন এবং বার বার তা উল্লেখও করেছিলেন।

মেয়েদের আর–একটা বড়ো দুঃখের কারণ ছিলো স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে। অনেক সময়েই একান্নবর্তী পরিবারে শাশুড়ি, ননদ এবং জাদের সঙ্গে সম্পর্ক সুখের হতো না। এই সমস্যা নিয়ে মহিলাদের মধ্যে অনেকেই তখন লিখেছিলেন। আমরা যাঁদের নিয়ে এই বই–এ আলোচনা করেছি, তাঁদের মধ্যেও রাসসুন্দরী দেবী আর কৈলাসবাসিনী দেবী এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। অন্যরাও এ ব্যাপারে একমত এবং এ সমস্যার কমবেশি উল্লেখ করেছেন।

তবে মহিলাদের কর্ম এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা কী হবে, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে অনেক বেশি। স্ত্রীশিক্ষা চেয়েছিলেন, সেটা পেয়েছেন; অবরোধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, সীমিত পরিমাণে তাও পেয়েছেন; এর পরে কী?—এটা শিক্ষিত এবং "স্বাধীন" অনেক মহিলাকেই ভাবিত করেছিলো। তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক

জন চাকরিবাকরি করেছেন অথবা চাকরি করা উচিত বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। কামিনী সেন অথবা সরলা দেবী জেদ করে চাকরি করার অনুমতি আদায় করেছিলেন তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। কিন্তু অনেকেই স্বামী অথবা পিতার অনুমতি পানওনি। এ সত্ত্বেও, চিন্তাধারা কোথাও থেমে থাকেনি। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বেগম রোকেয়ার মতো তরুণীকে দেখতে পাই, যিনি মেয়েদের উপার্জন করার অধিকার আছে, এ কথাই বলেননি, বরং মেয়েদের উপার্জন করা দরকার বলে অভিমত দিয়েছিলেন। মোট কথা, উনিশ শতকের গোড়াতে বাঙালি সমাজে মহিলাদের যে অবস্থান ছিলো, আর শতাব্দীর শেষে তাঁরা যেখানে গিয়ে উপনীত হন, তার মধ্যে আসমান–জমিন ফারাক না হোক, দুস্তর ব্যবধান ছিলো। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত মহিলাদের জীবনী এবং কর্ম থেকে নারীপ্রগতির এই এক শতাব্দীর ইতিহাসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মার্কস–এর কল্যাণে সমাজ পরিবর্তনের যেকোনো ঘটনাকে এখন আমরা সে সময়ের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে মহিলাদের মধ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিলো, তার সঙ্গে সে সময়কার সমাজ পরিবর্তনের সত্যি সত্যি গভীর যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু এ বই–এ যে মহিলাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা কী করে সমকালের অন্য মহিলাদের তুলনায় অতো বেশি এগিয়ে গেলেন, তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা মেলে না। যে পরিবেশে কৈলাসবাসিনী বড়ো হয়েছিলেন অথবা যে ধরনের পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো, তেমন দৃষ্টান্ত সে যুগে ভূরি ভূরি না থাকলেও নিশ্চয়ই আরও ছিলো। কেশব সেন কি শিবনাথ শাস্ত্রী কি তাঁদের স্ত্রীদের ভালো শিক্ষা দেবার জন্যে দুর্গাচরণ গুপ্তের চেয়ে কম চেষ্টা করেছিলেন? অথবা তাঁরা কি দুর্গাচরণের চেয়ে কম প্রগতিশীল ছিলেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও কৈলাসবাসিনী দেবী সেকালে অনেকজন তৈরি হননি। রাসসুন্দরী দেবীর দৃষ্টান্ত আরও প্রাসঙ্গিক। যে রকমের ঐতিহ্যিক পরিবারের সন্তান এবং বধূ ছিলেন তিনি, তাতে তাঁর পক্ষে প্রথম বাংলা আত্মজীবনী লিখতে পারা, অতি অসাধারণ—প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু কার্যকালে সেটাই ঘটেছিলো। তাঁর চেয়ে বেশি উদার হাওয়ায় যাঁরা মানুষ হয়েছিলেন অথবা বিয়ের পরে বাকি জীবন বাস করেছিলেন, তাঁরা কেউ প্রথম আত্মজীবনী লেখার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেননি।

বস্তুত, ব্যক্তির ভূমিকা গত শতাব্দীর নারী জাগরণের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো। যে কালে মহিলাদের বাইরে যাবার কোনো নিয়ম ছিলো না, তাঁরা যেতে পারতেন কেবল তাঁদের পিতৃগৃহে, সেই সময়ে কেশব সেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে এলেন। সমাজ তার নিন্দা করলো, তাঁর আত্মীয়রা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কিন্তু এ ঘটনা একেবারে ব্যর্থ হলো না। পরবর্তীতে অন্য কেউ তাঁর স্ত্রীকে যখন বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, এ ঘটনা তাঁকে কেবল অনুপ্রাণিত করেনি; তিনি এ থেকে সাহস এবং দৃষ্টান্ত উভয়ই পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃগৃহ থেকে স্ত্রীকে কর্মস্থানে নিয়ে যাবার যে ধারণা পেয়েছিলেন, তার অনেকটাই হয়তো ইংরেজ সমাজে তার বসবাসের ফল। কিন্তু তাতে কেশব সেনের আদৌ প্রভাব ছিলো না, তা বলা যায় না। কেশব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুরবাড়িতেই উঠেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত যাবার আগে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সাত–আট দশক কলকাতা ছিলো নিতান্তই পুরুষদের শহর। যাঁরা লেখাপড়া শিখতে কলকাতায় আসতেন এবং পরে চাকরি করার জন্যে কলকাতায়ই থেকে যেতেন, স্ত্রী এবং সন্তানদের তাঁরা রেখে আসতেন গ্রামে পৈতৃক বাড়িতেই। বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত মানুষও স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করেননি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তরুণদের অনেকেই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহ থেকে স্ত্রীদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কর্মস্থানে। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁর পরিবার, এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ, মনোমোহন ঘোষ এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্ত্রীদের বিলেত নিয়ে না–গেলে কৃষ্ণভাবিনী দেবীর পক্ষে বিলেত যাওয়া হয়তো অসম্ভবই হতো। বস্তুত, রাসসুন্দরী দেবী থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণভাবিনী দাস পর্যন্ত সনাতন মূল্যবোধ অস্বীকার করার এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য ঐতিহ্য গড়ে না–উঠলে, তা নির্মিত না হলে, যে–বেগম রোকেয়াকে প্রথম সত্যিকার নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করছি, তাঁর জন্ম সম্ভব হতো না। বাঙালি নারীমুক্তির ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা যথার্থই অসাধারণ অবদান রেখেছিলো।

পাঁচ

এ বই–এর প্রথম নারী রাসসুন্দরী আর সর্বশেষ চরিত্র বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার জন্ম রাসসুন্দরীর মাত্র সত্তর বছর পরে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজে মহিলাদের যে শোচনীয় অবস্থা ছিলো, রোকেয়া তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কেবল স্ত্রীশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা এবং কঠোর অবরোধ প্রথার নয়, সব কিছুতেই পুরুষদের তুলনায় সমাজে মহিলাদের অধিকার কতো কম ছিলো, তারই বিবরণ এবং বিশ্লেষণ পাই তাঁর লেখা থেকে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করি তিনি মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কিভাবে অন্তহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু রোকেয়ার জন্মের এক দশক আগে রাসসুন্দরী দেবী যখন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন, তখনই তিনি বলেছিলেন যে, সমাজে মেয়েদের স্থান তাঁর বাল্যকালের তুলনায় অনেকটা উন্নত হয়েছিলো। তাঁর বিবেচনায়, মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সমাজের মনোভাবে তখন কোনো বিরোধিতা নাকি আর লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো না। রাসসুন্দরী আর রোকেয়ার মধ্যে কার কথাকে তা হলে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করবো?

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও, আসলে তাঁদের দুজনের কথাই সমান বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তাঁরা যা বলেছেন তা আপেক্ষিক। রাসসুন্দরী যাকে দেখে

বলেছেন ভালো অবস্থা, রোকেয়ার দৃষ্টিতে তাই অতি শোচনীয়। এর কারণ নিহিত আছে তাঁদের পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমিতে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজে মেয়েদের যে-অধিকার ছিলো, দ্বিতীয় ভাগে তুলনামূলকভাবে তা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। রাসসুন্দরীর বাল্যকালে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে যে তীব্র বিরোধিতার মনোভাব প্রচলিত ছিলো, তা শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নমনীয় হয়ে ওঠে। এবং স্ত্রীশিক্ষা সীমিত পরিমাণে বিস্তারও লাভ করে। সে জন্যেই, রাসসুন্দরী তাঁর বাল্য এবং যৌবনকালের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অবস্থাকে অনেক সুখের বলে বিবেচনা করেন। অপর পক্ষে, রোকেয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন, ততো দিনে সমাজের এবং মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছিলো। কেবল যে সমাজের একটা বড়ো অংশে স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হচ্ছিলো, তাই নয়; অবরোধ, বিবাহ, মেয়েদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা ইত্যাদির ব্যাপারেও রক্ষণশীলতা কমে গিয়ে মনোভাব খানিকটা উদার হতে আরম্ভ করেছিলো। কিন্তু নতুন যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে রোকেয়া এই উদারতাকে যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারেননি। সুতরাং রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীর যে ইতিহাস তা মনোভাব পরিবর্তনের এবং উদারীকরণের ইতিহাস। এবং তাঁদের রচনার বিষয়বস্তুতেই নয়, তাঁদের মুখ্য বক্তব্য এবং রচনার ভঙ্গিতেও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট।

রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে মেয়েদের সকরুণ অবস্থার বর্ণনা দেন নিজের কথা বলতে গিয়ে। মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিলো তা তুলে ধরার, অথবা তার মাধ্যমে মহিলাদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সমাজ বিবেককে সচেতন করে তোলার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না। এমন কি, তিনি যখন তাঁর নিজের দুঃখের বর্ণনা দিয়েছেন, তখনো তার মধ্যে কোনো অভিযোগ অথবা তিক্ততা প্রকাশ পায়নি। প্রায় কৌতুকের সঙ্গেই সে বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রামের প্রায় অশিক্ষিত গৃহবধূ হয়েও তিনি আত্মজীবনী লেখার ধারণা এবং অনুপ্রেরণা কোথায় পান, তা বলা শক্ত। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনী সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা তাঁর সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনার লক্ষ্য নিয়ে লেখেননি—সেটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এক শতাব্দীতে বাঙালি মহিলাদের যে উন্নতি এবং অগ্রগতি হয়েছিলো, বর্তমান বই-এর ছ জন নারীর জীবন থেকে বস্তুত তার একটা ধারাবাহিক এবং ঘনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়।

রাসসুন্দরী দেবীর বাল্য এবং যৌবনে মহিলাদের অবরোধ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা নিয়ে তেমন বিতর্ক দেখা দেয়নি। তখন অনেক বেশি জরুরি বলে মনে করা হয়েছে মেয়েদের আদৌ লেখাপড়া শেখানো হবে কিনা, এই প্রশ্ন। বালিকাবধূ হিশেবে তিনি অসহায় বোধ করেছিলেন, তা না হলে বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের ছিলো। অংশত এ জন্যে এবং অংশত বিবাহের ফলে সেকালের নারীদের যে ভোগান্তি হতো, সে সম্পর্কে সচেতনতার অভাব থেকে রাসসুন্দরী বিবাহ সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। অবরোধ মোচন অথবা পরবর্তী কালে ব্যাপকতর যে

দাবি ওঠে স্বাধীনতার, সে সম্পর্কে তাঁর রচনায় কোনো ক্ষোভ অথবা অভিযোগ প্রকাশ পায়নি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট করে জানা যায়, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সে সময়ে সমাজের বিরোধিতা কতোটা প্রবল ছিলো, সে বিষয়ে। তা ছাড়া, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মহিলারা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে কী ভাবতেন, তারও সরাসরি বিবরণ মেলে তাঁর রচনা থেকে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের মনোভাব নমনীয় হতে থাকলেও, তা যে মোটেই লোপ পায়নি, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা থেকে। তাঁর জন্ম রাসসুন্দরীর তিন দশক পরে এবং কলকাতা নগরীতে অথবা তার কাছাকাছি। নগরায়ণ এবং সমাজ পরিবর্তনের ফলে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি প্রতিকূলতা খানিকটা কম লক্ষ্য করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাই, রাসসুন্দরী যে ধরনের বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কৈলাসবাসিনীও সেই একই ধরনের বিরোধিতা দেখতে পেয়েছিলেন। এই বিরোধিতা যে কেবল বাইরের, তা নয়, এটা প্রকৃতপক্ষে সমাজের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ছিলো। সে জন্যেই, কৈলাসবাসিনী নিজেও স্ত্রীশিক্ষাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এই আন্তরিক ঘৃণা সত্ত্বেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া শেখেন, সেটা নিতান্তই তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত স্বামীর জেদের মুখে। এখানটায় রাসসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর একটা মস্তো বড়ো পার্থক্য লক্ষ্য করি—রাসসুন্দরীর স্বামী তাঁকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেননি, এমন কি তিনি যে গোপনে গোপনে লেখাপড়া শিখছিলেন, সে খবরও তিনি রাখতেন না। কিন্তু পরের প্রজন্মের একজন ইংরেজি শিক্ষিত স্বামী কি করতেন অথবা করতে পারতেন, কৈলাসবাসিনীর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের নজির থেকে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

রাসসুন্দরীর তুলনায় কৈলাসবাসিনী দৃষ্টিপাতও করেছিলেন অনেক ব্যাপক একটা এলাকার দিকে। এক অর্থে রাসসুন্দরী ছিলেন কূপমণ্ডূকের মতো। নিজের সংসারের বাইরে বলতে গেলে তাকানইনি। বৃহত্তর সমাজ তাঁর রচনায় একেবারে অনুপস্থিত। অপর পক্ষে, কৈলাসবাসিনী নিজের সংসার নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেননি। অথবা কেবল শিক্ষা নিয়েও নয়। তাঁর মধ্যে যে সমাজ সচেতনতা লক্ষ্য করি, তা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ। হতে পারে, ১৮৫০-এর দশকে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত থেকে শুরু করে অনেকেই যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নসহ যে সচেতনতা দেখা দিয়েছিলো, কৈলাসবাসিনী তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে প্রভাবটা যেখান থেকেই আসুক, সমাজের নানা ব্যাধির স্বরূপ যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। নিজে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ কেন, কুলীন কায়স্থ না হওয়া সত্ত্বেও কৌলীন্য যে সমাজের একটা অংশকে ক্যান্সারের মতো একেবারে জীর্ণ করে দিচ্ছিলো, তিনি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাদের সমস্যা নিয়েও তিনি বিচার-বিবেচনা করেন। অবরোধ প্রথাকে তিনি এতোই মন্দ বলে গণ্য করেছেন যে, একে তিনি আদৌ হিন্দুদের প্রচলিত বলে জ্ঞান করতে পারেননি। এর জন্যে, কোনো প্রমাণ

ছাড়াই, দায়ী করেছেন মুসলমান রাজত্বকে। বালিকাবধূদের প্রতি সহানুভূতি বর্জিত আচরণ, বধূর সঙ্গে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের, বিশেষ করে শাশুড়ি-ননদের আচরণ ইত্যাদি অনেক কিছুর দিকেই তিনি নজর দিয়েছিলেন।

কৈলাসবাসিনীর সীমাবদ্ধতা অবশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অবরোধের কঠোরতা মোচন এবং বিবাহের ফলে মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রেই যে দুর্ভোগের শিকার হতে হয়—সেসব বিষয়ে যে ধরনের সংস্কার আবশ্যক, তিনি তার দাবি করলেও, জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্যে মেয়েদের যে অন্তঃপুরের চার দেয়ালের বাইরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের দরকার রয়েছে, এ কথা তিনি চিন্তা করেননি।

অন্তঃপুরের বাইরে যাবার তাগিদ লক্ষ্য করি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্যে। কৈলাসবাসিনীর স্বামী যেমন কৈলাসবাসিনীকে নিজে যত্ন করে, জেদ করে, লেগে থেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, জ্ঞানদার স্বামীও তেমনি জ্ঞানদাকে হাতে ধরে আলোর পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে দুর্গাচরণ গুপ্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য তেমন না থাকলেও মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ্য করি। দুর্গাচরণ ইংরেজি শিখেছিলেন সম্ভবত হিন্দু কলেজে। কলকাতায় তখন পর্যন্ত যেসব পাশ্চাত্য ভাবধারার ঢেউ এসে লেগেছিলো, তিনি তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার বেশি নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ লেখাপড়া শিখেছিলেন বিলেতে। তিনি জেমস এবং জন মিলের আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত। যাঁরা বলেছিলেন : একটা জাতি কতোটা উন্নত তা বোঝা যায় সে জাতির মহিলাদের অবস্থা থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েদের তুলনামূলকভাবে উন্নত অবস্থা এবং মর্যাদা লক্ষ্য করে। অতঃপর সারা জীবন তিনি তাঁর এই বিশ্বাসেরই প্রমাণ দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁকে স্বামী হিশেবে পেয়েছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত না-হলে কৈলাসবাসিনী দেবীর মতো মহিলার জন্ম তখন বঙ্গদেশে অসম্ভব ছিলো, এটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। রাসসুন্দরী দেবীর তুলনায় তিনি নিশ্চয়ই অনেক আধুনিক ছিলেন, কিন্তু *গোরার* মতো উপন্যাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের যে মহিলাদের দেখতে পাই, তাঁকে আদৌ তেমন মহিলা বলে আখ্যায়িত করতে পারিনে। পোশাক ও পরিচ্ছদ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এবং আচার আচরণের দিক দিয়ে যাকে আমরা আধুনিকা বলে বিবেচনা করি, কৈলাসবাসিনীকে তার একজন বলে শনাক্ত করা যায় না। কৈলাসবাসিনী দেবীর পরবর্তী যে প্রজন্মে বাঙালি মহিলারা অনেকটা আধুনিক বলে পরিচিত হয়েছিলেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সেই প্রজন্মের অগ্রদূত এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অবরোধ মোচন করে তিনি বোম্বাই যান ১৯৬৪ সালে। সদ্য শিকল কাটা পাখির মতো তখন তাঁর পক্ষে বাইরের সে সমাজে চলাফেরা করা সহজ হয়নি। কিন্তু সবই তিনি শিখেছিলেন। এবং দ্রুত আধুনিকা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মেরি কার্পেন্টার তাঁকে খুব কেতাদুরস্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন। গভর্নর জেনরেলের বাড়িতে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিমন্ত্রিত হয়ে

গিয়েছিলেন। তারপর বিলেত এবং ফ্রান্স ঘুরে এসে তিনি রীতিমতো তখনকার কলকাতার অত্যাধুনিক ইঙ্গ–বঙ্গ সমাজের মধ্যমণি হয়ে বসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও তার প্রমাণ রয়েছে।

সমসাময়িক নারীদের অনুকরণ এবং অনুসরণের জন্যে আধুনিকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি নগণ্য কোনো অবদান রাখেননি। তবে বঙ্গদেশের নারী প্রগতির ইতিহাসে তার চেয়েও বড়ো অবদান তাঁর ছিলো। বাঙালি মহিলারা যাতে একটা ভদ্র পোশাক পরে বাইরে যেতে পারেন, তিনি তার ব্যবস্থা করেছিলেন। শাড়ি পরার স্টাইলই নয়, শাড়ির সঙ্গে পেটিকোট এবং ব্লাউজ পরার যে রীতি তিনি প্রবর্তন করেন, পরবর্তীতে তা–ই বাঙালি মহিলাদের প্রামাণ্য পোশাকে পরিণত হয়। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে লক্ষ্য করবো, সেকালে স্ত্রীশিক্ষা এবং অবরোধ মোচনের প্রশ্ন দুটি ভদ্র পোশাকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলো। একটা ভদ্র পোশাক প্রবর্তন ছাড়া, মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেওয়া অথবা অন্তঃপুর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়া—কোনোটাই সম্ভব ছিলো না। সমাজ সংস্কার চেতনাও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবীর চেয়ে কম ছিলো না—যদিও তিনি কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে কৈলাসবাসিনীর মতো বই লেখেননি। বস্তুত, অবরোধ মোচন, পত্রিকা সম্পাদনা, মহিলাদের সংগঠন স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বাঙালি মহিলাদের কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, বঙ্গদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সর্বত্র সমান অথবা একই সময়ে হয়নি। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই সেটা প্রথম দিকে সীমিত ছিলো। মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিলেন অনেকটা পেছনে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের কোনো ঢেউ তাঁদের মধ্যে একেবারে লাগেনি, তা নয়। তারই প্রমাণ মেলে তাহেরন নেসার মধ্য দিয়ে। তাঁর পরিচয় অথবা পটভূমির কথা কিছুই আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁর একটি রচনা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক হিশেবে রয়ে গেছে। তখন যে মুসলমানরা, এমন কি, ব্যতিক্রম হিশেবে, দু–একজন মুসলমান মহিলাও, ধীরে ধীরে শিক্ষার দিকে সসংকোচে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তারই একটি বিরল দৃষ্টান্ত তিনি তাঁর রচনাটির মধ্যে রেখে গেছেন। বঙ্গদেশের দুটি প্রায় সমান সম্প্রদায়—হিন্দু এবং মুসলমান। কিন্তু মুসলমানদের নামে প্রকাশিত কোনো রচনা তখনকার পত্রপত্রিকায় অতিদুর্লভ। মুসলমান নামে সেকালের বঙ্গদেশে একটা সম্প্রদায় ছিলো অথবা মুসলমানদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়াই বস্তুত শক্ত। তাহেরন নেসার মতো দু–একটি দৃষ্টান্ত না থাকলে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা যদি বলতেন, বঙ্গদেশে মুসলমান মহিলাদের আবির্ভাব ঘটে বিংশ শতাব্দীতে, তা হলে তাঁদের খুব দায়ী করা যেতো না। তাহেরন নেসা নামটির সে জন্যেই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

তাহেরন নেসার রচনাটির আর একটি গুরুত্ব—মুসলমানদের পরিপ্রেক্ষিতে। যেকালের কথা আলোচনা করছি, মুসলমানরা তখনও দোভাষী পুঁথির রেশ কাটিয়ে

গদ্যের জগতে প্রবেশ করতে পারেননি। তাহেরন নেসা যখন বিশুদ্ধ গদ্যে তাঁর রচনা প্রকাশ করেন, তার চার বছর আগে মুসলমান পুরুষদের গদ্যে রচিত একটি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছিলো। চতুর্থ অধ্যায়ে এ নিয়ে আমরা আরও আলোচনা লক্ষ্য করবো। সে দিক দিয়ে তাহেরন নেসার একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের জন্যে তাঁর গুরুত্ব ভিন্ন কারণে—তাহেরন নেসার নাম বাদ দিয়ে হিন্দু মহিলাদের প্রগতির ইতিহাস হয়তো লেখা সম্ভব, কিন্তু সমগ্র বাঙালি মহিলাদের নয়।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে একটু আগেই যে লক্ষ্য করেছি, তিনি যতোটা আধুনিকা ছিলেন, ততোটা সমাজ সচেতন ছিলেন না। তিনি ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে প্রায় তিন বছর থেকে এসেছিলেন, কিন্তু সে দেশের সমাজে তিনি কী দেখে এসেছিলেন, বিশেষ করে নারীপ্রগতির বিষয়ে, সে সম্পর্কে স্বদেশের পুরুষ অথবা মহিলাদের অবহিত করার কোনো তাগিদ তিনি নিজের অন্তরে অনুভব করেননি। তাঁর স্মৃতিকথা পড়লেই বোঝা যায়, সে দেশের সমাজের সঙ্গে সারাক্ষণ তিনি নিজের দেশের সমাজের তুলনা করেননি, অথবা সে দেশের সমাজের ভালো জিনিশগুলো দিয়ে স্বদেশের মন্দ জিনিশগুলোর সংস্কারও করতে ব্যগ্র হননি। এ ব্যাপারে তাঁর একেবারে উল্টো কোটিতে যাঁর অবস্থান দেখি, তিনি হলেন কৃষ্ণভাবিনী দেবী। জ্ঞানদা দেবীর মতো তাঁর পটভূমি অতো অনুকূল ছিলো না। জন্মেছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। বিয়ে হয়েছিলো আধুনিক ব্রাহ্ম পরিবারে নয়—শিক্ষিত কিন্তু এক ঐতিহাসিক হিন্দু পরিবারে। এমন কি, তাঁর স্বামী খুব আধুনিক হলেও, নারীপ্রগতির দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অতোটা আধুনিক ছিলেন কিনা, হলপ করে তাও বলতে পারিনি।

বিয়ের পরে স্বামীর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভাবিনী ইংরেজি এবং বাংলা উভয়ই যত্নের সঙ্গে শিখেছিলেন। কিন্তু স্বামী দীর্ঘদিনের জন্যে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ায় তাঁর শিক্ষা কতোটা এগিয়েছিলো, বলা শক্ত। তিনি সত্যিকার শিক্ষা লাভ করেন স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানে প্রায় এক দশক বাস করার সময়ে। এ সময়ে তার স্বামীর কাছ থেকেই নয়, তিনি নিজেই প্রচুর অধ্যয়ন করেন। তা ছাড়া, তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাও ছিলো অসাধারণ। *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে সমাজ সম্পর্কে তাঁর যে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা সেকালের কোনো নারীর জন্যে কেন পুরুষের জন্যেও শ্লাঘার বিষয় হতে পারতো। কৃষ্ণভাবিনীর আগে অথবা তাঁর সমকালে যে বাঙালিরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথের য়োরোপ থেকে লেখা চিঠিপত্র ছাড়া অন্য কোনো রচনায় কৃষ্ণভাবিনীর মতো অতোটা সমাজ সচেতনতা, বিশেষ করে নারীসমাজ সম্পর্কে অতোটা পর্যবেক্ষণ দুর্লক্ষ্য। ইংল্যান্ডের রাজনীতি এবং সমাজ সম্পর্কে এ বই-এ তিনি মূল্যবান বহু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসা করেছিলেন সে দেশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর সমাজ ও পরিবারে নারীর স্থান সম্পর্কে। তিনি উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছেন, সে দেশের পরিবারে

নারীপুরুষের সম্পর্ক কতোটা বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সম্মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, সন্তানদের সঙ্গে পিতামাতার এবং ভাইবোনদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ। তিনি তারও বর্ণনা দিয়েছেন। বিলেতের সমাজের যে জিনিশগুলো তাঁর খারাপ লেগেছে, তার সমালোচনা করতে তিনি আদৌ কুণ্ঠিত বোধ করেননি, কিন্তু তাঁর রচনার আগাগোড়া যে ভাবটি প্রকাশিত তা হলো বিলেতের সমাজের ভালো জিনিশগুলো দিয়ে তাঁর নিজের সমাজের সংস্কার করে নেওয়া। *ক্যালকাটা রিভিয়ু পত্রিকা* যথার্থই তাঁর এ বই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলো (১৮৮৬) যে, এটি হলো বাংলা ভাষায় এ ধরনের বইগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

দেশে ফিরে কৃষ্ণভাবিনী আর পূর্ণাঙ্গ কোনো বই লেখেননি। কিন্তু বেশ কয়েকটি সাময়িকপত্রে অনেকগুলো রচনা প্রকাশ করেন। সবগুলোরই লক্ষ্য এক—স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীদের অধিকার বৃদ্ধি। য়োরোপে সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে, নারীদের অবস্থার উন্নতি তাতে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, এবং ভারতবর্ষকেও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হলে তার মহিলাদের অবস্থা উন্নত করতে হবে—বার বার তিনি এ কথাটা তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দেন। তা ছাড়া, বাস্তব জীবনে—তাঁর স্বামী এবং পুত্র আকস্মিকভাবে মারা যাবার পর তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং বিধবাদের দুর্দশা মোচনের জন্যে হাতে-কলমে যে কাজ আরম্ভ করেন, তাও প্রমাণ করে নারীমুক্তির প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি কতো আন্তরিক ছিলো। তবে এসব সত্ত্বেও, তিনি মেয়েদের উন্নতি এবং তাঁদের মুক্তির যে সংজ্ঞা দেন, তা মোটেই বৈপ্লবিক ছিলো না। বস্তুত, তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোশ করার একটা মনোভাব অনুপস্থিত নয়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ভালো গৃহিণী হয়ে উঠবেন, ভালোভাবে সন্তান লালন করবেন, পুরুষদের উন্নততর সঙ্গ দেবেন ইত্যাদি তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হলেও, ভদ্রঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি করে কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করবেন, এটাকে তিনি বাঞ্ছনীয় বলে ভাবতে পারেননি। ইংল্যান্ডের সমাজে মহিলাদের যে স্বাধীনতা দেখে তিনি অমন প্রশংসা করেছিলেন, তা আংশিক অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়া আসতে পারতো কিনা, বোঝাই যাচ্ছে, তিনি তা খতিয়ে দেখেননি।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়া নারীমুক্তি অসম্ভব—এ কথা বলার জন্যে আরও এক প্রজন্ম অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিলো। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেছিলেন বেগম রোকেয়া। আশ্চর্যের বিষয়, তুলনামূলকভাবে অনেক অনগ্রসর মুসলমান সমাজের একজন মহিলা এ কথা বলেছিলেন। তিনিও কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো প্রধানত স্বামীর কাছে সত্যিকার লেখাপড়া শেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ দাসের মতো রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেনও বিলেতে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে রোকেয়ার পরিবেশে রক্ষণশীলতা আরও কঠোর ছিলো বলেই ধারণা করি। তার মধ্যে তিনি কোথা থেকে এমন ঔদার্য এবং সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে এমন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা স্বীকরণ

করেছিলেন, সেটা অনুমানই করতে পারি, তার সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধ তিনি যেখান থেকেই পেয়ে থাকুন না কেন, নারীমুক্তি সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিলেন, সেটা ছিলো তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে আধুনিক।

তিনি মেয়েদের অবস্থার উন্নতি চেয়েছেন, কিন্তু কতোটা? এক কথায় তিনি তার উত্তর দিয়ে বলেছেন, একেবারে পুরুষের সমান। তিনি বলেছেন, উন্নতির মাত্রা কারো সঙ্গে তুলনা করে দেখাতে হবে। সে জন্যেই তিনি পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করছেন, নয়তো বলতেন অ্যাবসোলিউট উন্নতি। মেয়েদের কর্ম ভূমিকা সম্পর্কে তিনি ছিলেন ঐতিহ্যিক ধারণা থেকে একেবারে যোজন যোজন দূরে। তাঁর মতে, এমন কোনো কাজ নেই, যা মেয়েরা করতে পারেন না বা করবেন না। পুরুষরা ব্যবসা করতে পারলে মেয়েরাও ব্যবসা করতে পারবেন। পুরুষরা ব্যারিস্টার হতে পারলে মেয়েরাও নিশ্চয় ব্যারিস্টার হতে পারবেন। এমন কি, জমিতে গিয়ে মহিলারা চাষাবাদের কাজই বা করবেন না কেন? তাঁর বিবেচনায়, যে-কোনো কাজে মহিলারা পুরুষদের সমান তো বটেই, এমন কি, এমন দিনও আসতে পারে যখন মেয়েরাই পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচিত হতে পারেন। তাঁর কল্পনার নারীস্থানের নারীরা তাই যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে চিরকাল পুরুষরা যে কাজগুলো করে এসেছেন সেই কাজগুলো করেন, আর পুরুষরা বাড়িতে বসে ঘরের কাজ করেন।

রোকেয়া উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, মেয়েরা অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে স্বাবলম্বী হতে না পারলে সত্যিকার অর্থে কখনোই স্বাধীন হতে পারবেন না। সে জন্যে, তিনি তাঁদের অর্থনৈতিক ভূমিকার ওপর অতো জোর দিয়েছেন। এখানটাতে তাঁর পূর্ববর্তী মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। তাঁর আগের মহিলারা লেখাপড়া শিখে আরও ভালো স্ত্রী হবার প্রতি যতোটা ঝোঁক দিয়েছেন, তাঁদের স্বাধীনতার দিকে ততোটা নজর দেননি।

রোকেয়ার সঙ্গে আগেকার নারীপ্রগতির পথিকৃৎদের আর-একটি পার্থক্য, তাঁরা নারীদের উন্নতির কথা বললেও, নারী এবং পুরুষের একেবারে সমান অধিকারের কথা বলেননি। বলেননি, বিবাহিত শরিক নারীর স্বামী অর্থাৎ প্রভু নন, তাঁর জীবনসঙ্গী মাত্র। তিনি অর্ধাঙ্গিনী হলে, তথাকথিত "স্বামী" তাঁর অর্ধাঙ্গ, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বর্তমানে যাকে ফ্যামিনিজম বা নারীবাদ বলা হয়, তার মূল কথাটা প্রোলেটারিয়েটদের মতো নারীদের একটা নির্যাতিত এবং শোষিত শ্রেণী হিশেবে গণ্য করা। এই শতাব্দীর একেবারে গোড়াতে, তার মানে প্রায় এক শতাব্দী আগে লিখলেও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, পুরুষরা কিভাবে কতোগুলো সনাতন ভূমিকার সঙ্গে নারীদের শনাক্ত করে এবং অলৌকিকত্বের দোহাই দিয়ে ধর্মীয় বিধান রচনার মাধ্যমে নারীদের চিরকাল শোষণ করে এসেছেন। রোকেয়ার মধ্যে সেই শোষিত শ্রেণী সচেতনতা লক্ষ্য করি। যদ্দুর জানি, তাঁর আগে অন্য কোনো বাঙালি মহিলা—এবং

ভারতীয় মহিলা—এমন স্পষ্ট করে এই শ্রেণী শোষণের কথা বলেননি। সে দিক দিয়ে রোকেয়াই প্রথম বাঙালি ফেমিনিস্ট। এবং, সত্যি বলতে কি, তাঁর প্রায় এক শতাব্দী পরেও, তিনি যে সচেতনতার মাত্রা তাঁর রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, বাঙালি মহিলারা তার থেকে বেশি দূরে এগিয়ে যেতে পারেননি।

মহিলা হিশেবে রোকেয়ার আরও একটা অবদান তাঁর স্বরূপ নির্দেশে। তিনি যে কালে নিজেকে কেবল বাঙালি নয়, প্রাদেশিকতা এবং ধর্মের উর্ধ্বে উঠে একজন ভারতীয় বলে পরিচয় দেন, তখন অন্য কোনো মহিলা দূরে থাক, রবীন্দ্রনাথও সেই ঔদার্য প্রকাশ করতে পারে নি। রোকেয়ার আগেকার যে নারীদের নিয়ে এ বই-এ আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা কেউ তাঁদের স্বসম্প্রদায়ের বাইরে তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হননি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা প্রত্যাশিতও ছিলো না। কিন্তু রোকেয়া তা পেরেছিলেন এবং সে কারণে সেকালের বাঙালি নারীপ্রগতির ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তক।

অবশ্য এই পথিকৃৎ নারীদের অবদানের মূল্যায়ন করার সময়ে তাঁদের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে স্থাপন না-করলে তাঁদের মূল্যায়ন যথার্থ হবে না। সেকালের বঙ্গদেশের নারীপ্রগতি আন্দোলনের ধারণা এসেছিলো পাশ্চাত্য থেকে। সুতরাং আমাদের চিন্তকদের বক্তব্য কতোটা তাঁদের পড়া বই থেকে পাওয়া, কতোটা সত্যিকার উপলব্ধিজাত তা বিবেচনা করা দরকার। কতোগুলো ব্যাপারে বঙ্গদেশের তুলনায় ইংল্যান্ডে নারীপ্রগতির পথ অনেক সহজ ছিলো, বিশেষ করে লোকাচারের কথাই এখানে মনে করছি। রেনেসান্স পরবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং উদারনৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করা সেদেশে শক্ত ছিলো না। কিন্তু সেখানে প্রধান বাধাটা এসেছিলো রাজনৈতিক এবং চার্চের তরফ থেকে। ভারতবর্ষ এবং তখনকার অন্যান্য ইংরেজি উপনিবেশে সরকারি সংস্কার করা এ জন্যে তুলনায় সহজ হয়েছিলো। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অধিকার, ভোটাধিকার ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। অপর পক্ষে, বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে প্রধান বাধা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসেনি, তা এসেছিলো ধর্মীয় সংস্কার এবং লোকাচার থেকে। আর সেই সঙ্গে আমাদের চিন্তকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বদলে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার প্রতি অধিকতর প্রতিশ্রুতির ফলে। কে কতোটা সে বাধা অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন, তার ওপর তাঁদের প্রগতির মাত্রা নির্ভর করছিলো। স্বামীর ঔদার্য এবং আর্থিক/সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাসবাসিনী সেটা সীমিত মাত্রায় পেরেছিলেন। কিন্তু আইসিএস-এর স্ত্রীহিশেবে জ্ঞানদা দেবী তার পুরো সুযোগ নিতে পেরেছিলেন। উচ্চশিক্ষিত, বিলেতফেরত এবং বিত্তের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ এবং সাখাওয়াতের স্ত্রীরাও অংশত তার ফল লাভ করেছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাও এ ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

১

প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা

রাসসুন্দরী দেবী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিলো। কিন্তু তাই বলে বাংলা ভাষায় জীবনীসাহিত্য রচনার কোনো রীতি তখন তৈরি হয়নি। আর, আত্মজীবনী লেখার কথা কেউ সম্ভবত ভাবেনওনি; যদিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অথবা ভারতচন্দ্র রায়ের মতো কোনো কোনো কবি নিজেদের জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য দিয়েছেন অথবা মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সেকালের কবিরা নিজেদের লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রেও লক্ষ করি, কবিরা নিজের প্রেমকেও রাধাকৃষ্ণের ছদ্মবেশে প্রকাশ করতেন।

এই যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা অথবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য ব্যক্তির জীবনী নিয়ে আলোচনা না-করা, এ মনোভাবে বড়ো রকমের পরিবর্তন আসে উনিশ শতকে। তার প্রধান কারণ, ততোদিনে বাঙালি সমাজের একাংশ ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলো। জীবনী এবং আত্মজীবনী লেখার ঐতিহ্য অনেক আগেই গড়ে উঠেছিলো।[১] তা দিয়েই ধীরে ধীরে প্রভাবিত হয়েছিলেন ইংরেজিতে শিক্ষিত বাঙালিরা। তবে শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের আগে নয়। অন্তত তার আগে কেউ আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

বাঙালি লেখকরা কেন জীবনী অথবা আত্মজীবনীর দিকে আকৃষ্ট হলেন না, বলা শক্ত। অন্তত রামমোহন রায় একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লিখতে পারতেন। কিন্তু এতো লিখলেও তিনি নিজের কথা কোথাও কিছু লেখেননি। এমন কি, ইংরেজি সাহিত্যের বড়ো পণ্ডিত হলেও এবং নিজেকে বাঙালি না-বলে ইংরেজ হিশেবে পরিচিত হওয়ার বাসনা করলেও, মাইকেল মধুসূদন দত্তও নিজের জীবনী সম্পর্কে কিছু লেখেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, বঙ্কিমচন্দ্রও নন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একটি আত্মজীবনী লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত আগ্রহের অভাবেই লেখাটি বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। হতে পারে, বাঙালিদের মধ্যে নিজেদের কার্যকলাপ

এবং চিন্তাধারা প্রকাশের ইচ্ছা তখন তেমনভাবে দেখা দেয়নি। আত্মজীবনী পড়ার মতো পাঠকও সেকালে তৈরি হয়েছিলো কিনা, সন্দেহ করি।

খ্রিস্টানদের মধ্যে নিজের পাপ স্খালনের জন্যে কনফেশন অথবা পুরোহিতের কাছে স্বীকারোক্তি করার বিধান রয়েছে। আত্মজীবনী সেই কনফেশনেরই সম্প্রসারিত রূপ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় যে আত্মজীবনী লেখার ধারা প্রচলিত হলো, তাও হয়েছিলো খ্রিস্টানপ্রভাবিত পাপ–সচেতন ব্রাহ্মসমাজে। বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত নববিধান সমাজের ব্রাহ্মদের মধ্যে। সে জন্যেই ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীর লেখক কোনো ইংরেজি–প্রভাবিত নব্য বাঙালি ছিলেন না, প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন গ্রামের প্রায়–অশিক্ষিতা একজন মহিলা – রাসসুন্দরী দেবী।

এই অসাধারণ মহিলা নিজে তাঁর যে–জীবনী লিখে গেছেন, তারই ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। আশ্চর্যের বিষয় হলো : তাঁর সন্তানদের মধ্যে অন্তত একজন এবং নাতনীদের একজন সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। নাতনী তো রীতিমতো সাহিত্যিকই ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেউ তাঁর জীবনী রচনা করেননি। প্রসঙ্গত, সমাজ ও পরিবারে সেকালের বাঙালি মহিলাদের অবস্থান কেমন ছিলো, তাও দেখতে চেষ্টা করবো।

সেকালের বাঙালি মহিলাদের চিত্র পুনর্নির্মাণের জন্যে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী রীতিমতো অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ সমকালীন সমাজ–সংস্কারকরা যে–মহিলাদের স্বাধীন ও উন্নত করার যে–প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সেই মহিলারা রাসসুন্দরীর মতো গ্রামের অশিক্ষিত এবং/অথবা অর্ধশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন শহরের, বিশেষ করে কলকাতার শিক্ষিত ব্রাহ্ম অথবা হিন্দু মহিলা। খ্রিস্টান মহিলাও ছিলেন। গ্রামের ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারের মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিলো অথবা তাঁদের মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া কখন এবং কেমন করে লেগেছিলো, সে কথা জানতে হলে অবশ্যই রাসসুন্দরীর রচনার দিকে নজর দিতে হবে।

এক

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্বের যে–কোনো প্রতিভার মাপে অসামান্য ছিলো, তা বলা বাহুল্য; কিন্তু তাঁর সে প্রতিভা বিকাশের জন্যে তিনি যে–পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনুকূল পরিবেশের কথা কল্পনাও করা যায় না। ঠাকুরদাদা দ্বারকানাথ ভারতবর্ষের আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ; পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বড়ো জমিদার, ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক, এবং কলকাতার অভিজাতসমাজের অন্যতম প্রধান নেতা; বড়ো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি, দার্শনিক, সম্পাদক; মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রথম দেশীয় আইসিএস; আর–এক ভাই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেকালের নামকরা নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ এবং চিত্রশিল্পী; অন্যতম বড়ো বোন স্বর্ণকুমারী

সেকালের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত লেখিকা। রবীন্দ্রনাথের খেলার সাথী - জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীও ছিলেন সাহিত্যরসিক তথা সাহিত্যসমালোচক। সুতরাং এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে বিকশিত হওয়ার ব্যাপক সুযোগ পাবে, তা বলা বাহুল্য।

অপর পক্ষে, রাসসুন্দরী দেবীর পরিবেশ ছিলো খুবই প্রতিকূল। তিনি জন্মেছিলেন পাবনার একটি অজপাড়া গ্রাম - পোতাজিয়ার এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর পিতার নাম গবেষকরা খুঁজে বের করেছেন - পদ্মলোচন রায়। কিন্তু তিনি নিতান্ত সাধারণ পরিবারের একজন সাধারণ পিতা ছিলেন। গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোর কথা উল্লেখ করে রাসসুন্দরী নিজেই বলেছেন যে, তাঁদের পরিবার সেসব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তদুপরি, তাঁর পিতা যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর। এর পর তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন তাঁর খুড়োর অভিভাবকত্বে। তাঁর পিতার অবর্তমানে তাঁদের পরিবারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছিলো কিনা, সে সম্পর্কে রাসসুন্দরী কিছু উল্লেখ করেননি। দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাক অথবা নাই পাক, উন্নতির সুযোগ সংকুচিত হয়েছিলো বলে অনুমান করাই সঙ্গত।

দারিদ্র্যের চেয়েও রাসসুন্দরীর বিকাশের অনেক বড়ো বাধা ছিলো তাঁর সমাজ এবং সেকালের লোকাচার। তিনি যে নারী - এটাই তাঁর বড়ো অপরাধ। সেকালের সমাজে মহিলাদের স্থান যে খুব নিচুতে ছিলো, আত্মজীবনীর বহু জায়গাতেই তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। সবচেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, নারীদের লেখাপড়া শেখার আদৌ কোনো অধিকার ছিলো না। তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত থেকে এ অবস্থার একেবারে জীবন্ত চিত্র দেখা যায়।

তাঁদের বাড়িতে ছিলো এক মিশনারি মহিলার একটি পাঠশালা। ধারে-কাছের ছেলেরা সেখানে লেখাপড়া শিখতে যেতো, কিন্তু মেয়ে বলে রাসসুন্দরীর লেখাপড়া শেখার কোনো অধিকার ছিলো না। বারবার তিনি দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন, সাধারণ লোকেরা তখন নারীদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দেখাতো। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়; সংসারের অকল্যাণ হয়; তারা যেহেতু আয় করবে না, সুতরাং তাদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা অর্থহীন ইত্যাদি। সেকালের নারীদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'তখনকার মেয়েছেলেগুলা নিতান্ত হতভাগা প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হইবেক। বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারী বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া বৃদ্ধাঠাকুরানিরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন...'।[২] তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি। তবে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ভদ্রলোক সমাজের, বিশেষ করে শহরের, বিরোধিতা ধীরে ধীরে অনেক কমে আসছিলো। সে জন্যে রাসসুন্দরী বারবার নব্যকালের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক এসব বাধা ছাড়া, রাসসুন্দরীর চরিত্রেই একটি বড়ো বাধা ছিলো, যা তাকে দীর্ঘকাল লেখাপড়া থেকে সরিয়ে রেখেছিলো। লেখাপড়া শেখার গভীর আগ্রহ

থাকা সত্ত্বেও তাঁর লোকভয় ছিলো অত্যন্ত প্রবল। 'বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল।'৩ তখনকার দিনে শ্বশুরবাড়িতে বালিকা-বধূদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হতো শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, জা এবং স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাসসুন্দরীর তাও সহ্য করতে হয়নি, তাঁর লেখা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর শাশুড়ি তাঁকে সত্যিসত্যি মায়ের মতো স্নেহ করতেন। প্রথম দিকে তিনি রাসসুন্দরীকে কোলে করে রাখতেন। ঘরের কাজ করতে দিতেন না। বাপের বাড়ির শোক ভোলার জন্যে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের ডেকে বধূকে তাদের সঙ্গে খেলার সুযোগ করে দিতেন। শ্বশুর জীবিত ছিলেন না আর স্বামী সীতানাথ সরকার ছিলেন সংসারের একমাত্র পুত্র সন্তান। ছোটো জমিদার। ঘরে ছিলো ন জন কাজের লোক। তিনটি ননদ ছিলেন বিধবা। তাঁরা নাক গলানো স্বভাবের হতে পারতেন। কিন্তু দৈবক্রমে সবাই ছিলেন ভালো মানুষ। শ্বশুরবাড়ির এই দুর্লভ অনুকূল এবং স্নেহময় পরিবেশের দরুনই শেষ পর্যন্ত রাসসুন্দরী লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

দুই

আট বছর বয়সে, অর্থাৎ ১৮১৮ সালে, একদিন এক খেলার সঙ্গিনীর হাতে লাঞ্ছিত হন। পরের দিন তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে বাড়ির পাঠশালায় মেম সাহেবের সামনে তাঁকে গিয়ে রেখে আসেন, যাতে তিনি সেখানে নিরুপদ্রবে সময় কাটাতে পারেন। তারপরের দিন থেকে এটাই হলো তাঁর প্রতিদিনের রুটিন। পাঠশালায় গিয়ে তিনি কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলে চুপ করে বসে থাকতেন। ওদিকে, তাঁকে লেখাপড়া শেখানোর কোনো চেষ্টা মেম সাহেব আদৌ করেননি; কারণ তিনি জানতেন লোকাচার অনুযায়ী লেখাপড়া করা মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো (তখনো কলকাতায় মেয়েদের প্রথম বিদ্যালয় - মিস কুকের স্কুল - শুরু হয়নি)। তা ছাড়া, অভিভাবকরাও তাঁকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে স্কুলে রেখে আসেননি। কিন্তু রাসসুন্দরী আর পাঁচজনের মতো সাধারণ মেয়ে ছিলেন না। পাঠশালায় বসে থাকলেও, অন্যরা কী শিখছে, তা তিনি লক্ষ করে দেখতেন। এভাবে পাঠশালায় বসে থাকতে থাকতেই তিনি অন্য ছেলেদের মতো পড়তে শিখে ফেলেন। তবে তিনি হাতে-কলমে কোনো দিন মকশো করেননি বলে সেই পর্যায়ে তিনি কেবল পড়তে শেখেন, লিখতে শেখেননি। ওদিকে, তিনি যে পড়তে জানেন - এ কথা তিনি অন্য কাউকে বলেননি। তাঁরাও খবর রাখেননি।

দু বছর তিনি এই পাঠশালায় গিয়েছিলেন। তারপর বাড়িতে আগুন লেগে অন্যান্য ঘরের সঙ্গে পাঠশালাটি পুড়ে যাওয়ায় রাসসুন্দরীর জন্যে দূর থেকে পড়ার অধ্যায়ও শেষ হয়ে যায়। তা ছাড়া, ততো দিনে তাঁর বয়স হয়েছিলো দশ বছর - অর্থাৎ পর্দা এবং বিয়ে করার বয়স। তখন থেকে তিনি আর বাইরে যাবার অনুমতি পেতেন না।



আমার জীবনের (প্রথম সংস্করণ) একটি পৃষ্ঠা

সেকালে বিয়ে করা, বিশেষ করে নারীদের পক্ষে, কোনো রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতা ছিলো না। কারণ তাঁদের বিয়ে হতো বালিকা বয়সে – প্রেম এবং বিয়ের অর্থ বোঝার আগেই। তদুপরি, বিয়ে হওয়ার পরেই সেই আট–দশ বছর বয়স থেকেই সংসারে তাঁদের ভূমিকা একেবারে বদলে যেতো। সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলো করার 'স্বাধীন' জীবন শেষ হয়ে যেতো। তার পরিবর্তে শুরু হতো স্বামীর বাড়িতে শাশুড়ি ও ননদের কড়া দৃষ্টির অধীনে সংসার জীবন। হয়তো এ জন্যেই তখন বাপের বাড়িকে বলা হতো 'নিজের বাড়ি', আর স্বামীর বাড়িকে বলা হতো 'পরের বাড়ি'।

রাসসুন্দরীর জীবনে বিয়ে এতো বড়ো পরিবর্তন সূচনা না–করলেও, বিয়ের পর, তাঁর ভাষায়, তিনি 'পরাধীন' হন। সুতরাং লেখাপড়া করার তাঁর আর কোনো সুযোগ থাকলো না। 'পরাধীনতা' ছাড়া, স্বামীর বাড়িতে সকাল থেকে দুপুর রাত অবধি ঘরের কাজ নিয়ে তাঁর ব্যস্ত থাকতে হতো। সেই ব্যস্ততার মধ্যে লেখাপড়া করার কথা তাঁর মনেও পড়তো না। কিন্তু এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দু বছর পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর মনে এমন একটা স্থায়ী প্রণয় রচিত হয়েছিলো যে, কোনো কালেই তা ভুলতে পারেননি। বরং কার্যকারণে সেই পুরোনো প্রেমই নতুন করে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিলো।

> একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি যেন চৈতন্যভাগবৎ পাঠ করছেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার পর তাঁর শরীর মন এককালে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। 'আমি জাগিয়াও চোখ বুজিয়া বারবার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম, আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম। চৈতন্যভাগবৎ পুস্তক আমি কখনও দেখি নাই এবং আমি ইহা চিনিও না, তথাপি স্বপ্নাবেশে সেই পুস্তক আমি পাঠ করিলাম।'[৪]

আগে থেকেই তাঁর মনে লেখাপড়ার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিলো। তদুপরি, বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান হিশেবে শৈশবেই ধর্মের প্রতি তাঁর একটা গভীর বিশ্বাস তৈরি হয়। তাঁর আত্মজীবনী পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁর আরাধ্য দেবতা 'দয়ামাধব'কে তিনি বিগ্রহ হিশেবে নয়, জাগ্রত একটি সত্তা হিশেবেই বিবেচনা করতেন। 'আমি কাহার সহিত কথা কহিতাম না। ...পরমেশ্বরের সঙ্গেই যা কিছু কথা হইত।'[৫] সে কারণে চৈতন্যভাগবৎ পড়ছেন, এই স্বপ্ন দেখার পর পড়তে শেখার প্রতি তাঁর উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা আগের চেয়েও জোরালো হয়।

রাসসুন্দরী চৈতন্যভাগবৎ পড়ার স্বপ্ন দেখার আগেই তাঁর শাশুড়ি মারা গিয়েছিলেন। ফলে সংসারের গৃহিণী হিশেবে তিনি বেশ খানিকটা স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তখনো তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব অথবা ইচ্ছা–অনিচ্ছা ফলাও করে প্রকাশ করতে চাইতেন না। বরং অন্যের পছন্দ–অপছন্দের কথা চিন্তা করে তাঁদের মন জুগিয়ে চলতে চেষ্টা করতেন।

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ তাঁর পক্ষে খুবই অনুকূল হয়েছিলো। শ্বশুরবাড়িতে চৈতন্যভাগবতের পুঁথি সবার থাকে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর স্বামীর চৈতন্যভাগবৎসহ বহু পুঁথিই ছিলো। একদিন দৈবক্রমে রাসসুন্দরীর

আমার জীবন।

শ্রীমতী রাসসুন্দরী

লিখিত।

কলিকাতা

চিৎপুররোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে

শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৩।

রাসসুন্দরী দেবীর *আমার জীবনের* প্রথম সংস্করণের নামপত্র। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা এর প্রকাশের তারিখ এতোকাল ভুল করে ১২৭৫ বলে এসেছেন।

ভাষায়, দয়ামাধবের অপরিসীম দয়ার প্রভাবে[৬] অন্য কোনো পুঁথি নয়, তিনি চৈতন্যভাগবৎই পেয়ে গেলেন। তাঁর স্বামী অজ্ঞাত কোনো কারণে একদিন চৈতন্যভাগবতের একখানি পুঁথি বাড়ির ভেতরে রেখে গেলেন। পুরুষদের পক্ষে সেকালে দিনের বেলায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করা স্বাভাবিক ছিলো না। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা ছিলো একেবারে অপ্রত্যাশিত। তাই শিশুপুত্রের নাম সম্বোধন করে, আসলে রাসসুন্দরীকে উদ্দেশ্য করে, তাঁর স্বামী পরোক্ষভাবে বলে গেলেন পুঁথিটি যত্ন করে রেখে দিতে।

রান্নাঘর থেকে স্বামীর হুকুম শুনতে পেয়ে রাসসুন্দরীর 'মনে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বলা যায় না। ... অতিশয় পুলকিত মনে তাড়াতাড়ি গিয়া'[৭] পুঁথিটি দেখলেন এবং তার একটি পৃষ্ঠা লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর হাতে পুঁথির একটি পাতা দেখলে 'নিন্দার একশেষ' হবে এবং কেউ 'কটু বাক্য'ও বলতে পারে – এই আশঙ্কায় তিনি সেটি রাখলেন রান্নাঘরের চেলা কাঠের তলায়। ঘরে যখন কেউ থাকতেন না, তখন বুক পর্যন্ত ঝোলানো ঘোমটার তলায় সেই পাতাটি নিয়ে তিনি সেটা পড়তে চেষ্টা করতেন। এই ভাবেই দ্বিতীয় দফাতে তাঁর পড়ার সূচনা। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। অর্থাৎ সেটা ছিলো ১৮৩৬ সাল।

পাঠশালায় তিনি যে-ধরনের হরফ দেখেছিলেন, চৈতন্যভাগবতের সঙ্গে তার তেমন মিল খুঁজে পেলেন না। তাই বড়ো ছেলে যে-পাতায় লিখতো, তিনি তার একটি পাতাও লুকিয়ে রাখলেন। সেই লেখার সঙ্গে চৈতন্যভাগবতের লেখা মিলিয়ে দেখতেন। পাঠশালায় দেখা বানান এবং ফলার কথাও মনে করতে চেষ্টা করেন। তারপর 'অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবৎ পুস্তকখানি গোঙাইয়া'[৮] পড়তে শেখেন।

ধর্মপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও, রাসসুন্দরী প্রকাশ্যে চৈতন্যভাগবৎ পড়তে সাহস পাননি। যাতে তাঁর ননদরা জানতে না পারেন, তার জন্যে পড়ার সময়ে পরিচারিকাদের মধ্যে দুজন দূরে দাঁড়িয়ে ননদদের গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখতেন। তবে এক সময়ে তাঁরা জানতে পারলেন। কিন্তু তাতে ফলাফল খারাপ না হয়ে ভালো হলো – ননদরাও তাঁর চৈতন্যভাগবৎ পাঠের আসরে নিয়মিত শ্রোতা হলেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও তাঁরাও রাসসুন্দরীর কাছে খানিকটা লেখাপড়া শিখতে চেষ্টা করেন। এর পরে রাসসুন্দরীর পড়ার ব্যাপারে আর কোনো বাধা ছিলো না। একে একে তিনি তাঁদের বাড়িতে রক্ষিত বহু ধর্মীয় পুস্তক পড়ে ফেলেন। তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায়, তিনি খানিকটা সংস্কৃতও শেখেন।

কিন্তু পড়তে শিখলেও, তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত লিখতে শেখেননি। তার তেমন প্রয়োজনও বোধ করেননি। 'লেখার কথা মনেও করিতাম না।'[৯] সেদিকে মন দিলেন তাঁর সপ্তম পুত্র কিশোরীলালের জেদে। কিশোরীলাল কলকাতায় পড়তেন। মাকে মাঝেমধ্যে চিঠি লিখতেন সেখান থেকে। মা পড়তে পারেন এ কথা সবাই জানতেন। তা সত্ত্বেও মায়ের কাছ থেকে চিঠির কোনো উত্তর পেতেন না। সে জন্যে একবার

১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১২৭৬ সালে আমার বয় ক্রম ৬০ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।

আমার এই শরীর, এই মন, এই জীবনেই কয়েক প্রকার হইল। আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, কোন্ সময়ে কি প্রকার ছিল, এবং কোন্ অবস্থায় কত দিবস গত হইয়াছে, সে সমুদয় আমার স্মরণ নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমার মনে আছে, তাহাই লিখিতেছি :—

চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব কি প্রকার ছিল, তাহা আমি কিছুই জানি না ; সে সমুদয় আমার মা জানেন। পরে যখন আমি ছয় সাত বৎসরের ছিলাম, তখনকার কথা আমার কিছু কিছু মনে আছে। যাহা আমার মনে আছে তাহাই লিখিতেছি। তখন আমি প্রতিবাসিনী বালিকাদিগের সঙ্গে ধূলা-খেলা করিতাম, ঐ সকল বালিকা বিনা অপরাধেই আমাকে মারিত। আমার মনে এত ভয় ছিল যে, আমি মারি খাইয়াও বড় করিয়া কাঁদিতাম না, কেবল দুই চক্ষের জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইত। আমার যদি অতিশয় বেদনা হইত, সে জন্যও কতক কাঁদিতাম, কিন্তু আমার কাঁদার বিশেষ কারণ এই, যে আমাকে মারিয়াছে, আমাদের বাটীতে সকলে শুনিলে উহাকে গালি দিবেন। আর একটি কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিতাম :— এক দিবস আমার মা আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি কোন খানে যাইও না। তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

বাড়িতে এসে খুব জেদ করলেন মা যাতে চিঠির উত্তর দেন। তাঁকে কাগজ, কলম, দোয়াত–কালি ইত্যাদি কিনে দিয়ে তিনি কলকাতায় গেলেন। এ সময়ে কিশোরীলালের বয়স যদি কুড়ি বছর হয়, তা হলে ঘটনাটা ১৮৬৪ সালের। কারণ কিশোরীলাল জন্মগ্রহণ করেন যখন তাঁর মায়ের বয়স ৩৪। আর তাঁর মায়ের জন্ম ১৮১০ সালে।

কিশোরীলাল মাকে লিখতে বাধ্য করেন নিতান্তই মায়ের চিঠি পাওয়ার সমূহ লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে মস্তো বড়ো একটা উপকার করেন। সংসারের শত কাজের মধ্যেও রাসসুন্দরী অবিলম্বে লেখার অনুশীলন আরম্ভ করেন। এবং অল্প কালের মধ্যে কেবল পুত্রকে চিঠি লেখাই নয়, লিখতে শুরু করেন বাংলা ভাষার প্রথম আত্মজীবনী। (কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনীও প্রায় একই সময়ে অথবা আরও পরে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটি প্রকাশিত হয়নি বলে রাসসুন্দরী দেবীই প্রথম আত্মজীবনীকার হিশেবে পুরোটা কৃতিত্বের দাবিদার। তা ছাড়া, কৈলাসবাসিনী লিখেছিলেন মেয়েদের কথ্যভাষায় – তাঁর বানান অথবা ভাষার রীতিতে আদৌ শুদ্ধ বাংলার কোনো যোগ ছিলো না। রাসসুন্দরী লিখেছিলেন প্রামাণ্য বাংলায়।)

তিন

রাসসুন্দরী দেবীর স্বামী মারা যান ১৮৬৯ সালের শুরুতে। অনুমান করি স্বামীর মৃত্যুর পরে জগৎ এবং জীবনের প্রতি তাঁর যে বৈরাগ্য দেখা দেয়, তারই ফলস্বরূপ তিনি কেবল লিখতে শেখেননি, তারপর আত্মজীবনী লেখার কাজও আরম্ভ করেন। তবে ঠিক তখনই নয়। আত্মজীবনীর শুরুতেই তিনি লিখেছেন, '১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম, আর এই ১২৭৬ সালে আমার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।'[১০] এ থেকে মনে হয়, ১৮৭০ সালেও তাঁর আত্মজীবনী লেখার কাজ চলছিলো।

যে–দেশে আত্মজীবনী লেখার কোনো রেওয়াজই ছিলো না, সেই দেশের অজপাড়াগাঁর অতি সাধারণ শিক্ষিতা এক মহিলা যিনি সবেমাত্র লিখতে শিখেছেন, তিনি আত্মজীবনী লেখার ধারণা, তার আদর্শ এবং উৎসাহ কোথায় পেলেন জানি না। কিন্তু একে একটি অসাধারণ ঘটনা না বলে উপায় নেই। গ্রামের ঐতিহ্যিক পরিবারের অন্তঃপুরের চার দেয়ালে বন্দী এবং কাজের চাপে পিষ্ট প্রায় ষাট বছর বয়স্ক একজন মহিলা হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না – বিশেষ করে বাল্যকাল থেকে তিনি যখন নিজেকে সংসারের এক কোণে সযত্নে লুকিয়েই রেখেছিলেন!

রাসসুন্দরীর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিলো সন্দেহ নেই। স্বামীর বাড়িতে যাবার কয়েক বছর পরে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয়েছিলো মাটির পুতুল, কড়ি এবং পাটের শিকা ইত্যাদি

হাতের কাজের দিকে। তখনও তাঁর ঘরের কাজ করতে হতো না বলে তাঁর হাতে ছিলো অফুরন্ত অবসর। তারই সুযোগ নিয়ে তিনি এদিকে ঝুঁকেছিলেন। একবার খাটের তলায় তাঁর তৈরি একটি মাটির সাপ দেখে লাঠি-সড়কি হাতে বাইরে থেকে বহু লোক এসে রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিলো না শেষে আড়ার উপর থেকে একজন যখন সাপটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলো অমনি মাটির সাপ গেলে ভেঙে। দারুণ উত্তেজনা এবং উদ্বেগ মুহূর্তের মধ্যে হাস্যকৌতুকের ঘটনায় পরিণত হলো। এ ঘটনা থেকে যা লক্ষণীয়, তা হলো, সাপটিকে একেবারে জ্যান্ত সাপের মতোই মনে হয়েছিলো। অর্থাৎ এ কাজে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিলো। তাঁর ভাই নীলরতন রায়েরও প্রতিভা ছিলো। তিনি ছিলেন সংগীত ও যাত্রার পালা রচয়িতা।

সে যাই হোক, রাসসুন্দরীর শিল্পকলার নমুনা দেখে অতো লোক উত্তেজিত হওয়ায় তিনি পরে আর কোনো দিন পুতুল তৈরি করেননি। ঐ একবারই তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু অন্য লোকের সামনে সংকোচ বোধ করায় তিনি আবার তাঁর নিজের বিবরে প্রবেশ করেন। সেই বিবর থেকে তিনি রীতিমতো জনসমক্ষে এসে দাঁড়ালেন তাঁর আত্মজীবনীর মাধ্যমে। তাঁর এই রূপান্তর কী করে সম্ভব হলো তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। হতে পারে, বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাঁর সংকোচ কমে গিয়েছিলো। হতে পারে, শাশুড়ির মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে পুত্রপরিজন পরিবেষ্টিত সংসারে কর্তৃত্ব লাভের মধ্য দিয়ে তিনি একটা আত্মপ্রত্যয় অর্জন করেছিলেন। তা ছাড়া, স্বামী জীবিত থাকলে তিনি হয়তো তাঁর আত্মজীবনী কোনো কালেই লিখতেন না অথবা লিখলেও প্রকাশ করতেন না। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, তিনি পুত্রের আবদারের মুখে লিখতে শেখেন মোটামুটি ১৮৬৪ সালের দিকে, আর আত্মজীবনী লিখতে আরম্ভ করেন স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পরে – ১৮৭০ সালে।

একবার আত্মজীবনী প্রকাশের পর অবশ্য তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা – উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ফলে, তিনি যে কেবল আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন তাই নয়, তার মধ্যে নিজের যে এককালে যথেষ্ট দৈহিক সৌন্দর্য ছিলো, সে কথাও বলেন। দ্বিতীয় বার আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন সম্ভবত পঁচাশি বছর বয়সে এবং শেষ করেন ৮৮ বছর বয়সে। দ্বিতীয় ভাগ লেখার সময়ে তিনি প্রথম খণ্ডেরও কয়েকটি জায়গায় পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর লেখা শেষ হবার পরেই – ১৮৯৮ সালে – তাঁর অন্যতম পৌত্র, যিনি ছিলেন একই সঙ্গে রসায়নবিদ এবং মনস্তাত্ত্বিক, সরসীলাল সরকার ঠাকুরমায়ের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সরসীলালের পিতা কিশোরীলাল, যার উৎসাহে রাসসুন্দরী লিখতে শিখেছিলেন। রাসসুন্দরী ১৮৯৯ সালে মারা যাওয়ার পর এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। রাসসুন্দরীর পুত্রকন্যাদের মধ্যে কিশোরীলালই সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ছাড়া পৌত্রী সরলাবালা সরকার কবি এবং সাহিত্যিক হিশেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

চার

রাসসুন্দরী ঊনবিংশ শতাব্দীর যে–সমাজচিত্র নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর রচনায় অঙ্কন করে রেখে গেছেন, তার ফলে সে সমাজের অন্তর্নিহিত স্বরূপ, বিশেষ করে পরিবার ও সমাজে নারীদের মর্যাদা অনেকটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে – এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে। তিনি অন্তঃপুরচারী সংকুচিতা মহিলা ছিলেন। সেকালে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী গ্রামের একজন সাধারণ মহিলা কেমন করে ভাবতেন, তার উজ্জ্বল বিবরণ পাই তাঁর জীবনীতে। তবে তিনি একটু বেশি আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন কিনা জানি না, তাঁর রচনায় নিজের পরিবারের বাইরে তিনি কোনো কিছুর দিকে তেমন নজর দেননি। এমন কি, নিজের পরিবারেরও সবকিছুর দিকে নয়। কেবল তাঁর মনে রাখার মতো যোগাযোগ যেটুকু ঘটেছে, সেটুকুই তাঁর রচনায় এসেছে। নিজের মা, ভাইবোন, স্বামী এবং সন্তানদের কথা তিনি সামান্যই বলেছেন। মনে হয় সংসারের খুব কর্তব্যপরায়ণ সদস্য হলেও তাঁর মধ্যে আশ্চর্য রকমের নিরাসক্তি ছিলো। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর রচনা থেকে সেকালের সমাজে মহিলাদের স্থান, সংসারে তাঁদের ভূমিকা, বিয়ে এবং স্বামী সম্পর্কে মনোভাব এবং পারিবারিক ইতিহাস যথেষ্ট পরিমাণে জানা যায়।

রাসসুন্দরী সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন, সে জন্যে পিতা এবং স্বামীর পরিবারে মহিলাদের ওপর পুরুষের প্রত্যক্ষ নির্যাতনের শিকার হননি, অথবা অন্য কাউকে হতে দেখেননি। অন্তত তাঁর রচনায় তার উল্লেখ নেই। তবে সংসারের সত্যিকার কর্তৃত্ব যে পুরুষের হাতে ন্যস্ত ছিলো, সেটা দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে কখন পাঠানো হবে, সে সিদ্ধান্ত তাঁর মায়ের ওপরে নয়, নির্ভর করতো তাঁর খুড়োর ওপরে। স্বামীর বাড়িতে সব সিদ্ধান্তে মালিক যে একমাত্র স্বামীই ছিলেন, সেটা অতি পরিষ্কার। রাসসুন্দরীর মা যখন মারা যান তখন তিনি তাঁকে দেখতে পারেননি, কারণ যাবার জন্যে স্বামীর অনুমতি পাননি।

স্বামীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, তিনি 'বেশ লোক' ছিলেন। অন্যত্র কিছু না বললেও, পুরো বই থেকেই বোঝা যায়, তাঁর স্বামী বেশ স্নেহপ্রবণ ভালোমানুষ ছিলেন এবং স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন, কিন্তু সে সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা কি হবে, সে সংজ্ঞায় কোনো অস্পষ্টতা ছিলো না। স্ত্রী ঘরের কাজ করবেন, সন্তান জন্ম দেবেন, তাদের লালন করবেন এবং রাতের বেলায় স্বামীর সঙ্গ দেবেন – এই ছিলো তাঁর অলিখিত ভূমিকা। রাতের বেলায় বললাম এই জন্যে যে, সেকালের দেশাচার অনুযায়ী স্বামীর সঙ্গে রাসসুন্দরীর দিনের বেলায় কখনো দেখা হতো না। এমন কি, প্রয়োজন দেখা দিলেও। স্বামীও দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে কথাও বলতেন না। চৈতন্যভাগবৎ পুঁথিটি যত্নের সঙ্গে রেখে দেবার নির্দেশ তিনি সরাসরি স্ত্রীকে দেননি, পরোক্ষভাবে সন্তানের মাধ্যমেই দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গেই স্বামীর প্রতি রাসসুন্দরীর মনোভাব বিশ্লেষণ করা যায়। স্বামীকে তিনি মোটেই প্রেমিক হিশেবে বিবেচনা করেননি। সেকালে সেটা স্বাভাবিকও ছিলো না। স্বামীকে তিনি দেখতেন ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। স্বামী হলেন 'কর্তা'। স্বামীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটা সাক্ষ্য মেলে একটি কৌতূকমণ্ডিত ঘটনা থেকে। স্বামীর ঘোড়া 'জয়হরি' বাড়ির ভেতরে এসে ধান খেয়ে যাচ্ছিলো। অথচ রাসসুন্দরী তাকে তাড়াতে পারছিলেন না। কারণ স্বামীর ঘোড়ার সামনে যাওয়া আর দিনের বেলা স্বামীর সামনে পড়া – একই ব্যাপার! আর একদিনের ঘটনা হলো : ঘোড়া জয়হরির পিঠে চড়ে ছেলে এসেছে বাড়ির ভেতরে, অমনি রাসসুন্দরী পালিয়ে এসেছেন সেখান থেকে। কারণটা এ নয় যে, তিনি ঘোড়াকে দেখে ভয় পান। আসল কারণ হলো : ঘোড়াটি স্বামীর – তাই দারুণ লজ্জা এবং সংকোচে ঐ ঘোড়ার সামনে যেতে পারছেন না।

আত্মজীবনীতে তিনি স্বামীর কথা সামান্যই লিখেছেন। অবশ্য সে সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। সে জন্যে প্রথম খণ্ডের একেবারে শেষ দিকে একটি ছোটো অধ্যয়ে তিনি তাঁর 'কর্তা'র বর্ণনা দিয়েছেন। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে, 'তাঁহাকে দেখিলে যেন কর্তা কর্তা বোধ হইত।'[১১] স্থূল দেহের এবং উচ্চকণ্ঠের অধিকারী কর্তা 'অতি উত্তম', 'বিশেষ বড়লোক এবং দয়ালু' ছিলেন। সাড়ম্বরে এবং গর্বের সঙ্গে তিনি স্বামীর আর–একটি বর্ণনা দিয়েছেন – স্বামী তাঁর মামলাবাজ ছিলেন। বিশ পঁচিশটা মামলা তাঁর লেগেই থাকতো। অন্য জমিদার, কুঠিয়াল এবং প্রতাপশালী লোকের সঙ্গে তাঁর 'কাজিয়া' ছিলো। মামলাতে তিনি পরাজিত হতেন না। জয়ী হতেন সবার বিরুদ্ধে।

স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার কোনো ঘটনা দূরে থাক, তার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত তাঁর রচনার কোথাও নেই। বিয়ের সময়ে রাসসুন্দরী প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না, তারপর কী করে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো, তার কোনো আভাস তিনি দেননি। একবার রাসসুন্দরী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক সময়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা মনে করলেন যে, তিনি মারা যাচ্ছেন। তাই সেকালের রীতি অনুযায়ী তাড়াহুড়ো করে তাঁকে ঘর থেকে আঙিনায় নামানো হয়। খবর পেয়ে বহির্বাটী থেকে কর্তাও অন্যান্যকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে আসেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে গিয়ে তিনি তাঁর অবস্থা জানার চেষ্টা করেননি, বরং সেকালের রীতি অনুযায়ী দূর থেকেই 'মলো নাকি, তবে যাক' বলে তাঁর অবস্থা জানতে চেয়েছেন। তিনি মরে গেছেন মনে করে সন্তানরা এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়রা যখন ক্রন্দনরত, স্বামীও তখন তাতে যোগ দেন। জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাসসুন্দরী তাঁর রচনায় উল্লেখ করে নি। কিন্তু স্বামীর চোখ দিয়ে তাঁর জন্যে অশ্রু ঝরার কথা লিখতে ভুলে যাননি। এ থেকে মনে হয়, স্বামীর ভালোবাসা সম্পর্কে তিনি সচেতন, এমন কি, হয়তো গর্বিত ছিলেন। কিন্তু বাইরে তিনি তাঁদের কোনো ঘনিষ্ঠতার কথা আদৌ উল্লেখ করেননি।

জৈবিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের সন্তানাদি হতো, কিন্তু সেকালের দম্পতিরা অনেকেই ভালোবাসার কথা চিন্তা করে অকারণে সময় নষ্ট করতেন না। স্বামী অথবা

স্ত্রীর হৃদয় আছে কি নেই, তাও তাঁরা ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। সংসারের সহস্র কাজ, সন্তান লালন এবং লোকাচার সত্ত্বেও স্বামীর সঙ্গে রাসসুন্দরীর যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিলো বলেই মনে করি। রাসসুন্দরীর বয়স যখন ৫৯ তখন তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। এই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'আমার শিরে স্বর্ণমুকুট ছিল, কিন্তু এতকাল পরে মুকুটটি খসিয়া পড়িল'।[১২] তবে এই সংবাদটি তিনি দিয়েছেন অনাড়ম্বরে এবং প্রায় অলক্ষ্যে, মাত্র চারটি বাক্যে।

রাসসুন্দরীর মধ্যে এমন একটি নিরাসক্তি ছিলো যে, স্বামীর মৃত্যুকে স্বর্ণমুকুট খসে পড়ার সঙ্গে তুলনা করলেও পর মুহূর্তেই বলেছেন, 'আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন সেই উত্তম।'[১৩] কেবল স্বামীর মৃত্যুতেই তাঁর নিরাসক্তি লক্ষ করি, তাই নয়, সন্তানদের মৃত্যুতেও তাঁকে সমান নিরাসক্ত মনে হয়। তাঁর মোট দশটি পুত্র এবং দুটি কন্যা জন্মেছিলো। তাদের মধ্যে সাতটি মারা যায় তাঁর বিভিন্ন বয়সে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আমি যদি সকলের মৃত্যুর কথা একবার মনে করিয়া দেখি তাহা হইলে আমার শোক বড় অল্প হয় না, শোকসাগর উথলিয়া উঠে।'[১৪] কিন্তু তাঁর বর্ণনায় শোকের প্রগাঢ় কোনো চিহ্ন নেই। যে মৃত্যুর কথা তিনি বারবার ক্ষেভের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, সে তাঁর মায়ের।

পাঁচ

এ প্রসঙ্গেই বিবাহ সংসারে নারীর অবস্থান ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে রাসসুন্দরীর মনোভাব কেমন ছিলো, তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বিয়ের সময়ে বিয়ে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিলো না। 'সকল লোকেই বলিত যে সকলেরই বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; বিবাহ হয় এই মাত্র জানি।'[১৫] বিয়ের কথা শুনে তাঁর 'মনে বেশ আনন্দ হইল; বিবাহ হইবে, বাজনা বাজিবে, সকলে হুলু দিবে দেখিব।'[১৬] কিন্তু শেষে যখন সত্যি সত্যি বিবাহ হয়ে গেলো এবং স্বামীর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করার সময় হলো তখন তিনি দারুণ ভয় এবং দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। 'যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামা পূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সেই সময় সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।'[১৭] বৃদ্ধ বয়সে সেই দিনের কথা মনে করে লিখেছেন,

এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন।[১৮]

অপরিচিত এবং অনাত্মীয় পরিবেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একদিকে তাঁর অসাধারণ ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা, আর অন্য দিকে নতুন বৌ আনার উৎসাহে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ – এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের বর্ণনা

আমার জীবন।

শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্ত্তৃক
লিখিত।

কলিকাতা, ১২১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীসরসীলাল সরকার দ্বারা
প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত।
১৩১৩ সাল

আমার জীবনের তৃতীয় সংস্করণের নামপত্র।

আমার জীবনের তৃতীয় সংস্করণের নামপত্র

দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে জন্মের মত বন্দী হইলাম – আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।'[১৯]

রাসসুন্দরী স্বামীর বাড়িতে যে সমাদর এবং আন্তরিক যত্ন ও মর্যাদা পেয়েছিলেন, সেকালে তা ছিলো খুবই বিরল। তা ছাড়া, আগেই লক্ষ করেছি, তাঁর স্বামীর পরিবার ছিলো একক পরিবার এবং সেকালের বধূর জন্যে আদর্শ পরিবার। তা সত্ত্বেও, একেবারে বৃদ্ধ বয়সের আগে পর্যন্ত তিনি বাপের বাড়িকেই 'নিজের বাড়ি' এবং স্বামীর বাড়িকে 'পরের বাড়ি' বলে গণ্য করেছেন। তাঁর এ মনোভাবটি আত্মজীবনীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। প্রথম খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় ছাড়া অন্যত্র স্বামীর বাড়িকে তিনি 'পরের বাড়ী' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পনেরো বছর পরে তিনি যখন দ্বিতীয় খণ্ড লেখেন, তখন তাঁর বাড়ি রামদিয়া অর্থাৎ স্বামীর বাড়ি বলে স্বীকার করেছেন।

বিয়েকে তিনি বার বার অধীনতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস ও যাবজ্জীবন তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার, আপনার মাতাপিতা কেহ নহেন – এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়!'[২০] 'ঈশ্বরাধীন কর্ম' হিশেবেই তিনি একে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষোভ স্থায়ী হয়েছিলো। প্রথম বার তিনি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তিন মাস ছিলেন। সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'ঐ তিন মাস মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় দিবারাত্রি কান্নাতেই কাল যাপন করিয়াছিলাম।'[২১]

তারপর মায়ের কাছে ফিরে আসার দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : 'সেই দিন যে কি আনন্দের দিন, সে আনন্দ বর্ণনাতীত।'[২২] অতঃপর মায়ের কাছে এক বছর থেকে তিনি আবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যান এবং সেখানে ফিরে গিয়ে দু বছর থাকেন। অনুমান করি সেই সময়েই স্বামীর সঙ্গে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সময়ে 'পূর্বের মতই সকল দিবস' কাঁদতেন এবং কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তারপর দীর্ঘদিন স্বামীর বাড়িতে থাকার ফলে 'তাঁহাদিগের পোষা পাখী হইয়া তাঁহাদের শরণাগত হইলাম।'[২৩] পোষা পাখি হিশেবে সমাদর এবং যত্ন পেলেও, তিনি যে 'সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা' এ কথাটি তিনি বারবার দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

রাসসুন্দরী সংসারের জালে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ার পর বাপের বাড়ি যাবার সুযোগ খুব কমই পেতেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নৌকোয় করে যেতে তিন দিন লাগতো সেটাও একটা কারণ যার জন্যে বারবার করে তিনি পিতৃগৃহে যেতে পারেননি। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন যে, তিনি যে নৌকোয় করে যেতেন, সেই নৌকোয় করেই তাঁর ফিরে আসতে হতো। যে কদিন তিনি বাপের বাড়িতে থাকতেন সে কদিন নৌকোর দশ–পনেরো জন লোক, দুজন সর্দার এবং দুজন দাসীও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকতো। 'সংসারের কাজ চলিবে না বলিয়া প্রাণান্তেও আমাকে পাঠান হইত না।'[২৪]

মৃত্যুশয্যায় তাঁর মা তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসসুন্দরী তখন যাবার সুযোগ পাননি। 'এই কথাটি আমার মনে ভারী আক্ষেপের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।'[২৫] তিনি লিখেছিলেন, 'আমি যদি পুত্র সন্তান হইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ।'[২৬] তিনি যে খাঁচার পাখির মতো বন্দী – এ উপমাটি তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন।

তবে মহিলারা অন্তঃপুরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাঁদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের সামান্যই – এ সম্পর্কে রাসসুন্দরীর তেমন ক্ষোভ ছিলো না। এমন কি, মহিলাদের যে সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত ঘরের কাজ করতে এবং সন্তান লালন–পালনে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সবাইকে খাওয়ানোর পর নিজেরা ভালো করে অথবা যথাসময়ে খেতে পারেন না, এ জন্যেও তাঁর কোনো ক্ষোভ ছিলো না।

বস্তুত, ঘরের কাজ করার বিষয়ে তিনি কোথাও কোনো অভিযোগ করেননি। একান্নবর্তী পরিবার না হলেও বাইরের লোকজন নিয়ে রাসসুন্দরীর সংসার ছিলো বিরাট। প্রতি বেলায় দশ–বারো সের চাল রান্না হতো সে সংসারে। এ থেকে সে সংসারের আয়তন অনুমান করা যায়। বাড়িতে ন–দশজন দাসী ছিলো। কিন্তু তবু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রাসসুন্দরীর নিজেরই রান্না করতে হতো। তিনি লিখেছেন : 'কাজের গতিকে আমার দিনরাত বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দু বেলা আহার প্রায় ঘটিত না।'[২৭] একবার ঘটনাচক্রে দুদিনের মধ্যে তাঁর খাবার অবকাশ হয়নি। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। বরং কৌতুকের সঙ্গেই তা স্মরণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'কাজ করতে একবারও আমার বিরক্তি বোধ হইত না।'[২৮]

রান্নাবান্না ছাড়াও, সন্তান লালন যে তাঁর একটা বড়ো দায়িত্ব ছিলো তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। তেইশ বছরের মধ্যে তাঁর মোট বারোটি সন্তান হয়েছিলো। তার অর্থ প্রায় তিরিশ বছর ধরে তাঁকে ছোটো ছোটো সন্তানদের সেবাযত্ন করতে হয়েছে। সেবাযত্ন প্রাত্যহিক কাজকর্মের ওপর কতোটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতো, তিনি তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'ঐ ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ঐ ছেলে ক একটি না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ান হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ সেবায় যাহা দিতে হয়, তাহা সমুদয় দিয়া আমাদের ঘরের রান্না সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। এদিকে বাড়ির কর্তাটির স্নান হইতেই ভাত চাই। এ জন্য অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।'[২৯]

একদিন কর্তা রাত দুপুরে বাড়ির ভেতরে আসেন। ঠিক সেই সময়ে একটি ছেলে ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করে। কান্না শুনে অন্য একটি ছেলেও জেগে ওঠে।

এমনি করে সে রাতে আর রাসসুন্দরীর খাওয়া হলো না। 'বিশেষ ছেলে দুইটি কাঁদিলে কর্তাটি কাঁদে কেন কাঁদে কেন বলিয়া উচৈঃস্বরে সোর করিবেন।' এ একটা ছোটো দৃষ্টান্ত। সন্তান লালন ছাড়াও তাঁকে নিশ্চয় বহু গুরুদায়িত্ব পালন করতে হতো। তা ছাড়া, বারোটি সন্তান গর্ভে ধারণ এবং জন্ম দেওয়া কতো শক্ত কাজ ছিলো, বর্তমান পরিবার পরিকল্পনার যুগেও তা অনুমান করা অসম্ভব নয়।

ছয়

সেকাল, ধর্ম, মহিলাদের সাজসজ্জা এবং নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি কোথাও কোথাও মন্তব্য করেছেন। সমাজ পরিবর্তনের গতি–প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার মতো মননশীলতা সম্ভবত ছিলো না। অথবা বাইরের সমাজের দিকে নজর দেওয়ার মতো মানসিকতাও ছিলো না। অথবা বলা যায় যে, চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী থাকায় সে সুযোগও তাঁর তেমনি হয়নি। তা সত্ত্বেও, প্রথম জীবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় পর্যন্ত ছ–সাত দশকের মধ্যে সমাজ যে আগের জায়গা থেকে অনেকটা সরে এসেছিলো, তা তিনি অভ্রান্তভাবে লক্ষ করেছিলেন। বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা, সমাজে নারীদের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা, পর্দাপ্রথা এবং পোশাক–পরিচ্ছদে পরিবর্তন দেখা দেওয়ার বিষয়ে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, তাঁর বাল্যকালে মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া করা একেবারে নিষিদ্ধ এবং অবাঞ্ছিত ছিলো। অপর পক্ষে, বার্ধক্যে এসে তিনি লক্ষ করেন যে, মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের অভিভাবকদের মনোভাবে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এসেছে। এই অনুকূল পরিবেশে 'এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন।' 'এখন যাহার একটি মেয়ে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়।' 'এখনকার মেয়েগুলা লেখাপড়া শিখিব বলিয়া পাগল হয়।'

রাসসুন্দরীর যৌবনকালে বিশেষ করে নতুন বৌদের জন্যে পর্দার কড়াকড়ি এবং অনাবশ্যক লজ্জার যে বাড়াবাড়ি দেখেছিলেন, তার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর যৌবনে বুক পর্যন্ত ঝোলানো ঘোমটা 'মোটামোটা কাপড়, ভারী ভারী গহনা, হাত পোরা শাঁখা' এবং যেসব অলঙ্কার ছিলো, তাঁর বার্ধক্যে এসে 'সে সকল পরণপরিচ্ছদ' প্রায় লোপ পেয়েছিলো। তার থেকেও বড়ো কথা বধূরা যে ধরনের লজ্জা ও সংকোচ দেখাবে বলে আগে প্রত্যাশিত ছিলো, তাও অনেকাংশে লোপ পেয়েছিলো।

কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন এসেছিলো মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা এবং তাঁদের কর্ম–ভূমিকার ক্ষেত্রে। তাঁর প্রথম জীবনে এ বিষয়ে তিনি যা দেখেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'সে কালে মেয়েদের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না; নিজের ক্ষমতায় কোন কর্ম করিতে পারা যাইত না, সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হইয়া কাল যাপন করিতে হইত। সে যেন এককালে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো থাকা হইত।' আর

অন্যরা মেয়েদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করতেন, তা হলো, 'মেয়ের ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করিবে, রান্নাবান্না করিবে, লাজশরম করিবে।'

রাসসুন্দরী এ কথা লেখেন ১৮৭০-৭৩ সালে। তা ছাড়া, তিনি কলকাতার শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলাদের দেখে এ কথা লেখেননি। বরং এ পরিবর্তন তিনি গ্রামের শিক্ষিত হিন্দু পরিবারেই লক্ষ করেছিলেন। সত্য বটে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী স্বামী ও পরিবার নিয়ে অথবা রামবাগানের দত্ত পরিবারের দুটি কন্যা – তরু এবং অরু – ততোদিনে ইউরোপে চলে গেছেন লেখাপড়া শেখার জন্যে, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে গেছেন তাঁকে আধুনিকা করে তোলার উদ্দেশ্যে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী একাধিকবার বোম্বাই ঘুরে এসেছেন এবং লাটভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণে গেছেন স্বামীকে ছাড়াই। কেশব সেন পরিচালিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা পর্দার বাইরে এসে সবার সঙ্গে একযোগে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারীদের স্বাধীনতার অন্যতম উৎসাহী কর্মী কেশব সেনকে ঠাট্টা করে প্রহসন লিখলেও নিজের স্ত্রীকে শেখাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়তে।[৩০] কিন্তু এসবই হয়েছিলো কলকাতা নগরীর কয়েকটি ব্রাহ্ম এবং ইংরেজি শিক্ষিত পরিবারে। এসবের ঢেউ এসে গ্রামবাংলার সমাজে অভিঘাত করেনি।

বস্তুত গ্রামের মহিলাদের পারিবারিক এবং সামাজিক মর্যাদায় তখনো সামান্যই পরিবর্তন এসেছিলো। তা সত্ত্বেও নারীদের উন্নতি সম্পর্কে রাসসুন্দরী অনেকটা ইতিবাচক মন্তব্যই করেছিলেন। তিনি যা বলেছেন, তা থেকে মনে হয়, গ্রামবাংলায় ব্যাপকভাবেই এই সমাজ পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিলো। কিন্তু তা সঠিক নয়। তিনি লিখেছেন, 'এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়।' ঐতিহাসিকরা এখন তখনকার যে-সমাজচিত্র পুনর্গঠন করেছেন, এখন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ভূমিকার বিচারে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পরিবার এবং সমাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের অবস্থান ছিলো অনেক নিচে। তা সত্ত্বেও রাসসুন্দরী তখনকার অবস্থা দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এ থেকেই অনুমান করা যায়, তাঁর প্রথম জীবনে নারীদের সামাজিক অবস্থান কতো নিচুতে দেখেছিলেন।

ঘরের কাজ, শাশুড়ি এবং ননদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং আচরণ, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ধীরে ধীরে যে-পরিবর্তন ছাপ পড়ছিলো, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'সকল বিষয় এখন যে পরিবর্তন হইয়াছে, সেকালের লোক এখন দেখিলে তাহাদিগের আর বাঁচিতে হইত না, দুঃখ আর ঘৃণাতেই মরিত।' সমাজ-পরিবর্তনের কথা লক্ষ করলেও, আগেই বলেছি, রাসসুন্দরী তাঁর সীমাবদ্ধতাবশত সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো আলোচনা অথবা বিশ্লেষণ করেননি, অথবা করতে চাননি।

রাসসুন্দরীর রচনার একটি প্রধান সুরই হলো বিস্ময়। জগৎ এবং জীবনকে তিনি দেখেছিলেন একান্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। তিনি যে খুব ধারালো চেহারার সুন্দরী নারী

ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। হয়তো তাঁর সে জন্যে প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিলো। তাঁর দেহ যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং এক–এক রূপ নিয়েছে, 'এই শরীর হইতে কত আশ্চর্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে' সে কথা তিনি বারবার বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তবে এই বিস্ময় তাঁকে হতভম্ব করেনি অথবা তিনি সংসারের বৈচিত্র্যজালের রহস্য দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে ভেদও করতে চেষ্টা করেননি। সহজ সমাধানই তিনি খুঁজে নিয়েছেন এবং সবকিছুকেই পরমেশ্বরের লীলা বলে বিবেচনা করেছেন। বস্তুত ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ এবং অবিচল বিশ্বাস গড়ে উঠেছিলো তাঁর বাল্যকাল থেকেই। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান হিশেবে তিনি তাঁদের বাড়িতে স্থাপিত 'দয়ামাধবের' মূর্তিকে কখনো বিগ্রহ অথবা নির্গুণ ঈশ্বরের মতো বিবেচনা করেননি। তিনি মনে করতেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনার পেছনেই রয়েছে তাঁর দয়ামাধবের ইচ্ছা। তাঁর রচিত *আমার জীবন* এবং তাঁর পৌত্রী সরলাবালা সরকারের *হারানো অতীত* উভয় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসসুন্দরী দয়ামাধবকে জীবন্ত এবং সগুণ ঈশ্বর বলেই বিশ্বাস করতেন।

সাত

রাসসুন্দরীর *আমার জীবন* বাংলায় প্রকাশিত প্রথম আত্মজীবনী। ১৮৭৫ সালে এ গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, আগেই বলেছি, ততোদিনে কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীও বোধহয় তাঁর আত্মজীবনী লিখে ফেলেছেন, বা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সম্ভবত লিখেছিলেন। কিন্তু এর কোনোটিই প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং রাসসুন্দরীর সামনে আত্মজীবনীর কোনো আদর্শ ছিলো না। তা ছাড়া, পরবর্তীকালে যাঁরা আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন, তিনি তাঁদের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়াও শেখেননি। অথবা তাঁদের মতো তাঁর সামাজিক মর্যাদা অথবা খ্যাতিও ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আত্মজীবনী অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তাঁর সরলতা এবং আন্তরিকতার দরুন। কাঠামো এবং রচনাশৈলীর জন্যেও বাংলা আত্মজীবনীর ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন দাবি করতে পারে। বেশির ভাগ আত্মজীবনীর মতো *আমার জীবন* কালানুক্রমিক জীবনবৃত্তান্ত নয়। তিনি জীবনীটি বিভক্ত করেছেন প্রধানত বিষয়বস্তু অনুযায়ী।

তবে ভাবালুতার বাড়াবাড়ি এবং পণ্ডিতী নিষ্ঠার অভাবে বহু জায়গাতেই পুনরাবৃত্তি এসেছে। এক অধ্যায়ের বিষয়বস্তু গড়িয়ে গড়িয়ে অন্য অধ্যায়ে চলে গেছে। বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে লেখা হলেও, এ গ্রন্থের ভাষা মোটেই সে ধরনের গদ্যে লেখা রচনা নয়। অবশ্য না–হওয়ারই কথা, কারণ তিনি তাঁদের বই পড়া দূরে থাক, তাঁদের নামও শুনেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। *আমার জীবনের* প্রথম সংস্করণের বানান সংস্কৃতায়ত বানান থেকে অনেক জায়গাতেই আলাদা। এ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবশ্য এই অ–সংস্কৃত বানানই প্রচলিত ছিলো। দ্বিতীয় এবং

তৃতীয় সংস্করণের বানানের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। তা থেকে মনে হয়, তাঁর প্রকাশক অথবা তাঁর পৌত্ররা তাঁর বানান কিছু বদল করেছিলেন।

রাসসুন্দরী নিঃসন্দেহে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ এবং লিঙ্গবৈষম্যের কারণে তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ লাভ করতে পারেনি। তাঁর পরে যাঁরা জন্মেছিলেন, তেমন অনেক মহিলাই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সমকালীন এবং উত্তর–প্রজন্মের মহিলাদের জন্যে বিরল এবং সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা যা করেছেন, তা সজ্ঞানেই দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে করেছিলেন। কিন্তু রাসসুন্দরী সংসারের একটি কোণে বসে সসংকোচ জীবন যাপন করে গেছেন। কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাননি, অথবা তাঁর কাজের জন্যে কোনো কৃতিত্বেরও দাবি করেননি। নিতান্ত আপন প্রাণের টানে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তবে নিজের অজ্ঞাতে তারই মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্বের দাবি রেখে গেছেন। বাঙালি মহিলাদের ইতিহাসেই নয়, বাঙালির ইতিহাসেও তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

---

১ প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন গ্রেনেদার বাদশা আবদুল্লাহ, একাদশ শতাব্দীতে। লেখা হয়েছিলো স্প্যানিশ ভাষার প্রথম আত্মজীবনী। পনেরো শতকে মুঘল বাদশা বাবর তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেন। কিন্তু বাংলায় আত্মজীবনী লেখার সূচনা হয় ইংরেজি আত্মজীবনী থেকে – যা প্রথমে প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের শেষ দু দশকে।

২ রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন (প্রথম সংস্করণ; কলকাতা : ১২৮৩), পৃ. ৫৭।

৩ ঐ, পৃ. ৮০।

৪ ঐ, পৃ. ৫৮।

৫ ঐ, পৃ. ১৯।

৬ ঐ, পৃ. ৫৯।

৭ ঐ, পৃ. ২৯।

৮ ঐ, পৃ. ৬৪।

৯ ঐ, পৃ. ৬৫।

১০ ঐ, পৃ. ৪৩।

১১ ঐ, পৃ. ১২৮।

১২ ঐ, পৃ. ৯৯।

১৩ ঐ।

১৪ ঐ, পৃ. ৮৩।

১৫ ঐ, পৃ. ২৫।

১৬ ঐ, পৃ. ২৬।

১৭ ঐ, পৃ. ২৮।

১৮ ঐ, পৃ. ৩১।

১৯ ঐ।

২০ ঐ, পৃ. ২৭।

২১ ঐ, পৃ. ৩৪।

২২ ঐ, পৃ. ৩৬।

২৩ ঐ, পৃ. ৩৫।

২৪ ঐ, পৃ. ৩৬।

২৫ আমার জীবনী, পৃ. ৫৩।

২৬ ঐ, পৃ. ৫৫।

২৭ ঐ, পৃ. ৪৮।

২৮ ঐ, পৃ. ৪৩।

২৯ ঐ, পৃ. ৫৪।

৩০ গোলাম মুরশিদ, Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization (Rajshahi: Sahitya Samsad, Rajshahi University, 1983), Chapters 2 and 3.

২

প্রথম মহিলা গ্রন্থরচয়িতা

কৈলাসবাসিনী দেবী

বঙ্গদেশে মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা পুরুষদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকার একটা প্রধান কারণ তাদের শিক্ষার অভাব। প্রাচীন ভারতে গার্গী কি মৈত্রেয়ীর মতো দু চারটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত থাকলেও, কেবল বঙ্গদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই মুসলিম আমলে এবং ইংরেজ আমলের প্রথম প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত মহিলাদের লেখাপড়া না-শেখানোই ছিলো জনপ্রিয় রীতি। এই রীতি সত্ত্বেও কোনো কোনো মহিলারা যে, তার কারণ তাঁরা ছিলেন নিতান্ত ব্যতিক্রম, যেমন আগের অধ্যায়ে রাসসুন্দরীর দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি। সেই আমলে মহিলাদের এই সার্বজনিক নিরক্ষরতার মধ্যেও এক এক সময়ে এক-একজন মহিলা তাঁদের অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ রকমের একজন মহিলা কৈলাসবাসিনী দেবী।

তাঁর একটি প্রবন্ধের বই ছাপা হয় ১৮৬৩ সালে। সম্ভবত এটিই কোনো বাঙালি নারীর লেখা প্রথম প্রবন্ধের গ্রন্থ। এখানে সম্ভবত বলার কারণ এই যে, কৈলাসবাসিনী দেবীর বছর দুয়েক আগে পাবনার বামাসুন্দরী দেবীরও একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই আড়াই হাজার শব্দের প্রবন্ধটিকে কেউ বই বলে বিবেচনা করলে কৈলাসবাসিনী প্রথম গ্রন্থকার/গ্রন্থকর্ত্রী হিশেবে মর্যাদা পাবেন না। কিন্তু সত্যিকারভাবে একটা গোটা বই প্রকাশের কৃতিত্ব কৈলাসবাসিনীরই প্রাপ্য।

যেকালে মেয়েদের জন্যে লেখাপড়া করা একেবারে বারণ ছিলো এবং লেখাপড়া করলে বৈধব্য দেখা দেবে অথবা সংসারের অমঙ্গল হবে বলে বিশ্বাস করা হতো, সেই কালে কিভাবে একজন মহিলা লেখাপড়া শিখলেন, বই লেখার অনুপ্রেরণা পেলেন এবং তারপর সেই বই ছাপানোর সুযোগ পেলেন – সেটা নিঃসন্দেহে বিস্ময় এবং কৌতূহলের ব্যাপার। বর্তমান অধ্যায়ে সে বিষয়েই আলোচনা করবো।

এই মহিলা সত্যিকারভাবে অসামান্য হলেও, তাঁর জীবনী সম্পর্কিত তথ্য বলতে গেলে কিছুই রক্ষা পায়নি। কিন্তু তিনি এমন এক পরিবেশে বিবাহিত জীবন

অতিবাহিত করেছেন যে, তাঁর সম্পর্কে তথ্য রক্ষা পাওয়া উচিত ছিলো। তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তা জানা যায়, তাঁরই বই-এর ভূমিকা, স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের মুখবন্ধ এবং একটি প্রতিষ্ঠাপত্র থেকে। তাঁর সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠাপত্র লিখেছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য - আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

পাছে পাঠক-পাঠিকারা মনে করেন যে, এ বই আসলে কৈলাসবাসিনীর রচনা নয়, বরং কোনো পুরুষেরই রচনা অথবা নিদেন পক্ষে কোনো পুরুষের সাহায্য নিয়ে রচিত, সে জন্যে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই প্রতিষ্ঠাপত্রটি লিখেছিলেন। এতে তিনি বলেছেন যে, কৈলাসবাসিনী নিজেই এ বই রচনা করেছেন এবং এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের এই সাক্ষ্য সত্ত্বেও অনেকেই যে এটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি, তা জানা যায়, কৈলাসবাসিনীর দ্বিতীয় গ্রন্থে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের লেখা আর-একটি প্রতিষ্ঠাপত্র থেকে। সে যাই হোক, এই ভদ্রলোক দুটি বই-এর সূচনায় তাঁর অপ্রতুল পরিচয় দিয়েছেন, তা ছাড়া, লেখিকা নিজেও নিজের সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর জীবনী পুনর্গঠনের সূত্র আপাতত এইটুকুই।

কৈলাসবাসিনী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৭ সালে। ১৮৪৯ সালে বারো বছর বয়সে তাঁর যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। কেবল তাই নয়, মেয়েরা লেখাপড়া করবে, এই ধারণাকেই তিনি তখন ঘৃণা করতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো দুর্গাচরণ গুপ্ত নামে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক যুবকের সঙ্গে। তিনি সম্ভবত হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শেখেন। কলেজের বাইরে তিনি ব্রাহ্মদের আদর্শ দিয়ে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো, তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন না। বরং ১৮৫৫ সালের পরে প্রকাশিত একটি রচনায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কৈলাসবাসিনীর স্বামীর যোগাযোগ থাকলে ব্রাহ্মদের পরিচালিত মহিলা বিষয়ক পত্রিকা বামাবোধিনীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিলো। কিন্তু তা হয়নি, যদিও তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তার একটি দীর্ঘ সমালোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

দুর্গাচরণ ছিলেন সত্যিকার অর্থে উনিশ শতকের বাঙালি 'ভদ্রলোক'-সমাজের একজন প্রতিনিধি। তিনি কেবল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হননি, রীতিমতো উদ্যোগী পুরুষের মতো সেই লেখাপড়াকে অন্য আর পাঁচজনের মতো পারিবারিক ও বৈষয়িক কাজে ব্যবহার করেছিলেন। ভাবাদর্শের দ্বারা পরিচালিত কোনো কোনো ব্রাহ্ম নেতার সঙ্গে এখানে তাঁর অমিল লক্ষ করি। এই নেতারা অনেকেই ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। অপর পক্ষে, দুর্গাচরণ ধর্ম এবং বিষয়জ্ঞানের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

তিনি অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। কিন্তু দর্শন অথবা সাহিত্যের নয়। তা ছাড়া, তিনি সম্পাদনা করেছিলেন একাধিক ছোটোবড়ো বাংলা, বাংলা-ইংরেজি এবং

ইংরেজি–বাংলা অভিধান। এসব অভিধান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। তাঁর বাংলা পকেট অভিধান প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। পকেট অভিধানের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন যে, প্রথম সংস্করণ দশ হাজার কপি ছাপাতে পারলে নতুন হরফ তৈরির দাম উঠতো। কিন্তু অভিধানটি কেমন চলবে, তা পরখ না করে তিনি এই ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই প্রথম সংস্করণ ছাপিয়েছিলেন মাত্র দু হাজার কপি। তেরো মাস পরে – ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে যখন দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপান, তখন ছাপিয়েছিলেন পাঁচ হাজার কপি। একই বছর পকেট ইংলিশ বেঙ্গলি ডিকশনারি প্রকাশ করেন তিন হাজার কপি। তখন বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুপাঠ্য বই ছাড়া, কোনো বই–ই এতো বেশি সংখ্যায় ছাপা হতো না। ১৮৮৩ সালে পকেট অভিধানের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর বড়ো সংস্করণ – গুপ্ত প্রেশ অভিধান বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও চালু ছিলো। ১৯০৫ সালে এর যে–সংস্করণ হয়, তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৯৬২। তাঁর ইংরেজি বাংলা পকেট অভিধানের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে।

অভিধান ছাড়া, দুর্গাচরণ আর–একটি প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা একশো বছর পরেও টিকে আছে – গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকা। প্রথমে এ পঞ্জিকার নাম তিনি দিয়েছিলেন সচিত্র ফুল পঞ্জিকা। এটির নাম ফুল দেবার কারণ তাঁর প্রেস থেকে আর–একটি সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকাও প্রকাশিত হতো। যে–সমাজে পুজো–পার্বণ লেগেই আছে, সে সমাজে এমন একটা পঞ্জিকার চাহিদা থাকবে, এটা তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। বস্তুত, তখন নূতন পঞ্জিকা নামে আরো একটি পঞ্জিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তা ছাড়া, শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একটি পঞ্জিকাও বহু বছর ধরে একনাগাড়ে চলেছিলো। দুর্গাচরণ গুপ্ত অন্য পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে দ্বিভাষিক সচিত্র শিশুবোধ এবং গুপ্ত প্রেশ বর্ণমালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর বই প্রকাশের জন্যে তিনি কলকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকে পূর্বোক্ত বইগুলো ছাড়াও, সচিত্র কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী ইত্যাদি সুলভ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতো। লেইনের ইংরেজিঅ্যারাবিয়ান নাইটসের বাংলা অনুবাদ হলো সহস্র রজনী। এই অনুবাদ করেছিলেন সত্যচরণ গুপ্ত, সম্ভবত দুর্গাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই প্রেস তিনি স্থাপন করেছিলেন পটলডাঙ্গার মীরজাফর লেইনে। এই প্রেস ছাড়া, গুপ্ত ব্রাদার্স নামে তাঁর একটি বই–এর দোকানও ছিলো কলেজ স্ট্রীটে। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাচরণকে আখ্যায়িত করতে হয় বই বিপণনের রীতিমতো বিশেষজ্ঞ হিশেবে। প্রতিটি বই যাতে প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি করা সম্ভব হয়, তার জন্যে তিনি গ্রাহকদের কাছ থেকে আগাম চাঁদা নিয়ে বই প্রকাশের রীতি চালু করেছিলেন। সচিত্র একাধিক আরব্য রজনী যেমন মোট আট খণ্ডে প্রকাশিত হবে বলে তিনি বিজ্ঞাপন দেন। এতে বলা হয়, প্রতিটি খণ্ডের দাম পড়বে এক টাকা চার আনা, মোট আট খণ্ড দশ টাকা। কিন্তু প্রকাশিত হবার পরে এর দাম পড়বে আঠারো টাকা। একই পদ্ধতিতে তিনি সচিত্র রামায়ণ এবং সচিত্র মহাভারতও প্রকাশ এবং বিক্রি করেন।

বৈষয়িক দুর্গাচরণের যে চিত্র এখানে দেখতে পাচ্ছি, সেটা অবশ্য নিতান্তই একপেশে। তাঁর চরিত্রের আর–এক দিকে ছিলো পশ্চিম থেকে আসা উদারনৈতিকতা। আর ছিলো সেই উদারনৈতিকতার আদর্শে ধর্ম এবং লোকাচার সম্পর্কে নতুন সংস্কার সচেতনতা। তখন যে–তরুণরা হিন্দু কলেজে থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন অথবা আরো পরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা এবং দাম্পত্য–সম্পর্ক বিষয়ে নতুন এক আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই আদর্শের গোড়ায় ছিলো সভ্যতা সম্পর্কে নতুন এক ধারণা : সমাজে মহিলাদের মর্যাদা কতোটা তা থেকেই প্রতিফলিত হয়, সেই সমাজ কতোটা সভ্য। তা ছাড়া, এঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে, স্বামী–স্ত্রী সম্পর্ক কতোটা সুখের হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে স্ত্রীর মানসিক বিকাশের ওপর।

বয়স ও শিক্ষার তারতম্যের দরুন সেকালে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগের এমন একটা দুস্তর ব্যবধান এবং অপরিপূর্ণতার অনুভূতি দেখা দিয়েছিলো, ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের যা বিশেষ করে অসুখী করেছিলো। ১৮৬০ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র–সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে 'কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট এবং মনের অসুখ' নামে একটি প্রবন্ধে এই অসুখের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১] জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায়ও পরের দশকে লেখা হয়েছিলো : 'যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না...।'[২] গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই নব্যশিক্ষিতদের একজন, কিশোরীচাঁদ মিত্র, বেথুন সোসাইটির এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন, তা থেকে সংক্ষেপে এঁদের মনোভাব কেমন ছিলো, তা বোঝানো যায়। এতে তিনি বলেছিলেন, মহিলাদের অশিক্ষিত রেখে কোনো জাতি সভ্য বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না। তাঁর মতে স্ত্রী শিক্ষিত না হলে স্বামী–স্ত্রী সম্পর্কও থাকে অপরিপূর্ণ।[৩]

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্গাচরণ গুপ্ত বিয়ের পরেই ১৮৪৯ সালের অগস্ট–সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁর অশিক্ষিতা বালিকা বধূকে গোপনে শিক্ষা দান করতে আরম্ভ করেন। সারা দিন সংসারের কাজকর্ম করে রাতের বেলায় কিশোরী বধূ কৈলাসবাসিনী যখন ঘুমে ঢুলুঢুলু করতেন, তখন স্বামী বাইরে থেকে এসে তাঁকে শিক্ষা দান করার কাজ শুরু করতেন। বাড়ির অন্য আত্মীয়রা যাতে টের না পান, তার জন্যে এ বিষয়ে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হতো। অবশ্য পরে আত্মীয়রা জেনে ফেলার পর তাঁরা যখন মাঝেমধ্যে কৈলাসবাসিনীকে খোঁটা দিতেন, তখন খুব বিরক্ত হয়ে তিনি দুচারবার তাঁর বইপত্রও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। মাঝেমধ্যে তিনি ক্লান্তও বোধ করতেন।[৪] কিন্তু স্বামীর প্রবল উৎসাহই এ ক্ষেত্রে জয়ী হতো। তবে কৈলাসবাসিনীর কৃতিত্বও অসাধারণ। তাঁর মন ছিলো গ্রহণশীল এবং এবং তাঁর আগ্রহও ছিলো অদম্য।

সে জন্যেই, ১৮৪৯ সালে যে–বালিকা একটি অক্ষর পর্যন্ত চিনতেন না, তিনিই এর ১৩/১৪ বছর পরে একটি বই প্রকাশ করতে সমর্থ হন। তাঁর স্বামী ভাবতেও

পারেনি, স্ত্রী লেখাপড়ায় এতোটা সাফল্য অর্জন করবেন। সে জন্যে একদিন রাতের বেলায় কৈলাসবাসিনী যখন তাঁকে পুরো লেখাটি পড়ে শোনান, তখনই দুর্গাচরণ সেটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। কৈলাসবাসিনীরও সৌভাগ্য যে তিনি বাড়িতেই সে সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য প্রকাশক পেয়েছিলেন।

স্ত্রীকে দুর্গাচরণ যেভাবে গোপনে এবং নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখান, সে রকমের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও, একেবারে অজ্ঞাত ছিলো না। এই প্রসঙ্গেই একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি কমবেশি একই সময়ের এক ব্রাহ্মদম্পতির। কুমুদিনীর স্বামীও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বাড়ির প্রতিকূল আত্মীয়দের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কুমুদিনীকে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে মূর্তিপূজা বিরোধী ব্রাহ্ম আদর্শে দীক্ষা দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই গোপন তথ্য যখন প্রকাশ পায়, তখন কুমুদিনী এবং তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হয়।[৫] কৈলাসবাসিনী আর তাঁর স্বামীর সঙ্গে কুমুদিনী আর তাঁর স্বামীর পার্থক্য এই যে, দুর্গাচরণ স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন এবং ধর্মের নামে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে সেগুলো সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে তুলেছিলেন, কিন্তু কৈলাসবাসিনীকে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেননি; নিজেও স্বধর্মের প্রতি অনুগত থাকেন।

স্বামীর নিরন্তর উৎসাহে কৈলাসবাসিনী ভালো বাংলা শিখেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর গদ্যকে সে যুগের তুলনায় বেশ উন্নত মানের বলে স্বীকার করতে হয়। তাঁর শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যকাঠামোর বৈচিত্র্য ছাড়াও, তাঁর গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি চোখে না পড়ে পারে না। চকিতে বিদ্যাসাগরের রচনাশৈলীকে মনে করিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরীয় এই গদ্যশৈলী হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা লেখার খুব বেশি আগে তৈরি হয়নি। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে কৈলাসবাসিনী খুব দ্রুত এই শৈলী আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজিও শিখেছিলেন কিনা, জানা নেই; তবে না–শেখাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

তাঁর লেখাপড়া যে স্বামীর উৎসাহ এবং সহানুভূতির ফলেই সম্ভব হয়েছে, কৈলাসবাসিনী কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসার সঙ্গে সেটা মনে করতেন। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ বিশ্বশোভার উৎসর্গপত্রে তিনি যা লিখেছেন, তা থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

> পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু
> প্রণতিপূরঃসর নিবেদনমিদং–
> ধর ধর সখা এই প্রিয় উপহার
> যাহে তব স্নেহরাশি করিছে প্রচার
> স্নেহ করি সযতনে দিয়া উপদেশ
> সুপবিত্র করিয়াছ মম মনোদেশ।
> তোমার কৃপায় আমি পেয়ে এই জ্ঞান
> অখিল–পতির কৃপা করিছি ব্যাখ্যান।[৬]

কৈলাসবাসিনী দেবীকে তাঁর স্বামী যেভাবে গোপনে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত বহু যুবকই কমবেশি তেমন চেষ্টা করে থাকবেন। কিন্তু এ বিষয়ে স্বভাবতই সবাই সমান সাফল্য লাভ করেননি। কৈলাসবাসিনী নিঃসন্দেহে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে জন্যে স্বামীর সামান্য প্রচেষ্টায়ই তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ছিলো তা বিকাশ লাভ করেছিলো। এ ক্ষেত্রে যা বিশেষ লক্ষযোগ্য তা হলো : কৈলাসবাসিনী আর পাঁচজন সাধারণ মহিলার মতো কেবল সাধারণ চিঠিপত্র লিখতে এবং পড়তেই শেখেননি। তিনি রীতিমতো ভাবতে এবং সেই ভাবনাকে প্রকাশ করতে শিখেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর মনের কথা খুলে বলার তাগিদও তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের মনের মধ্যে।

কৈলাসবাসিনীর প্রথম গ্রন্থের নাম হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। প্রকাশক দুর্গাচরণ গুপ্ত। ৭২ পৃষ্ঠার এই বইতে লেখিকা সেকালে হিন্দু সমাজে যেসব কুসংস্কার দেখা দিয়েছিলো এবং যেসবের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন মহিলারা, সেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের কৌলীন্য প্রথা এবং তার সঙ্গে যুক্ত বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের রীতি, বিধবাদের সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী, স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ইত্যাদি অবাঞ্ছিত বিষয়গুলো নিয়ে তিনি ছোটো ছোটো অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

যে–বিষয়গুলো তিনি উল্লেখ করেন এবং যেভাবে প্রত্যেকটি সমস্যার বিশদ বিবরণ দেন, তা থেকে বোঝা যায়, তিনি এগুলোর কথা ভালো করে জেনেছিলেন। তবে সমস্যাগুলো এবং সেগুলোর প্রতিকার সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, সেগুলো খুব মৌলিক, তা মনে করার কারণ নেই। বস্তুত, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে তখনকার ছোটোবড়ো সমাজ সংস্কারকরা যা বলেছিলেন, তিনি কমবেশি তারই অনুকরণ করেন। কিন্তু যা অভিনব, তা হলো : এই প্রথম একজন মহিলা হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের লিখিত সমালোচনা করেন। এবং পারিবারিক সমস্যা, বিশেষ করে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেন। সে দিক দিয়ে তাঁর এ গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (এর আগেও এ বিষয়ে মহিলাদের নামে পত্রপত্রিকায় কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিলো, কিন্তু সেগুলো সত্যি সত্যি মহিলারা লিখেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।)

যে বছর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই একই বছর ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী তরুণ উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক বামাবোধিনী পত্রিকা। মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং তাঁদের উন্নতিতে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। কয়েক বছরের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের কোনো কোনো মহিলা সদস্য, এ পত্রিকার মহিলাদের রচনা বিভাগে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছোটোখাটো মন্তব্য করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্যাপ্তি, বিন্যাস অথবা গভীরতা কোনো দিক দিয়েই কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে এই নারীদের তুলনা চলে না।

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা।

শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

এবং তৎস্বামী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৫ শক।

উক্ত যন্ত্রালয় মির্জ্জাফর্স লেন ১৬ নং ভবনে, অথবা গুপ্ত ব্রাদর্শদিগের গ্রন্থালয় কালেজ স্ট্রীট ৮৬ নং ভবনে, এবং সকল গ্রন্থালয়ে ও পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়।

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা গ্রন্থের নামপত্র

হিন্দু মহিলার হীনাবস্থায় প্রথমেই কৈলাসবাসিনী আলোচনা করেন বঙ্গদেশে মেয়েদের জন্ম যে পিতামাতা উভয়ের কাছে অবাঞ্ছিত – এ বিষয়ে। 'যদি অদৃষ্টক্রমে কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, তবে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মাতা যে কত দুঃখিত হয়েন তাহা বলিবার নহে, অধিক কি বলিব সকল বিষাদের চিহ্ন যে রোদন কেহ কেহ তাহাও করিয়া থাকেন, আর আর সুহৃদগণও অতিশয় মনস্তাপ করেন।'

এর পর তিনি আলোচনা করেন, পিতামাতা বাল্যকালে পুত্র ও কন্যার প্রতি কী বিষম আচরণ করে থাকেন, সে বিষয়ে। পুত্রদের যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করে মানুষ করতে চেষ্টা করেন। অপর পক্ষে, মেয়েদের শিক্ষাদান না-করে তাদের মূর্খ করে রাখেন। তাঁরা যে কেবল মেয়েদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন না, তাই নয়, বরং বলে থাকেন যে, তার কোনো প্রয়োজনই নেই। বাল্যকাল মেয়েদের বিশেষ করে এটাই তাঁরা শেখাতে চেষ্টা করেন যে, পুরুষদের তুলনায় তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক মর্যাদা অনেক নিচে। তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তারা যেন ভবিষ্যতে পুরুষদের শাসনের অধীনে থাকার মানসিকতা নিয়ে বড়ো হয়।

কেবল স্ত্রীশিক্ষা নয়, এ গ্রন্থে তিনি নারীদের সম্পর্কিত অন্যান্য সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন – যেগুলো নারীদের সামাজিক মর্যাদালোপ এবং হীনাবস্থার মূল কারণ। এসব সমস্যার মধ্যে তিনি প্রথমেই দৃষ্টি দেন কৌলীন্য প্রথার দিকে (পৃ. ৭–৯; ১১–২৪)। এ সমস্যা হিন্দু সমাজের একটি অত্যন্ত ছোটো অংশের সমস্যা। তা ছাড়া, কৈলাসবাসিনী নিজে ব্রাহ্মণ অথবা কুলীন কায়স্থও ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি কেন এই প্রথার দিকে প্রথমেই অথবা এতোটা মনোযোগ দেন, বলা শক্ত। হয়তো কাছাকাছি থেকে তিনি এ সমস্যার কুফলগুলো লক্ষ করে থাকবেন। কায়স্থদের কৌলীন্য প্রথার কুফল – আদ্যরস প্রথা – নিয়েও তিনি আলোচনা করেন (পৃ. ৯–১০)। বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাল্যবিবাহ প্রথাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

তবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের ঠিক কৌলীন্য প্রথা নিয়ে আলোচনা করা তাঁর অভীষ্ট ছিলো না। বরং এই প্রথাকে কেন্দ্র করে নারীদের যেসব অত্যাচার সহ্য করতে হয়, তিনি সেদিকেই তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। এই কৌলীন্য প্রথার প্রভাবে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং অনেক বয়স পর্যন্ত কুলীনকন্যাদের অবিবাহিত থাকার যে-গুরুতর সমস্যাসমূহ, সেসব নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। সমস্যাটি সম্পর্কে তিনি এতোই মনোযোগ দেন যে, ৭২ পৃষ্ঠার মধ্যে ২৮ পৃষ্ঠা জুড়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। সাধারণভাবে জাতিভেদ প্রথা এবং তার কুফল নিয়েও তিনি বেশ বিস্তৃত আলোচনা করেন।

মেয়েরা অনাদরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং তারপর বড়ো হয়ে ওঠে পিতামাতা ও আত্মীয়দের চরম অযত্নের মধ্যে এই প্রসঙ্গের পরেই তিনি নজর দেন বাল্যবিবাহ থেকে আরম্ভ করে নারীদের বিবাহিত জীবনের দিকে। এই অংশে তিনি বাল্যবয়সে বিবাহিত মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে তাদের ওপর

অন্যান্য নিপীড়নের বর্ণনা দেন। তাঁর এই বর্ণনার সঙ্গে আগের অধ্যায়ে আমরা রাসসুন্দরীর নিজের অভিজ্ঞতার যে-বিবরণ লক্ষ করেছি, তার সুস্পষ্ট মিল আছে। এমন কি, রাসসুন্দরীর ব্যবহৃত 'পিঞ্জরাবদ্ধ' ধারণার কথাও লিখেছেন কৈলাসবাসিনী।

পশুপক্ষিগণ যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ স্বস্থানের চিন্তা করে এবং সে স্থানে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত পিঞ্জরের চতুস্পার্শ্ব অবলোকন করিতে থাকে, ইহারাও প্রায় তদ্রূপ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে এবং শয়নাশনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অহর্নিশি পিতৃ আলয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং তৎস্থানে গমনের দিন গণনা করিতে থাকে, এবং তৎকালে তাহাদিগের শ্বশুরকুলস্থ কাহার প্রতি স্নেহের সঞ্চার হয় না...।[৭]

ফলে স্বামীর বাড়ি তাদের কাছে 'পরের বাড়িতে' পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে রাসসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। সঙ্গে যুক্ত দোষগুলোর দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেবার কারণ যাই হোক, এ সম্পর্কে তিনি বেশ বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেন। কুলীন কন্যাদের বিবাহ না হওয়ার এবং অসম বিবাহের সমস্যা, ভঙ্গ কুলীনদের বহুবিবাহ, বংশজদের জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং কন্যা বিক্রয়, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের কন্যাপণ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। বহুবিবাহকারী কুলীনদের স্ত্রী এবং সন্তানদের দুর্ভোগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিকতাবিরোধী কাজকর্মের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তা ছাড়া, নিজে কায়স্থ ঘরের স্ত্রী হিশেবে কায়স্থদের আদ্যরস সমস্যার দিকেও দৃষ্টিপাত করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার উদারনৈতিকতা এবং যুক্তিবাদের প্রভাবে মানুষের সমান মর্যাদার বিষয়ে সেকালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছিলো – অন্তত তত্ত্বত। কৈলাসবাসিনীর মধ্যেও এর ইঙ্গিত লক্ষ করি। জাতিভেদ নিয়ে তিনি বেশ দীর্ঘ এবং আবেগপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি যখন স্বামীর তদারকিতে লেখাপড়া শিখছিলেন, তাঁর সেই প্রথম যৌবনে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর, আবেগপূর্ণ এবং মুখরোচক প্রসঙ্গ ছিলো বিধবাবিবাহ। ১৮৫৬ সালে যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হয় তখন কৈলাসবাসিনীর বয়স ১৯ বছর। বিধবাবিবাহের পক্ষে আইন প্রণয়নের জন্যে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে যে আবেদনপত্র সরকারের কাছে প্রেরিত হয়, তাতে অন্তত একটি দুর্গাচরণের নামও দেখতে পাচ্ছি। যদিও ইনি কৈলাসবাসিনীর স্বামী দুর্গাচরণ কিনা, হলফ করে তা বলতে পারবো না। কিন্তু দুর্গাচরণ এবং সেই সুবাদে কৈলাসবাসিনী যে খুব কাছ থেকে বিধবাবিবাহ আন্দোলন লক্ষ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে কারণেই বিদ্যাসাগরের শত চেষ্টা এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ যখন ঠিক জনপ্রিয়তা লাভ করলো না, এবং বিদ্যাসাগর বলতে গেলে এ বিষয় থেকে অবসর নিলেন, মোটামুটি তেমন সময়েই কৈলাসবাসিনী হতাশার সুরে মন্তব্য করেন যে, এ আন্দোলনের জন্যে বিদ্যাসাগর

আমি যে মহাত্মার কৃপাবলে এতাদৃশ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলাম, প্রথমত তাঁহার নিকট আমার সমধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধে আমি সর্ব্বসাধারণ সন্নিধানে আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটী বর্ণও শিক্ষা করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধিনী ছিলাম; সুতরাং তাঁহার সেই যত্ন আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইল। আমি কোন মতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না, কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭৭১ শকের শ্রাবণ মাসে আমাকে বর্ণমালার প্রথম ভাগের উপদেশ দেন; আমি সেই অবধি গোপন ভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম, এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া

হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা গ্রন্থে কৈলাসবাসিনীর ভূমিকা

যতো পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করেছেন, তার শতাংশও সাফল্য আসেনি। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, তবু লোকে একে গ্রহণ করছে না। তাঁর মন্তব্যে বিধবাবিবাহের প্রতি বিশেষ করে বালবিধবাদের বিবাহের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সহজেই চোখে পড়ে।

বিয়ে না হওয়াই সেকালে বিধবাদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিলো না। তাঁদের অন্য যেসব কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হতো, সেও ছিলো অমানুষিক। কৈলাসবাসিনী তারস্বরে এসবের প্রতিবাদ করেছেন। বৈধব্যের কষ্টকে তিনি অসহ্য বলে গণ্য করেছেন। ক্ষোভ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন যে, প্রাচীন কালের যে শাস্ত্রকারগণ দয়াকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে অভিহিত করেছেন, সেই একই শাস্ত্রকারগণ নির্দয়ভাবে বালবিধবাসহ সকল বিধবার জন্যে বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য এবং অন্যান্য শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনার বিধান দিয়েছেন। সব শেষে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন : 'স্বদেশবাসীগণ তোমরা বিধবাদের উদ্ধার কর।' এখানে লক্ষণীয়, তিনি বিধবাদের বিয়ে দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করার আহ্বান জানাননি। কারণ তিনি জানতেন, বিধবাবিবাহের আদর্শকে হিন্দু সমাজ গ্রহণ করেনি। বস্তুত, তিনি বিধবাদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল এবং মানবিক আচরণই কামনা করেছেন।[৮]

বৈধব্যের সঙ্গে কৌলীন্য এবং বাল্যবিবাহের সমস্যা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কৈলাসবাসিনী তার দিকেও নজর দিয়েছিলেন। এবং কৌলীন্য প্রথার পরে বাল্যবিবাহ এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমস্যা নিয়েই তিনি সবচেয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাল্যবিবাহই নারীর তথা বৃহত্তর সমাজের হীনাবস্থার প্রধান কারণ। কৌলীন্য প্রথা সমাজের ছোটো একটি অংশের সমস্যা হলেও বাল্যবিবাহের ফলে গোটা সমাজই যে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা তিনি সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে দুটি বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো : কম বয়সে বিয়ে হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বাঞ্ছিত বোঝাপড়া হয় না। আর দ্বিতীয়টি হলো : এই বোঝাপড়ার অভাবেই অন্য মেয়ের প্রতি স্বামীর আসক্তি তৈরি হয়। কৈলাসবাসিনী সৌভাগ্যক্রমে সহানুভূতিশীল এবং অনুরাগী স্বামী পেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চয় তাঁর চার দিকে বহু অসুখী দম্পতিই দেখে থাকবেন। যে যুগের কলকাতার বাবুরা বাগানবাড়িতে রাখা রক্ষিতার কাছ থেকে সঙ্গ নিতেন, আর সন্তান জন্ম দেবার জন্যে যেতেন স্ত্রীদের কাছে, সে যুগে কৈলাসবাসিনীর মতো একজন সমাজসচেতন মহিলার এটা চোখে না-পড়ে পারে না। বস্তুত, তাঁর স্বামী তাঁর প্রতি অতো দরদী ছিলেন বলেই হয়তো অন্যদের পারিবারিক সম্পর্কে যে-ফাঁকি বিরাজ করতো, তার প্রতি তাঁর বেশি নজর পড়েছিলো।[৯]

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যাতে মনের সত্যিকার মিল হয় এবং বোঝাপড়া বেশি মাত্রায় থাকে, তার জন্যে তিনি পতি এবং পত্নী উভয়ের পছন্দ অনুসারে বিয়ে হওয়া উচিত বলে মতামত দিয়েছিলেন। তাঁর কয়েক বছর আগে অক্ষয়কুমার দত্তও অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কৈলাসবাসিনীই সবার আগে এই

মত দেন। বলা বাহুল্য, যেকালে বেশির ভাগ মেয়েদেরই বিয়ে হতো দশ বছর পুরো হবার আগে, সেকালে মেয়েদের তরফ থেকে পছন্দ করে বিয়ে করার প্রশ্ন ছিলো একেবারে অবান্তর। কিন্তু বিয়েতে সে সময়ে কেবল মেয়েদের পছন্দ নয়, পাত্রদের পছন্দকেও অভিভাবকরা সামান্যই মূল্য দিতেন, অথবা আদৌ তাদের মতামত নেওয়ার চেষ্টাও করতেন না। কৈলাসবাসিনীর সাড়ে তিন দশক পরে পশ্চিমা ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত অভিজাত পরিবারের বিলেতফেরত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অত্যাধুনিক ফুলবাবু রবীন্দ্রনাথের যখন বিয়ে হয়েছিলো একটি এগারো বছরের অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে তখন তাঁর মতামতের জন্যে তাঁর অভিভাবকরা খুব একটা পীড়াপীড়ি করেছিলেন বলে, জানা যায় না। তাঁর বৌদিরাই তাঁর হয়ে কনে পছন্দ করেছিলেন। সুতরাং কৈলাসবাসিনী নিতান্তই অকালে নিজের পছন্দ মোতাবেক বিয়ে করার অবাস্তব প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে হবার পক্ষে তিনি অবশ্য কম অথবা দুর্বল যুক্তি দেননি। যদিও তাতে কতোটা নতুনত্ব ছিলো, সেটা তর্ক সাপেক্ষ। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে না করলে যেসব কুফল দেখা দিতে পারে, তাঁর মতে, তার প্রধান দুটি হলো : পুরুষদের মধ্যে বেশ্যাসক্তি আর সংসারে নানা রকমের অশান্তি। সুতরাং পাত্র এবং পাত্রী সমতুল্য না হলে তাদের বিয়ে হওয়া উচিত নয়, কারণ তার ফলে সুখ হয় না। কৈলাসবাসিনীর এ উক্তিও আদর্শবাদী এবং অবাস্তব। এবং তাঁর এ প্রস্তাব মেনে নিলে উনিশ শতকের বিখ্যাত বাঙালিদের কারো পক্ষেই বোধ হয় বিয়ে করা সম্ভব হতো না। তিনি বলেছিলেন, বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী–স্ত্রীর বারংবার ঝগড়া হওয়া থেকে আরম্ভ করে স্বামীর পক্ষে লম্পট হওয়া পর্যন্ত সবই সম্ভব। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, প্রথম যৌবনে উপনীত স্বামী–স্ত্রীর সন্তান হলে সে সন্তান স্বল্পায়ু এবং রুগ্‌ণ হয়। এ ছাড়া, এ রকমের স্বামী–স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে পারে। তদুপরি প্রসবের সময়ে স্ত্রীর পক্ষে মরে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বাল্যবিবাহ করলে বড়ো সংসারের ভার যেহেতু অল্পবয়সী স্বামীর ওপর অর্পিত হয়, সে কারণে এ ধরনের সংসার স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যগ্রস্ত হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে, মৃত্যুর হার শিশুদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বলে বাল্যবিবাহের ফলে বালবৈধব্যও বৃদ্ধি পায়। সেকালে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বধূদের সম্পর্ক প্রায়ই খারাপ হতো এবং এটাও তাঁর মতে বাল্যবিবাহের অন্যতম কুফল। উপসংহারে তিনি বলেন, বালবৈধব্য এবং বহুবিবাহের সমস্যা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ না–করলে দূর করা সম্ভব হবে না।

কৈলাসবাসিনী বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়িতে এসেছিলেন বারো বছর বয়সে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা কতোটা মর্মান্তিক হয়েছিলো, সে সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেননি। কিন্তু বারো বছর বয়সে রাসসুন্দরী দেবীর যে সকরুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তাঁর আত্মজীবনী থেকে তার অসাধারণ বর্ণনা আগের অধ্যায়ে লক্ষ করেছি। ধারণা করি, কৈলাসবাসিনীর অভিজ্ঞতাও এমন কিছু সুখের ছিলো না। সে জন্যেই বালিকাবধূর স্বামীর বাড়িতে যাবার প্রসঙ্গ এবং তার প্রতি শাশুড়িদের

মায়ামমতাহীন আচরণের কথা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, বালিকাবধূকে বলপূর্বক শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয়। এবং সেখানকার অনাত্মীয় পরিবেশে বালিকার ক্লেশের সীমা থাকে না। শাশুড়ি আনুষ্ঠানিকতার অঙ্গ হিশেবে খুব ঘটা করে অন্যের সামনে বধূকে বরণ করেন বটে; কিন্তু তার অল্প পরেই বধূর প্রতি বিপরীত আচরণ করতে আরম্ভ করেন। ফলে বধূদের অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করতে হয়। শাশুড়িরা বধূদের বয়স অথবা শিক্ষা বিচার করেন না। তাঁরা কেবল বিচার করেন, বধূরা কাজ জানে কিনা এবং তাদের স্বভাব কেমন।[১০]

এই শাশুড়িরা নিজেদের পুত্রকন্যাদের গুণ না থাকলে সেটাকে ক্ষমা এবং স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্তু বধূদের পান থেকে চুন খসলেই খড়্গহস্ত হন। শাশুড়িদের সবচেয়ে অসঙ্গত যে আচরণের কথা কৈলাসবাসিনী উল্লেখ করেছেন, তা হলো শাশুড়িরা তাঁদের পুত্রকন্যাদের প্রতি স্নেহে অন্ধ, কিন্তু বধূদের প্রতি সামান্য স্নেহও বোধ করেন না।[১১] তাঁর বিবেচনায় শাশুড়িরা বধূকে পরিচারিকা বলেই গণ্য করেন এবং তাকে দিয়ে পরিচারিকার কাজই করান। পুত্র বিয়ে করতে যাবার সময়ে সেকালে মায়ের কাছে অনুমতি নিতে গিয়ে বলতো, তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। কৈলাসবাসিনীর মতে শাশুড়ি সেই সুভাষণকেই চিরন্তন প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করে পরবর্তী কালে তাকেই বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পান। এখানে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তাঁর বিশ্লেষণে কৈলাসবাসিনী একপেশে মনোভাবের পরিচয় দেননি। কোনো কোনো বধূও যে শাশুড়ির প্রতি অন্যায় আচরণ করতো, সে কথাও তিনি মেনে নিয়েছেন।[১২]

শাশুড়ি ছাড়া, ননদ এবং জাদের সঙ্গেও বধূদের সম্পর্ক যে টানাপোড়েনে পরিপূর্ণ ছিলো, কৈলাসবাসিনী তারও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে ননদরা ভ্রাতৃবধূকে প্রায় সপত্নীর মতো বিবেচনা করে। তাদের প্রধান কাজ বধূদের ছিদ্রান্বেষণ করা এবং গুরুজনদের কাছে বধূদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা। তিনি জানতেন, এই বধূদের সঙ্গে শাশুড়ি–ননদ–জাদের সম্পর্ক উন্নত করা কোনো সহজ কাজ নয়। সে জন্যে তিনি শিক্ষিত পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তাঁরা মহিলাদের শিক্ষা দিয়ে তাঁদের সংকীর্ণ হৃদয়কে সরল এবং উদার করেন।

একজন স্ত্রী হিশেবে কৈলাসবাসিনীর প্রধান উদ্বেগের কারণ অবশ্য স্বামী–স্ত্রী সম্পর্ক এবং স্বামীর বাড়িতে স্ত্রীর মর্যাদা। তিনি লক্ষ করেছিলেন, স্ত্রীরা আসলে 'পাচিকা, পরিচারিকা, ধাত্রী এবং কখন কখন পরিচারকের কর্মও করিয়া থাকে।'[১৩] তাঁর এই মন্তব্যও নতুন নয়, তাঁর ৪৪ বছর আগে রামমোহন রায়ও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।[১৪] কিন্তু এর মধ্যে যা নতুন তা হলো : এর ভেতর দিয়ে এই প্রথম এক মহিলার ক্ষোভ প্রকাশ পেলো। তিনি দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, সংসারে দাম্পত্য প্রণয়ের দারুণ অভাব। যে–স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করে, সমাজের চোখে তারা যে স্ত্রৈণ বলে বিবেচিত,

কৈলাসবাসিনী সরাসরি সে কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর লেখার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে সে কথা আমরা বড়ো হরফেই দেখতে পাই।

মেয়েদের শিক্ষা দিলে অথবা তাদের অবরোধ মোচন করলে, তারা স্বামী অথবা গুরুজনদের মানবে না, কৈলাসবাসিনীর যে বছর বিয়ে হয়, মোটামুটি সে সময়েই এ কথাটাকেই রং চড়িয়ে লিখেছিলেন তখনকার আধুনিক কবি ঈশ্বর গুপ্ত।

আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো, ব্রতধর্ম কোর্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ কোরেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে।...
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
... বুঝি "হট" বোলে, "বুট" পায়ে দিয়ে, "চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।[১৫]

কৈলাসবাসিনী যেন এরই প্রতিবাদ করে লেখেন, যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত আছে এবং অবরোধের ব্যবস্থা নেই, সেসব দেশেও এমনটা হয়নি; সুতরাং বঙ্গদেশেই বা তেমন হবে কেন?

অবরোধ মোচনের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। যে সমাজে মেয়েরা বাড়ির আঙ্গিনায় গেলেই তাদের দারুণ নিন্দা হয়, সে সমাজে তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। তা ছাড়া, তখনকার বাঙালি মহিলারা যে নগণ্য পোশাক পরতেন, তা পরে বাইরে যাওয়াও যেতো না – চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত লক্ষ করবো। সে জন্যেই তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো, বাঙালি মহিলাদের অবরোধ মোচন করা শক্ত হবে। য়োরোপীয় পোশাক পরে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ, তাঁর মতে, এ পোশাক সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

সমাজ এবং জীবনের নানা বিষয় নিয়ে কৈলাসবাসিনী অনেক উদার বক্তব্য রেখেছিলেন। এবং সে যুগের একজন স্বশিক্ষিত, অল্পবয়সী, অন্তঃপুরচারিণী নারীর পক্ষে এই বক্তব্য ছিলো সত্যি সত্যি অসাধারণ। তবু সবকিছুতে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, এ কথা মোটেই বলা যায় না। হিন্দু মহিলার হীনাবস্থার শেষে তিনি এমন দুটি মন্তব্য করেছেন, যা দিয়ে তাঁর মনের সীমাবদ্ধতাই প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন, স্বামী–স্ত্রী দুজনই বাইরে গেলে রন্ধনাদি কে করবে? অর্থাৎ মহিলারা ঘরের কাজ করবে – এই ঐতিহ্যিক মূল্যবোধকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্য আরও যুক্তিহীন। তিনি বলেছেন, প্রাচীন কালে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিলো, কিন্তু সে আদর্শ এখন প্রযোজ্য নয়। কারণ প্রাচীন আদর্শ মেনে নিলে সবগুলো প্রাচীন আদর্শই গ্রহণ করতে হয়। এমন কি, প্রয়োগের রীতি। তাঁর বিবেচনায়, সেটা সম্ভব না হলে, কোনোটাই নেওয়া যায় না।[১৬] আসলে অনেক ব্যাপারে প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী হলেও, সময়ের সীমাবদ্ধতা স্বভাবতই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেকালের এবং ঐ পরিবেশের এক মহিলার কাছ থেকে, সেটা আশা করাও সম্ভবত অনুচিত।

HINDU FEMALE EDUCATION.

AND

ITS PROGRESS

BY

KOYLASAVASINI DAVI.

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস

ও তাহার সমুন্নতি।

শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শক ১৭৮৭।

মূল্য চারি আনা।

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি গ্রন্থের নামপত্র।

হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থার সবচেয়ে বড়ো কারণ যে শিক্ষার অভাব এটা কৈলাসবাসিনী আন্তরিকভাবেই অনুভব করেছিলেন। এ বিষয় নিয়ে তাঁর প্রথম বই-এ আলোচনা করলেও, তাঁর সম্ভবত মনে হয়েছিলো যে, সমস্যাটা যতো গুরুতর তিনি ততোটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। অথবা এই আলোচনা দিয়ে হিন্দু মহিলাদের গভীর ঘুম থেকে জাগিয়েও তোলা যাবে না। সে জন্যেই সম্ভবত, প্রথম বইটি প্রকাশিত হবার দু বছর পরে তিনি বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আর-একটি বই লেখেন। এর নাম হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস এবং তাহার সমুন্নতি।[১৭] এ বই-এর প্রকাশকও তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত।

হিন্দু সমাজে মেয়েদের কেন শিক্ষা দেওয়া হয় না, অশিক্ষার কুফল কী কী, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজের পুরুষ ও মহিলাদের মনোভাব কেমন, কেন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, স্ত্রীশিক্ষার সুফল কী কী ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে কৈলাসবাসিনী এ বই-এ আলোচনা করেন। স্ত্রীশিক্ষা কেন দেওয়া হয় না, সে সম্পর্কে তিনি তেমন নতুন কোনো বক্তব্য রাখেননি। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে যে-ধরনের কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন, কৈলাসবাসিনীও মোটামুটি সেই ধরনের কারণের কথাই বলেন। অর্থাৎ মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়, তারা কালির একটা আঁচড় দিলেও সংসারে দুর্ভাগ্য নেমে আসে ইত্যাদি। এগুলো কুসংস্কার সেটা বোঝা যায়। কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অসতী হবে, স্বামী এবং শাশুড়ির প্রতি অবাধ্য হবে অথবা ধর্ম পালনে তাদের উৎসাহ কমে যাবে – এসব উদ্বেগের সঙ্গে যুক্ত ছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঐতিহ্যিক সমাজের সাধারণ আশঙ্কা। আরও এক প্রজন্ম আগে যে-তরুণরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁদের আচার-আচরণে পুরোনো মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত দেখেই বৃহত্তর সমাজে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো।

বস্তুত, এ মনোভাব কেবল স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী নয়, আধুনিক শিক্ষারই বিরোধী। এই দিকটার প্রতি কৈলাসবাসিনী যতোটা জোর দিয়েছিলেন, রাসসুন্দরী অথবা সমকালীন অন্য মহিলারা তাঁদের মন্তব্যে ততোটা জোর দেননি। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মহিলাদের নিজেদের মনোভাবও যে অত্যন্ত কঠোর ছিলো, তা বোঝানোর জন্যে কৈলাসবাসিনী বলেছেন, যে-বিধবারা ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্যে লেখাপড়া শিখতেন, সাধারণ মহিলারা তাঁদের রীতিমতো ভয় এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। তা ছাড়া, অমঙ্গলের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানদের তাঁরা এই শিক্ষিত বিধবাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে রাখতেন।[১৮]

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং ভীতি তখনকার সমাজের এতো গভীরে প্রোথিত হলেও, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিলো না। কারণ নব্যশিক্ষিত যুবকরা নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যেই শিক্ষিত স্ত্রী চাইছিলেন। কৈলাসবাসিনী লিখেছেন, শিক্ষিত পুরুষেরা তাঁদের অশিক্ষিত স্ত্রীদের অর্ধাঙ্গিনী বলে গণ্য করতে পারেন না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষাকে মন্দ বলে বিবেচনা করলেও শিক্ষিত পরিবারের কর্তারা মেয়েদের

প্রতিষ্ঠাপত্র।

বৎসে কৈলাস বাসিনি! আমি তোমার প্রথম পুস্তক মুদ্রনের সময় যেসকল প্রমাণ পাইয়া তাহা তোমারই লিখিত জানিয়াছিলাম, সেই সকল প্রমাণের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অনেকে সন্দিহান হৃদয়ে নানাপ্রকার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন. তাহাতে আমি অত্যন্ত ক্ষোভ পাইয়াছিলাম, এই নিমিত্তে এবার সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যে কোন প্রকারে হউক পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ দূর করুন, নতুবা সন্দেহের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রবল প্রমাণকে অপ্রমাণ মনে করা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি গ্রন্থে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের লেখা "প্রতিষ্ঠাপত্র"। বোঝা যায় প্রথম বই-এ অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠাপত্র লিখলেও একজন মহিলা ও রকম একটি বই লিখতে পারেন, অনেকেই সেটাকে বিশ্বাস করতে পারেননি।

শিক্ষা না দিয়ে পারছিলেন না – ভালো পাত্রের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দেবার প্রশ্ন যেহেতু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো। তা ছাড়া, ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা এবং চিন্তাধারার প্রভাবেও রক্ষণশীলরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন প্রথমে কলকাতা নগরীতে, তারপর ধীরে ধীরে বড়ো শহরগুলোতে। এভাবে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরোধীতা কমতে থাকে। কৈলাসবাসিনী লিখেছেন, স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনলে আগে যাঁরা কানে আঙুল দিতেন, এখন (অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে) তাঁরাও কন্যাদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন।[১৯]

এই সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতেই কৈলাসবাসিনী লিখেছিলেন : 'বিদ্যার বিমল জ্যোতি অভাবে হিন্দু অবলাগণ যে প্রকার দ্বিপদ পশু হইয়া আছে, তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন, এবং এই কামিনীকুলের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কত দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, ইহারা লোচন সত্ত্বে অন্ধের ন্যায় দর্শনশক্তিবিহীন হইয়া কালাতিপাত করিতেছে।'[২০] 'কোন সহৃদয় ব্যক্তি' বলে কৈলাসবাসিনী স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সদ্য সচেতন হয়ে ওঠা লোকদেরই বুঝিয়েছেন। আমার মনে হয়, এখানে তিনি এই সচেতনতা যতোটা ছড়িয়ে পড়েছে বলে ধারণা করেছেন, আসলে তা তখনো অতোটা ব্যাপ্তি লাভ করেনি। তখনকার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, খুব কম সংখ্যক মেয়েই শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেছিলো। সত্যিকারভাবে, তিনি এ কথা সম্ভবত লিখতে পারতেন শতাব্দীর শেষ দু দশকে।

নারীদের ভূমিকা এবং অবরোধ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আলোচনা প্রসঙ্গেই লক্ষ করেছি, তাঁর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা ছিলো – তিনি নিজেই অনেক বিষয়ে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধকে অতিক্রম করতে পারেননি। তবে স্ত্রীশিক্ষা এবং শিক্ষিত মহিলাদের সম্পর্কে এই দ্বিধা–দ্বন্দ্ব যে কেবল তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো, তা নয়, 'ভদ্রলোক' সমাজেও তাঁর মতো এই মনোভাব দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিলো। সেকালের কলকাতায় ক জন মহিলাই বা শিক্ষিত হয়েছিলেন, অথবা তাঁরা কতোটাই বা শিক্ষা পেয়েছিলেন! সুতরাং তিনি যখন লেখেন যে, শিক্ষা গ্রহণের ফলে এঁদের অনেকের আচরণে, বিশেষ করে ঘরের কাজের প্রতি মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে, তখন তাকে বাস্তবতার প্রতিফলন না বলে সেটাকে তাঁর আশঙ্কা বলেই মনে হয়। হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

বিদ্যাভিলাষী কামিনীকুলের মধ্যে প্রায় অনেককেই সাংসারিক কার্যে উপেক্ষা করিতে দেখা যায়। তাঁহারা সংসারের কোন কার্যই নির্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং কেহ যদি বলপূর্বক তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করে তাঁহারা সেই ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইয়া কহেন, 'সকলেইত সমান মনুষ্য, ঈশ্বর সকলকেইত সমানভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে আমরা কেন শুদ্ধ বৃথা কর্মে নিযুক্ত হইয়া সময় হারাই; আর মেয়েপুরুষ উভয়ই সমতুল্য সেই নিমিত্ত উভয়কেই গৃহকর্ম সমাধা করিতে হয়।' এইরূপ নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহারা গৃহের কোন কার্যই নির্বাহ করিতে চাহেন না; এবং বিদ্যার মিষ্টরসও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন না, তাঁহারা কেবল

দুইএকখানি মাত্র সামান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়া বেড়ান,...[২১]

সেকালের রক্ষণশীল সমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দিতেন, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান দুটি ছিলো : মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ঘরের কাজে অবহেলা দেখাবে আর নিজেদের বিবেচনা করবে পুরুষদের সমকক্ষ হিশেবে। সেই দুটি যুক্তিই কৈলাসবাসিনীর এই মন্তব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বস্তুত তিনি যে-স্ত্রীশিক্ষার জন্যে ওকালতি করেছিলেন, এ মন্তব্যের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধেই যুক্তি দিয়েছেন। এ কারণ, তাঁর মনোভাবে আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের সংঘাত।

বয়স যতোই বাড়তে থাকে কৈলাসবাসিনীর ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ এবং ধর্মচিন্তা ততোই প্রবল হতে থাকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ বিশ্বশোভা থেকে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। আগের দুটি বই-এর চেয়ে এই বইটি অনেক বড়ো – পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭। এর বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীও আলাদা। আগের বই দুটির বিষয়বস্তু ছিলো সমাজ সংস্কার, বিশেষ করে মহিলাদের উন্নতি। কিন্তু তাঁর মাত্র ৩২ বছর বয়সে প্রকাশিত বিশ্বশোভায় তিনি সমাজের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আলোচনা করেছেন বিশ্বের কথা – সে বিশ্ব আবার বিষয়ীর বিশ্ব নয়। এ গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর স্বামীকে। তারপর গ্রন্থরচয়িত্রীর নিবেদন, প্রার্থনা এবং মঙ্গলাচরণ নামের কবিতাকারে নিজের ভাব প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশ্বের সৌন্দর্য এবং এই বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মাহাত্ম্য এবং করুণা বর্ণনা। গ্রন্থটি তিনি শুরু করেছেন এভাবে :

হে জীব! আর কত দিন মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল যাপন করিবে। একবার জাগরিত হও, এবং জ্ঞানরূপ বিমানে অধিরূঢ় হইয়া এই বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য শোভা দর্শন কর। তোমার নশ্বরকৃত অচিরকালস্থায়ী বিনশ্বর শোভা অবলোকন করিয়া কত দৃঢ় পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইবে? তোমরা ইষ্টক কাষ্ঠাদি বিনির্মিত সুরম্য অট্টালিকা ও জয়স্তম্ভ, কীর্তিস্তম্ভ, সেতু ও দুর্গম্য দুর্গসকল প্রস্তুতকারী ব্যক্তিবৃন্দের কতই প্রশংসা কর, এবং রচয়িতার শিল্পনৈপুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কতই আনন্দিত হও। আহা! বিশ্বপাতা বিশ্ববিধাতা সেই বিশ্বেশ্বরের নিকট কি আর কেহ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, আহা! এই বিশ্বসংসারের কি আশ্চর্য সৌন্দর্য, যাহার উপমার আর স্থল নাই।

কৈলাসবাসিনী তাঁর এই গ্রন্থটিকে কতোগুলো অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এই অধ্যায়গুলোর নাম থেকেই এই বই-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো হলো : প্রভাতবর্ণন, নিদাঘমাহাত্ম্য, গ্রীষ্মবর্ণন, প্রাবৃটমাহাত্ম্য, প্রাবৃটবর্ণন, শরৎমাহাত্ম্য, শরদ্বর্ণন, হেমন্তমাহাত্ম্য, অপত্যস্নেহ, হেমন্তবর্ণন, শিশিরমাহাত্ম্য, বসন্তমাহাত্ম্য, মনের প্রতি উপদেশ, জীবের প্রতি উপদেশ।

বিশ্বশোভা আগের দুটি বই-এর মতো কেবল গদ্যে লেখা নয় – আগাগোড়া গদ্য ও পদ্যে লেখা। প্রথম বই-এ তাঁর গদ্যে রীতিমতো একটা স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ করি।

বিশ্বশোভা।

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা ও হিন্দু অবলাকুলের
বিদ্যাভ্যাস রচয়িত্রী

শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কর্ত্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা।
পটলডাঙ্গা মির্জাফর্স লেন ২৪ নং ভবনে,
গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯০।

উক্ত যন্ত্রালয় এবং সকল গ্রান্থালয়ে ও পুস্তক ব্যবসায়ির
নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য দশ আনা। কাপড়ে বাঁধা চৌদ্দ আনা।

বিশ্বশোভা গ্রন্থের নামপত্র

দ্বিতীয় বই-এ তৎসম শব্দের এবং আভিধানিক শব্দের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও এতে ভাষা প্রবাহে স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে নেই, তা নয়। কিন্তু বিশ্বশোভায় লেখিকা তাঁর ক্রমবর্ধমান শব্দভাণ্ডারের পরিচয় দিলেও, তাঁর গদ্যের সহজ ছন্দটি লোপ পেয়েছে। এ বই-এ তাঁর পদ্যের বেশির ভাগটাই পয়ারে লেখা। এবং তার মধ্যে কাব্যগুণ বড়ো একটা নেই। প্রকৃত পক্ষে, এ বই-এ তাঁর যথেষ্ট আবেগ এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পেলেও, লেখিকা হিশেবে তাঁর দাবিকে তিনি এ বই-এর মাধ্যমে কিছু জোরদার করতে পারেননি। বরং এ বই-এর মাধ্যমেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি কিভাবে সমাজ এবং সংসার থেকে দূরে আধ্যাত্মিকতার দিকে সরে যাচ্ছিলেন। অসম্ভব নয়, এর জন্যেই তিনি হয়তো পরে আর কোনো দিন নারীমুক্তির সপক্ষে যুক্তি দেবার জন্যে কলম হাতে নেননি।

বিশ্বশোভা প্রকাশের দু বছর আগে দুর্গাচরণ গুপ্তের সহায়তায় তাঁরই ছাপাখানা থেকে মহিলাদের উন্নতির জন্যে নিবেদিত একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর নাম অবোধবন্ধু। এই পত্রিকায় কৈলাসবাসিনীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে। প্রবন্ধের নাম 'সভ্যতা এবং সমাজ সংস্কার'। লেখিকার পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদক তাঁকে গ্রন্থকর্ত্রী না বলে গ্রন্থকার বলেন। কৈফিয়ত দিয়ে তিনি বলেন যে, যাঁরা লেখক-লেখিকা তাঁদের বিশ্লেষণে এই ধরনের লিঙ্গভেদ থাকা উচিত নয়। কিন্তু সম্পাদক এ রকমের আধুনিকতার পরিচয় দিলেও, কৈলাসবাসিনী তাঁর এ প্রবন্ধে নতুন কোনো বক্তব্য রাখতে পারেননি। উল্টো, তাঁর আগেকার বই দুটিতে সমাজ সংস্কারের, বিশেষ করে মহিলাদের অবস্থার উন্নতির প্রসঙ্গে যে-যুক্তিবাদী এবং প্রতিবাদী মনোভাবের ছাপ চোখে পড়ে, এ প্রবন্ধে তা প্রায় অনুপস্থিত।

এই যে তরুণ বয়সে সংস্কার ও আধুনিকতার প্রতি জোরালো যুক্তি দেখানোর পর পরবর্তী জীবনে এসবের প্রতি ঔদাসীন্য এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন - এটা সেকালের মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় একটা প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে। এমন কি, পরবর্তী কালে কৃষ্ণভাবিনী দাস এবং বেগম রোকেয়ার মতো প্রথম দিকের নারীবাদীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে এ দুজনের ক্ষেত্রে বৈরাগ্য এসেছিলো, তাঁদের স্বামীরা মারা যাবার পর এবং প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে। কিন্তু কৈলাসবাসিনীর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে নিতান্তই অকাল বৈরাগ্য বলতে হয়। অতঃপর তিনি আর কোনো কিছু লিখেছিলেন বলে অন্তত আমার চোখে পড়েনি। তিনি যেন হঠাৎ হারিয়ে যান। তাঁর কোনো উল্লেখ পরবর্তীতে কোথাও দেখিনি - এমন কি, তাঁর মৃত্যুর খবরও নয়। জানা যায় না, তিনি কবে মারা যান।

১ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও মনের অসুখ', বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, বৈশাখ, ১৭৮২ (১৮৬০)।

২ 'স্ত্রীশিক্ষা', জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮২।

৩ K. C. Mitra, 'Hindoo Women and Their Connection with the Improvement of Their Country, The Proceedings and Transactions of the Bethune Society (Calcutta: Bishop's College Press, 1870), p. xxv.

৪ কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা (কলিকাতা : গুপ্ত প্রেশ, ১৮৬৩), দ্রষ্টব্য 'ভূমিকা'।

৫ তাঁর জীবনীর জন্যে দ্রষ্টব্য : কুমুদিনী চরিত, কলকাতা, ১৮৬৭। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে যে-কপিটি আছে, তাতে প্রকাশনার বিস্তৃত বিবরণ নেই।

৬ কৈলাসবাসিনী দেবী, বিশ্বশোভা (কলিকাতা, গুপ্ত প্রেশ, ১৮৬৯)।

৭ কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা।

৮ ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫।

৯ ঐ, পৃ. ৩৯-৪১।

১০ ঐ, পৃ. ৪৬-৫০।

১১ ঐ, পৃ. ৪৯-৫১

১২ ঐ, পৃ. ৫২।

১৩ ঐ, পৃ. ৫৫।

১৪ রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলি, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত (কলিকাতা : আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৩-৭৪), পৃ. ২০৫।

১৫ 'দুর্ভিক্ষ', কবিতা সংগ্রহ, প্রথম ভাগ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৮৮৫), পৃ. ২২১-২২।

১৬ হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, পৃ. ৬৮-৬৯। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থেও তিনি শিক্ষিতা নারীদের গৃহকর্মে অবহেলার সমালোচনা করেছেন। পৃ. ২৫-২৬।

১৭ হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি (কলিকাতা : গুপ্ত প্রেশ, ১৮৬৫)।

১৮ ঐ, পৃ. ৭।

১৯ ঐ।

২০ ঐ, পৃ. ১।

২১ ঐ, পৃ. ২৫-২৬।

৩
প্রথম আধুনিকা
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

কেবল একটা সমাজ এবং জাতির উন্নতির জন্যেই নয়, স্বামী–স্ত্রীর জীবনকে আরও পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যেও স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যিক – বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা নবীনদের মনে দানা বাঁধছিলো। ১৮৩৮ সালে সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে চুঁচুড়ার এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষিত তরুণরা কি অশিক্ষিত স্ত্রীর কাছ থেকে যথেষ্ট সংপ্রীতি, সান্ত্বনা এবং সাহায্য পাবেন?

এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তমকার্য্যে বড় হইবেন। ... পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহাদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন?[১]

তাঁরা যে পাবেন না, সে অভাব পরের দশকেই কোনো কোনো ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা অনুভব করতে আরম্ভ করেন। এর প্রমাণ আমরা আগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৈলাসবাসিনী দেবী সম্পর্কে আলোচনা থেকেই লক্ষ করেছি। তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত তাঁকে বাড়িতেই সবার অজ্ঞাতে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেন। তিনি একাই নন, বস্তুত অনেকেই গোপনে স্ত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তবে সবার ক্ষেত্রে ফলাফল সমান হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই লেখাপড়ায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি বলেই মনে হয়। অনেক মহিলাই হয়তো চিঠিপত্র লিখতে শিখেছিলেন; কেউ কেউ গল্পের বই পড়তেন তেমন কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাসসুন্দরী দেবী, বামাসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী অথবা কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন খুব কম মহিলাই।

অনেকেই আবার রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী অথবা বামাসুন্দরী দেবীর মতো লেখাপড়া শিখলেও ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে প্রাত্যহিক

জীবনযাত্রায় আধুনিক হতে পারেননি। পোশাকে-পরিচ্ছদে, অবরোধ ভেঙে বাইরে যাওয়ায়, সামাজিক কোনো ভূমিকা পালন করায় – এসব খুব কম লোকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিলো। বলা বাহুল্য, শুধু লেখাপড়া শিখলেই মানুষ পুরোনো মূল্যবোধ বর্জন করতে অথবা নতুন মূল্যবোধকে স্বাগত জানাতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি এবং পরিবেশের ওপর।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বল্পসংখ্যক মহিলা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রীতিমতো আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁদের একজন বললে ভুল বলা হয়, সত্যিকারভাবে তিনি ছিলেন তাঁদের পথিকৃৎ। বর্তমান অধ্যায়ে আধুনিকতার দিকে তাঁর অগ্রযাত্রা এবং তাঁর আধুনিতকার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এক

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যা হয়েছিলেন, তা হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ অথবা স্বাভাবিক ছিলো না। তাঁর জন্ম যশোরের একটি অজ পাড়াগাঁ, নরেন্দ্রপুর গ্রামে ১২৫৭ সালের ১২ই শ্রাবণ (ইংরেজি জুলাই ১৮৫০)। তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবী অবশ্য এই তারিখ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, তাঁর সন ১৮৫০ নয়, ১৮৫২। তাঁর পিতার নাম ছিলো অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৯ সালে আট বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো গৌরীদান রীতি অনুযায়ী।[২] তখনকার সামাজিক আচার অনুযায়ী ছোটোবেলা থেকে তিনি লেখাপড়া মোটেই শেখেননি। সেই অশিক্ষিতা আট বছরের কন্যার বিয়ে হয় রবীন্দ্রনাথের মেজদা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক মনোভাব ছিলো অনেক ক্ষেত্রেই আপোশহীন এবং রক্ষণশীল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিলো আত্যন্তিক। জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনীকে তিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পরেই সেখানে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন সমাজের রীতিকে অস্বীকার করে।[৩] বাড়িতে যে



জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

মেয়েরা আসতেন বধূ হিশেবে, তাঁদের তিনি স্কুলে পাঠাননি। কিন্তু তাঁদের জন্যে বাড়িতে শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। পিতার পুরো অনুমোদন নিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদা দেবীকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেন। ১৮৬২ সালে তিনি বিলেতে যাবার সময়ে বালিকা–বধূকে ইংরেজি শেখানোর জন্যে নিয়োগ করেছিলেন এক ম্যাম সাহেবকে। সেই থেকে তাঁর যে–শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিলো, বহু বছর ধরে তা চলতে থাকে। ফলে তিনি ইংরেজিসহ লেখাপড়া বেশ ভালোই শিখেছিলেন।

বস্তুত, বিয়েই তাঁর জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছিলো। ঠাকুর পরিবারে আগের প্রজন্মে রবীন্দ্রনাথের মা, সারদা দেবীর যখন বিয়ে হয়, তখন তাঁরও জীবনে পরিবর্তন এসেছিলো। সামাজিক মর্যাদা, প্রাত্যহিক জীবনে বিলাসিতা, অভিজাত ঘরের নতুন ধরনের জীবনযাত্রা ইত্যাদি তাঁর জীবনেও দেখা দিয়েছিলো; কিন্তু তাঁর জীবনে সে অর্থে কোনো আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। সে বাড়ির সর্বজনমান্য কর্তা কোনো কোনো বিষয়ে একেবারে নতুন এবং বৈপ্লবিক মূল্যবোধকে স্বীকরণ করলেও, পাশ্চাত্য–প্রভাবিত আধুনিক জীবনযাত্রাকে সব সময়ে ভালো চোখে দেখেননি; অনেক সময়ে আদৌ অনুমোদন করেননি।

কিন্তু যুগের স্রোত ঠেকানোর মতো ক্ষমতা কারো নেই, দেবেন্দ্রনাথেরও ছিলো না। তা ছাড়া, তাঁর সন্তানদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে ভিন্ন প্রজন্মের সদস্য এবং তাঁরা ভিন্ন ধরনের শিক্ষা এবং মূল্যবোধ লাভ করেছিলেন। এর ফলে ঠাকুরবাড়ির নতুন বধূদের, বিশেষ করে এই সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর জীবনযাত্রায় এর প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছিলো। তাঁদের প্রভাব আবার দ্রুতগতিতে পড়েছিলো সমগ্র ঠাকুর পরিবারের ওপরেই – পোশাক–পরিচ্ছদে এবং জীবনযাত্রায়। এর ফলে দু দশকের মধ্যেই সে বাড়ির মহিলারা বঙ্গদেশের মহিলাদের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। তবে এসব পরিবর্তনের অনেকটাই এসেছিলো জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে (এবং অংশত কাদম্বরী দেবীকে) কেন্দ্র করে। সে দিক দিয়ে সেকালের অভিজাত ঘরের মহিলাদের জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো, জ্ঞানদা দেবীকে তার প্রতীক বলতে হবে। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে অনেক বাঙালি মহিলাই শিক্ষিতা হয়েছিলেন, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তিনিই প্রথম 'আধুনিকা'। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি আধুনিক হলেন কী করে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন : তিনি কতোটা আধুনিক হয়েছিলেন?

জ্ঞানদা দেবী ঠাকুরবাড়িতে যখন বধূ হয়ে আসেন, তখন সে বাড়ির অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। তার কয়েক বছর আগেই সৌদামিনী দেবীকে অল্পদিনের জন্যে বেথুন স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়েছিলো, আমরা আগেই তা উল্লেখ করেছি। কিন্তু তিনি এবং ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য কন্যা এবং বধূরা লেখাপড়া শিখেছিলেন প্রধানত তাঁদের অন্তঃপুরেই। সৌদামিনী দেবী এবং স্বর্ণকুমারী দেবী উভয়ের রচনা থেকেই জানা যায়, তখন বৈষ্ণবী এবং ইংরেজ মহিলারা ঠাকুরবাড়িতে আসতেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে।[৪] অবশ্য জ্ঞানদা দেবী তাঁদের কাছে

কতোটা লেখাপড়া শিখেছিলেন, তা জানা নেই। তাঁর লেখা থেকে বরং জানা যায় যে, লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে তাঁকে বরং তাঁর দেবর হেমেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। জ্ঞানদা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, হেমেন্দ্রনাথের ধমকে তিনি এবং তাঁর সহপাঠিনীরা থেকে থেকে কিভাবে চমকে উঠতেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর কাছেও তাঁর অন্য জা এবং ননদদের সঙ্গে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। এ সময়ে তাঁরা বাংলা এবং ইংরেজি ছাড়াও, সামান্য সংস্কৃত, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিও শিখতেন।


স্বর্ণকুমারী দেবী

তবে জ্ঞানদানন্দিনী সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে ওঠেন সত্যেন্দ্রনাথের আত্যন্তিক প্রয়াসের ফলে। স্পষ্ট করে কোথাও বলা না হলেও, মনে হয় ১৮৬২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত যাবার আগেই জ্ঞানদা দেবী চিঠিপত্র লিখতে শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক অধ্যয়ন করে সত্যিকারভাবে শিক্ষিত এবং বিদগ্ধ হয়ে ওঠার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছে। তাঁর স্বামী ছিলেন সত্যিকার উদারনৈতিক, আধুনিক এবং নারীদের উন্নতিতে বিশ্বাসী। তবে স্বামী যতোটাই আধুনিক হন না কেন, পরিবর্তন মেনে নেবার মতো সাহস এবং গ্রহণশীল মন এবং সাহস জ্ঞানদা দেবীর না-থাকলে, কেবল সত্যেন্দ্রনাথের আন্তরিকতার ফলেই জ্ঞানদা দেবী আধুনিক হতে পারতেন না। তাঁর সৎসাহস এবং আন্তরিক আগ্রহ ছিলো বলেই সত্যেন্দ্রনাথ মহিলাদের আধুনিকতার অমন একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন নিজের স্ত্রীর মাধ্যমে।

দুই

সত্যেন্দ্রনাথ কোথায় মহিলাদের অবরোধ মোচনের তথা প্রাত্যহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ধারণা প্রথমে পেয়েছিলেন, তা বলা শক্ত। অনেকের ধারণা, তিনি প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য থেকে। কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ তিনি বিলেত যাওয়ার আগেই নারীমুক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের কথা থেকেও তার আভাস পাওয়া যায়। বাল্য এবং যৌবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?' আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মতো নবাবী বন্দোবস্ত ছিলো তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়,

মুসলমান রীতির অনুকরণ।... এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত।[৫]

মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসার আগে থেকেই যে এ দেশে অবরোধ প্রথা ছিলো, তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং বোঝা যায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদের আমলে স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মুসলমানদের কথাটা তিনি জুড়ে দিয়েছেন। সে দিক দিয়ে তাঁর স্মৃতির সবটা হয়তো অভ্রান্ত নয়। কিন্তু তিনি যে বিলেত যাবার আগেই মহিলাদের অবরোধ মোচন এবং তাঁদের জীবনসঙ্গিনী করে তোলার মতো শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী হতে আরম্ভ করেছিলেন, তা বেশ স্পষ্ট।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর 'পরিচয়' করিয়ে দেওয়ার কৌতুকজনক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। সবার অজ্ঞাতে জ্ঞানদার সঙ্গে বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে রাতের বেলায় তিনি তাঁকে লুকিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে আসেন। কেউ যাতে সন্দেহ না-করেন, তার জন্যে মনোমোহন এবং তিনি গলাগলি ধরে একসঙ্গে পা ফেলে অন্তঃপুরে আসেন। নিজের কক্ষে প্রবেশ করে তিনি মনোমোহনকে স্ত্রীর সঙ্গে এক মশারির তলায় ঢুকিয়ে দেন। তারপর জ্ঞানদা লজ্জায় আর মনোমোহন সংকোচে চুপ করে থাকেন। এভাবে নীরবতার মধ্যে কিছু সময় কাটানোর পর মনোমোহনকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মার্চ করতে করতে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসেন।[৬] বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা আরও জোরদার হয়েছিলো।

বিলেতে পুরুষ এবং মহিলাদের নানা সামাজিক কার্যকলাপে একত্রে অংশগ্রহণের এবং পারিবারিক জীবনে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের যে দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছিলেন, তার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তদুপরি, সেখানে তিনি বিবাহিত এবং অবিবাহিত বহু মহিলাকে দেখতে পান, যাঁরা তাঁদের অনেকটা সময় এবং শক্তি সমাজের কল্যাণকার্যে ব্যয় করেন। এর সঙ্গে তুলনা করে বাঙালি মহিলাদের জীবনকে তিনি স্বভাবতই অনেক খর্বিত বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে, সমাজের দারুণ প্রতিকূলতার জন্যে বাঙালি মহিলাদের মন এবং বুদ্ধি কোনোটাই বিকাশ লাভ করতে পারে না।[৭]

লন্ডনে থাকার সময়ে তিনি জ্ঞানদা দেবীকে অসাধারণ যেসব চিঠিপত্র লেখেন, তা থেকে বোঝা যায়, তিনি বাঙালি অবরুদ্ধ মহিলাদের জন্যে কী গভীর সহানুভূতি বোধ করতেন।

ইংলণ্ডে এখন এতদিন থাকিয়া ইহা একপ্রকার বাড়ির মত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রীতিনীতির দোষগুণ পূর্বাপেক্ষা কত বলপূর্বক মনে আঘাত করে। এখানকার সমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয় – স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এ রকমের সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ এবং পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে সৌভাগ্য

এখন অনেক দূর। স্ত্রীলোক জীবন–উদ্যানের পুষ্প তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া রাখিলে মঙ্গলের কি সম্ভাবনা।[৮]

তাঁর এ চিঠি থেকেও বোঝা যায়, বিলেতের আদর্শ তাঁর চিন্তাধারাকে কতো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এই আদর্শের সঙ্গে তাঁর দেশের এবং নিজের পরিবারের যতোই তুলনা করেছেন ততোই সেটাকেই অসহ্য বলে গণ্য করেছেন এবং পরিবর্তনের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন। সে জন্যেই এই চিঠির শেষে তিনি জ্ঞানদা দেবীকে লিখেছিলেন : 'আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে।' সেই সঙ্গে তিনি জ্ঞানদা দেবীকে আরও মনে করিয়ে দেন যে, সেটা অবশ্য তাঁরই ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

স্বামী–স্ত্রীর যে সম্পর্ক সেকালের বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিলো, গোড়া থেকেই তিনি তাকে আদর্শ বলে ভাবতে পারেননি। তদুপরি বিলেতের পারিবারিক জীবন দেখে এ বিষয়ে তিনি আরও বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেই তাঁর *বাল্যকথা* ও *আমার বোম্বাই প্রবাস* গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, তিনি জন স্ট্যুয়ার্ট মিলের The Subjection অত Women (১৮৬৯) ছিলো তাঁর 'সাধের পাঠ্য পুস্তক'।[৯] এই বইটি পড়ে তিনি স্ত্রী–স্বাধীনতা নামে একটি পুস্তিকা বের করেছিলেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করেছেন।[১০] কিন্তু উভয়ই ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কারণ সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুবাদ পুস্তিকার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, জন স্ট্যুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালে।[১১] সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ আদৌ এ পুস্তিকা লিখে থাকলে সেটা ইংল্যান্ড থেকে ফেরার বেশ কয়েক বছর পরের কথা। তার অনেক আগেই তিনি জ্ঞানদানন্দিনীকে অবরোধ থেকে বের করে এনেছিলেন।


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশে বিবাহিত জীবন কী অকিঞ্চিৎকর সে সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথ একবার জ্ঞানদা দেবীকে লিখেছিলেন :

আমাদের দেশের আচারের বল অত্যন্ত অধিক – প্রত্যেকের নিজের শক্তি অতি অল্প। ইহাই আমাদের সকল দুর্দশার মূল। রোজ এক মুষ্ঠি আহারে উদর পূরণ করা – তাহার পর ঘটা করিয়া বিবাহ করা – তারপর ছেলেপিলে হলো তো আর কে গোলযোগ করে। বালিকা ভার্যা গৃহিণী হইলেন – আর তাহার কি করিবার অবশিষ্ট আছে? এই

রূপে ঘরকন্না লইয়া এক রকম করিয়া দিনটা চলে গেলেই হলো। ...আর অন্য কিছু করিবার চিন্তা ও আবশ্যক থাকে না।[১১]

সত্যেন্দ্রনাথ এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে এই দুর্দশার কারণ সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাসমূহের অপরিসীম প্রভাব এবং পুরুষ ও মহিলাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিশেবে বাস করতে পারার অক্ষমতা। তিনি যে কতোটা আধুনিক এবং উদার মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় চিঠির পরবর্তী বক্তব্য থেকে :

আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই – আমরা স্বাধীনপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভাই সত্য কিনা? যদিও আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্তু তুমি জান আমার ভাব কি। যে পর্য্যন্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত এবং সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তাহা জান – আমি বাবামহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ, ফলিবার জন্য, উপযুক্ত সরস জমিতে অপেক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। ...বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে, তোমার পিতা তোমাকে কেবল দান করিয়াছেন। আমরা যখন আপনারা স্বাধীনপূর্বক নূতন প্রেমের সহিত বিবাহবন্ধনে প্রবেশ করিতে পারিব তখন সুখী হইব না?[১২]

এখানে সত্যেন্দ্রনাথ স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে নিজের চিন্তাধারার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা কেবল অসাধারণ নয়, একক। পরবর্তী সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চাননি এবং তাঁকে অন্যত্র বিয়ে দেবার মতো আজগুবি চেষ্টাও চালিয়েছিলেন। কারণ তিনি এ বিয়ে করেননি, তাঁর বাবা জোর করে এ বিয়ে দিয়েছিলেন।[১৩] শিবনাথ শাস্ত্রীর এই চিন্তাও অতি অসাধারণ। তবে সত্যেন্দ্রনাথের মতো নয়।

একবার সচেতন হবার পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ ভাবতে থাকেন, কিভাবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে আধুনিক করে তুলতে পারেন। কিন্তু সে মুহূর্তে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি ছ হাজার মাইল দূরে। তক্ষুনি যে–সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতে পারলেন, তা হলো স্ত্রীকে বিলেতে পাঠানোর জন্যে পিতাকে অনুরোধ জানানো। তিনি ভাবলেন, জ্ঞানদা লন্ডনে এলে সহজেই লেখাপড়া শিখতে এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলী ও বৈদগ্ধ্য আয়ত্ত করতে পারবেন। স্ত্রীকে লিখলেন :

তুমি এখন পিঞ্জরের পাখীর মত বদ্ধ রহিয়াছ ও তোমার শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তির ও উন্নতির এতটুকু স্থান নাই। তুমি এ দেশে আইস, তোমার স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে।[১৪]

এখানে যা লক্ষণীয় তা হলো তিনি স্ত্রীকে ইংল্যান্ডে যাবার জন্যে আদেশ দেননি। বরং সে দেশে গেলে যে উপকার হতে পারে এবং সে দেশে যাওয়াও যে খুব শক্ত নয়, সে সম্পর্কেই উপদেশ দিয়েছেন।

আমার তাহাতে কিছুই স্বার্থপরতা নাই, আমি কেবল তোমার হিতের জন্যই লিখিয়াছি। ... আমি এখন কেবল বাবা মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যাহাতে তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ... তুমি উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংলণ্ডের সমাজের মধ্যে থাকিয়া তোমার স্ত্রীহৃদয়কে সহস্র গুণে বলবান কর ...। তুমি আপনাকে যত উন্নত করিবে, তোমার দেশের ভগিনীগণের তোমার দৃষ্টান্ত ততই উপকার করিতে পারিবে।[১৫]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লেখাপড়া শেখার এবং আধুনিক হবার আদর্শ এবং উৎসাহ কোথায় পেয়েছিলেন, ওপরের চিঠি থেকেই তা বোঝা যায়। বস্তুত, সত্যেন্দ্রনাথের সীমাহীন ঔদার্যের কাছেই জ্ঞানদানন্দিনীর আধুনিকতা ষোলো আনা ঋণী। তাঁর মতো স্বামী না পেলে জ্ঞানদার আদৌ কোনো লেখাপড়া হতো কিনা, সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি স্বামীর কাছ থেকে যে-সহায়তা এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত যথার্থ শিক্ষিত এবং আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন। রক্ষণশীল মহিলাদের মতো তিনি এ ব্যাপারে কোনো প্রতিরোধ অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি না-করে বরং স্বামী যে-পথ দেখিয়েছিলেন, সেই পথ ধরে সাহস এবং উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেকালের সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আদর্শে উদ্বুদ্ধ যে তরুণরা তাঁদের স্ত্রীদের শিক্ষিত এবং আধুনিক করে তোলার চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন, তাঁদের কথাই আমরা এখন জানতে পাচ্ছি। কিন্তু হাজার হাজার তরুণই নিশ্চয় এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তার জন্যে দায়ী ছিলেন তাঁদের স্ত্রীরা এবং পরিবেশের প্রতিকূলতা। তাঁর কৃতিত্বকে সে জন্যেই কোনোক্রমে ছোটো করে দেখা যায় না।

স্বামীর প্রস্তাবে তিনি নিজে ইংল্যান্ডে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেননি। অথবা রাজি হলেও যেতে পারতেন কিনা, তা জানা যায় না। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে ঐতিহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তাঁর শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথ পুত্রের প্রস্তাবে আদৌ সম্মত হননি। দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল না-হলেও, বালিকা পুত্রবধূকে বিলেতে পাঠানোর প্রস্তাব কোনো লোকের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। জ্ঞানদার এ জন্যে ইংল্যান্ডে যাওয়া হয়নি। হতাশ সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লেখেন :

বাবা মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মানমর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বন্দী রাখি। আমি ত ভাই বুঝিতে পারি না বাবামশাইয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তা হইলে তোমার শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেন হয় যে, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। স্ত্রীলোক উন্নত ও স্বাধীন হইলে সমাজ যে কত উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করে, ইংলণ্ডে আসিয়া তাহার কতক বুঝা যায়। তুমি যদি ২৫ বছর অন্তঃপুরে যেমন আছ তেমন এইরূপে বাস কর

আর যদি দুই বৎসর ইংলণ্ডে আসিয়া যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলণ্ডের দুই বৎসর অন্তঃপুরের ২৫ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি ও মনের উন্নতিকর ও বিকাশকর দেখিতে পাইবে।[১৬]

যতোই হতাশ হন, সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে তখনকার মতো স্ত্রীকে বিলেতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

তিন

১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের প্রথম দেশী আইসিএস হয়ে তিনি লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এবং দূরে লন্ডনে থেকে যা করতে পারেননি, এবারে তা করতে সমর্থ হলেন। স্ত্রীকে প্রথম সুযোগেই অন্তঃপুরের চার দেয়ালের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করলেন। আইসিএস হয়ে তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং সারা দেশে যে সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন, তা দিয়ে পরিবারের মধ্যে তাঁর মর্যাদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তা ছাড়া, তিনি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভরতা লাভ করেছিলেন। এসব তাঁকে পিতৃশাসন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলো। দেবেন্দ্রনাথও এসবের পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা আপোশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি এবারে পুত্রের মতের বিরুদ্ধে জ্ঞানদা দেবীকে অন্তঃপুরে আটকে রাখতে পারলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ কাজে যোগদানের পথে স্ত্রীকে নিয়ে বোম্বাই যাত্রা করেন ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে।

স্ত্রীকে বোম্বাই এবং তার পর আহমেদাবাদে নিয়ে যাবার যে–সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন, তা ছিলো নিতান্তই দুঃসাহসিক। তাঁদের মতো অভিজাত পরিবারের কোনো ভদ্রলোক ইতিপূর্বে এমন কাজ করেননি। এর কয়েক বছর আগে কেশব সেন কলকাতার এক পাড়ায় তাঁদের নিজেদের বাড়ি থেকে অন্য পাড়ায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইলে পরিবারের কাছ থেকে প্রবল বাধা এসেছিলো। তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে দারোয়ান দিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বাধা অগ্রাহ্য করে স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেলে আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে একঘরে করেছিলেন এবং তাঁর আশ্রয় নিতে হয়েছিলো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতা শহরের এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় এবং কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত এক বাড়িতে। তার জন্যেই সমাজের প্রতিকূলতা ছিলো এমন তীব্র। এ থেকেই অনুমান করা সম্ভব, সত্যেন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে কতোটা নৈতিক সাহসের দরকার ছিলো।

সেকালে মহিলাদের পক্ষে বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিলো। লোকাচার ছাড়া, বাইরে যাওয়ার কতোগুলো বাস্তব বাধাও ছিলো। মেয়েরা তখন পরতেন শুধু একটি শাড়ি – কোনো পেটিকোট অথবা ব্লাউজ পরার রীতি তখনো চালু হয়নি। এই পোশাক লজ্জা নিবারণের জন্যে কতো অপ্রতুল ছিলো, তা বিদেশিনী

ফ্যানি পার্কস লিখেছিলেন ১৮৫০ সালে। ১৮২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার এক অভিজাত ব্যক্তির অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি লিখেছিলেন যে, শাড়ির ভেতর দিয়ে নারীদের দেহের আকার–আকৃতি ছাড়াও চামড়ার রঙ দেখা যেতো। এবং তিনি যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে, এই পোশাকের অপ্রতুলতার কারণেই স্বামী ছাড়া অন্যকেউ অন্তঃপুরে ঢুকতে পারতো না।[১৭] [৫৯, ৬০] মেয়েরা সেকালে শাড়ি পরতেন পেটিকোট এবং ব্লাউজ ছাড়া। শীতকালে শাড়ির ওপরে পরতেন একটি চাদর।



ফ্যানি পার্কের দেখা শাড়ি পরা বাঙালি নারী

বস্ত্রের এই অপ্রতুলতা ছাড়া, মেয়েদের পক্ষে জুতো এবং মোজা পরার রীতিও তখন ছিলো না। আগের অধ্যায়ে লক্ষ করেছি, বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে তখনকার আধুনিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন যে, এ যুগের মেয়েরা বুট পরে নিজের হাতে গাড়ি হাঁকিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে। এখানে তিনি মেয়েদের তিনটি নিষেধ ভাঙার দিকে ইঙ্গিত করেছেন – জুতো পরা, গাড়িতে ওঠা এবং বাইরে যাওয়া। ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৯ সালে মারা যান। আর মাত্র ছ বছর বাঁচলেই তিনি দেখে যেতে পারতেন যে, এই তিনটি নিষেধই জ্ঞানদা দেবী অমান্য করেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির বৌ আর প্রথম দেশীয় সিভিলিয়ানের স্ত্রী হওয়ার সুবাদেই এতো বড়ো লোকাচার বিরোধী আচরণ করা সত্ত্বেও, তাঁকে কেউ কার্যকরভাবে একঘরেও করতে পারেনি। উপরন্তু, কর্মস্থানে স্ত্রীকে নিয়ে যাবার যে-দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ স্থাপন করেন, পরবর্তী কালে সেই দৃষ্টান্তই ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অন্যেরা অনুসরণ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খাঁচা খোলার এবং আত্মসচেতন না-হয়ে সে খাঁচা থেকে বের হবার কৃতিত্ব যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনীর।

সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বোম্বাই নিয়ে যেতে চাইলেও, একজন বাঙালি মহিলার বোম্বাই যাবার কৃতিত্ব সবটাই শুধু মাত্র তাঁর প্রাপ্য নয়। জ্ঞানদা দেবী এ ব্যাপারে অসাধারণ সহযোগিতা করেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। তবে অন্তঃপুরের বাইরে যাবার জন্যে প্রথমেই তাঁর প্রয়োজন হয়েছিলো একটি শালীন পোশাকের। বাঙালি মহিলার জন্যে ভদ্র পোশাক কী হতে পারে, তার কোনো দৃষ্টান্ত তখন অবশ্য ছিলো না। সে জন্যে, সত্যেন্দ্রনাথ একজন ফরাসি দর্জির সাহায্য নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি পোশাকের নকশা করেন। সে পোশাক তৈরি হবার পরে দেখা গেলো, একা জ্ঞানদার পক্ষে সেটা পরা একেবারে অসম্ভব। প্রত্যেকবারই তাই সেই পোশাক পরার জন্যে স্বামীর সাহায্য দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হাসি মুখেই এটা মেনে নেন। জুতো এবং মোজা পরার কথাও তিনি কখনো ভাবেননি। সেটাও তাঁর মেনে নিতে হলো। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০০ সালের পরেও ভদ্রলোকের বাড়ির মহিলাদের পক্ষে জুতো পরা সমাজের কাছে যে নিন্দনীয় ছিলো, তা লিখেছেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তখনো পর্যন্ত কেবল নারী যৌনকর্মী এবং ব্রাহ্ম মহিলারাই জুতো পরতেন। তাই ভ্রমণের সময় তাঁর মাকে অনেক সময়েই বলতে হতো যে, তিনি ব্রাহ্ম, অর্থাৎ যৌনকর্মী নন।[১৮]

বাড়ি থেকে জাহাজে ওঠাও কোনো সাধারণ সমস্যা ছিলো না। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কিসে যাবেন জাহাজঘাটে? গাড়িতে করে যাবার কথা উঠলো। কিন্তু সেটাকে এতোই লোকাচার বিরোধী বলে বিবেচিত হলো যে, শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও তা অগ্রাহ্য করা শক্ত মনে হলো। তা ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ আদেশ দিয়েছিলেন পাল্কিতে করে সরাসরি জাহাজঘাটে যাবার জন্যে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদা জাহাজঘাটে গেলেন পাল্কিতে চড়ে। দু বছর পরে, ১৮৬৬ সালের অক্টোবরের শেষে সত্যেন্দ্রনাথ যখন জ্ঞানদাকে নিয়ে বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরলেন, তখন কিন্তু কাউকে কিছু না-জানিয়ে জাহাজ থেকে নেমে তিনি সোজা বাড়িতে ফিরলেন একটা

গাড়িতে চড়ে। তাতে বাড়ির আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা রীতিমতো স্তম্ভিত ও মর্মাহত হন। বাড়ির বাইরের অন্যদের কাছেও এ ঘটনা এতো অসাধারণ এবং লোকাচার বিরোধী বলে বিবেচিত হয়েছিলো যে, সংবাদপত্রে এ খবর ছাপা হয়েছিলো। দেবেন্দ্রনাথও এতে এতোই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, পরে কয়েক বছর পর্যন্ত পুত্রবধূর হঠকারিতা ক্ষমা করতে পারেননি এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি। জ্ঞানদার ভিন্ন ঢঙে শাড়ি পরা, স্বামীর সঙ্গে একত্রে টেবিলে বসে খাওয়া এবং গাড়ি চড়া – এই তিনটি জিনিশ বাড়ির মেয়েমহলকে বিচলিত করেছিলো। ফলে সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদা দেবী নিজেদের বাড়িতেই কিছু কালের জন্যে একঘরে হন।

এ পর্যন্ত যেসব পরিবর্তনের কথা বলেছি সেকালের একজন 'অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূ'র পক্ষে সেসব মেনে নেওয়া অস্বস্তিকর হলেও অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু এর চেয়ে বেশি চোখে পড়ে এমন পরিবর্তন তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিলো। বোম্বাইতে গিয়ে তাঁর তিন মাস থাকতে হয়েছিলো মানেকজী করসদজী নামে একজন সম্ভ্রান্ত পারসি ভদ্রলোকের অতিথি হিশেবে। তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য প্রভাবিত এবং অত্যাধুনিক। তারপর দীর্ঘকাল বাস করতে হয় একজন জাজের স্ত্রী হিশেবে যে-অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা স্বল্পশিক্ষিত এক মহিলার পক্ষে মোটেই সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। তবে জ্ঞানদা দেবীর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সব কিছুই তখন এবং পরবর্তী জীবনে খুব দ্রুত শিখে নিয়েছেন। তিনি যে-পারসি পরিবারে বাস করেছিলেন, তাঁরা এতো পাশ্চাত্য প্রভাবিত ছিলেন যে, তখনই এই পরিবারে ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শেখা দুটি কন্যা ছিলেন। এই পরিবারে বাস করার সময়েই তিনি পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার ও আদবকায়দা আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেন। তা ছাড়া, এ সময়েই তিনি তাঁর অদ্ভুত পোশাক পরাও ছেড়ে দেন এবং পারসি ঢঙে শাড়ি পরতে আরম্ভ করেন। কেবল মানিয়ে নেওয়াই নয়, অনেক ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্যে তিনি নতুন কৌশলও উদ্ভাবন করে নিয়েছেন।

চার

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রথম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাই পোশাকের ক্ষেত্রে। আগেই বলেছি, ফরাসি দর্জির পরিকল্পিত পোশাক পরা তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন কাজ ছিলো। অপর পক্ষে, বোম্বাই-এর পারসি পরিবারে দেখলেন, সে বাড়ির মেয়েরা শাড়ির সঙ্গে পরেন পেটিকোট এবং ব্লাউজ। তাঁরা অবশ্য শাড়ি পরতেন বাঙালিদের উল্টো করে – তাঁদের আঁচলটা থাকতো ডান কাঁধের ওপর। জ্ঞানদানন্দিনী সেই রীতিটাকেই খানিকটা হেরফের করে আঁচলটাকে বাঁ কাঁধের উপরে দিয়ে প্রবর্তন করলেন শাড়ি পরার এমন এক ঢং, যা প্রায় দেড় শো বছর পরে এখনো বাঙালি মহিলাদের আদর্শ হয়ে আছে। এমন কি, পশ্চিম ভারতেও বাঙালিদের দেখাদেখি অনেকে বাঙালিদের মতো বাঁ কাঁধে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরেন। ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মদের ঐতিহ্যিক সমাজের

হিন্দুরা অনেকেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর এই পোশাক ধীরে ধীরে সেকালের ভদ্রলোকদের সবারই প্রামাণ্য পোশাকে পরিণত হয়েছিলো। সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বাঙালি মহিলাদের বাইরে যাবার বড়ো একটা বাধা দূর করেছিলেন। কেবল বাইরে যাওয়া নয়, অতঃপর এভাবে শাড়ি পরাই মহিলাদের সৌন্দর্যেরও একটা অংশ হয়ে ওঠে।

জ্ঞানদা দেবী বোম্বাই থেকে যখন নতুন ভঙ্গিতে শাড়ি পরা শিখে এসে তা ঠাকুরবাড়িতে চালু করলেন, তখন দ্রুত এর কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে মফস্বলে অনেকেই এ সময়ে মেয়েদের জন্যে একটি সংস্কৃত পোশাকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। কিন্তু পোশাকটি ঠিক কী ধরনের হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে একমত ছিলেন না; বরং এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে এ সময়ে বিতর্ক চলছিলো। অনেকে আবার নতুন ধরনের শাড়ি পরা শিখতে আগ্রহী হন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না, ঠিক কী করে শাড়িটা পরতে হবে।

সে সময়ে (১৮৭১) জ্ঞানদা দেবী বামাবোধিনী পত্রিকায় চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের পরিবারে অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহিলারা যে-সংস্কৃত পোশাক গ্রহণ করেছেন, তা একই সঙ্গে সুন্দর এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর উপযোগী। তা ছাড়া, এ পোশাক পরে সহজেই চলাফেরা করা যায়। তাঁর মতে, বাঙালি, য়োরোপীয়, পারসি, মারাঠী, ইহুদী – যাঁরাই এই পোশাক দেখেছেন, তাঁরাই এর প্রশংসা করেছেন। তিনি দাবি করেন, এ পোশাক অংশত য়োরোপীয়, অংশত বাঙালি এবং অংশত মুসলমানি হলেও এটা কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকের অনুকরণ নয়। তিনি বলেন, তখনকার অন্য কোনো কোনো শিক্ষিত পরিবারের মহিলারা যে-পোশাক পরতে আরম্ভ করেছিলেন, এ পোশাক তার চেয়ে খুব ভিন্ন ধরনের নয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অবরোধ ভাঙা এবং পোশাক-আশাকে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধতা ঠাকুর পরিবার প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি, কিন্তু তিনি যে পোশাক চালু করলেন বাড়ির মহিলারা অচিরেই তা গ্রহণ করেন।

এই পোশাকের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের পরিবারের মহিলারা জুতো, মোজা, বডিস, ব্লাউজ, পেটিকোট এবং শাড়ি পরেন। আর বাইরে যাবার সময়ে এসবের ওপরে একটা চাদর পরেন। তিনি বলেন, এ পোশাক পরলে একজন মহিলাকে ঠিক কেমন দেখাবে, তার বিবরণ দেওয়া শক্ত। তবে তাঁকে লিখলে তিনি এ পোশাকের একটা আলোকচিত্র অথবা এরূপ একটা পোশাক পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের মত অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন, মহিলাদের পক্ষে জুতো পরা আবশ্যক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই চিঠিটিই তাঁর প্রকাশিত প্রথম রচনা।

জ্ঞানদা দেবী শাড়ি পরার বিশিষ্ট ঢং প্রবর্তনের পর কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মহারানি সুনীতি দেবী সেই ঢংয়ের খানিকটা রদবদল ঘটান। তিনি শাড়ির সামনের দিকে দুটো ভাঁজ না দিয়ে বাড়তি কাপড়টুকু কুঁচিয়ে রাখার রীতি প্রবর্তন করেন। সেই



শাড়ি–পরা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। শাড়ির সামনের দিকটা কোঁচানো নয়।
পুরো হাতা এবং গলা পর্যন্ত উঁচু কলারওয়ালা ব্লাউজ পরিহিত। পায়ে জুতো।

রীতিই এখনো পর্যন্ত প্রচলিত আছে। বিশ শতকের গোড়ায় তাঁকে এই কুঁচি দেওয়া শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় নিচের আলোকচিত্রটিতে।

একজন সিভিলিয়ানের স্ত্রী হিশেবে জ্ঞানদা দেবীকে মাঝেমধ্যেই সভা, ভোজসভা ইত্যাদিতে যেতে হতো। নিজের বাড়িতেও সম্ভ্রান্ত অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করতে হতো। প্রথম দিকে তিনি পুরুষদের মধ্যে খুবই লজ্জা পেতেন এবং অস্বস্তি বোধ করতেন। প্রথমবার এক ভোজসভায় তাঁর সঙ্গী যখন তাঁকে হাত ধরে তাঁর আসনে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর কাছে আসেন, তখন তিনি লজ্জায় পালিয়ে যান। কিন্তু পারসি পরিবারে বাস করার পর থেকে তিনি খুব কেতাদুরস্ত এবং বিদগ্ধ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে তিনি লৌকিকতার আদবকায়দা সবই দ্রুত শিখে নেন। এরপর থেকে তিনি কয়েকটি ভাষায় সুন্দর ভঙ্গিতে পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন।

তাঁর এই পারদর্শিতার পরোক্ষ প্রমাণ পাই একটি ঘটনা থেকে। ১৮৬৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে পরের বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্যে কলকাতায় ছিলেন। সে সময়েই একদিন – ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে – গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে এক ভোজসভায় তাঁর সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ ছিলো। অসুস্থতার দরুন তাঁর নিজের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলেও, জ্ঞানদা দেবীকে তিনি সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং জ্ঞানদা দেবীও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কতোটা আত্মবিশ্বাস থাকলে সেকালের একজন বাঙালি মহিলার পক্ষে এটা সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজি আদবকায়দা বা এটিকেট তিনি অনেকের কাছ থেকেই শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন – সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের পারসি বন্ধুরা এবং সত্যেন্দ্রনাথের সহকর্মীদের পরিবারবর্গ। বস্তুত, তিনি এসব এতো ভালো শিখেছিলেন যে, ১৮৬৬ সালে মেরি কার্পেন্টার তাঁর আদবকায়দা দেখে প্রশংসা এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

তবে স্বীকার করতে হবে, এ ধরনের আদবকায়দা শিখে চটপটে এবং সামাজিক অর্থে কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠা অনুশীলন সাপেক্ষ হলেও খুব শক্ত নয়। সে তুলনায় ভালো লেখাপড়া শেখা, বিশেষ করে শিক্ষাকে আত্মস্থ করা অনেক কঠিন ব্যাপার। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সে ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে দেশে ফিরে আসার পরে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদার লেখাপড়ার প্রতি খুব যত্ন নিতে আরম্ভ করেন। বিলেত থেকে তিনি হেমেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, যাতে জ্ঞানদা দেবীকে ইংরেজি শেখানো হয়। কিন্তু জ্ঞানদা দেবীর নিজের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী এ সময়ে অক্ষর জ্ঞানের চেয়ে তাঁর ইংরেজি বিদ্যা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। তা সত্ত্বেও, কয়েক বছরের মধ্যে তিনি শুধু যে ভালো ইংরেজি এবং বাংলা শেখেন তাই নয়, তিনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন এবং রীতিমতো সাংস্কৃতিক গুণান্বিত মহিলা হিশেবে পরিচিত হন। তিনি অনেক দিন পশ্চিম ভারতে থাকায় মারাঠি এবং গুজরাটি ভাষাও শিখেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি ফ্রান্সে থাকার সময়ে শিখেছিলেন খানিকটা ফরাসি ভাষা। সেকালে এতোগুলো ভাষা জানা বাঙালি মহিলা আর ছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু থাকলেও খুব কম ছিলেন।

(তরু এবং অরু দত্ত বোধ হয় ব্যতিক্রম। তাঁরা দু বোন খুব ভালো ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষা ছাড়াও, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষা জানতেন।)

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে যে খুব যত্নের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। একবার জ্ঞানদা দেবী কলকাতায় আসেন, সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাইতে থেকে যান। কিন্তু ঘন ঘন চিঠি লিখে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদার লেখাপড়ার খোঁজ নিতেন। কোন কোন বই পড়তে হবে, তাও লিখে পাঠাতেন। তা ছাড়া, তখনো জ্ঞানদা দেবীকে পড়াতে ম্যাম সাহেব আসতেন তাঁদের বাড়িতে।[১৯]

সত্যেন্দ্রনাথ কেবল বই পড়ার মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর মনের জানালা খুলে দিতে চাননি। তিনি জানতেন, বহু বই পড়ার চেয়ে, বাস্তব একটা দৃষ্টান্ত অনেক বেশি কাজ দিতে পারে। বোম্বাই এবং আহমেদাবাদে গিয়ে জ্ঞানদার চোখ অনেকাংশে খুলে গেলেও, সত্যেন্দ্রনাথ চাইলেন তাঁকে য়োরোপে পাঠিয়ে সত্যি সত্যি আধুনিক এবং বিদগ্ধ করে আনবেন। বিলেতের সমাজ এবং মহিলা সম্পর্কে তাঁর যে উচ্চ ধারণা ছিলো, তা আগেই আমরা লক্ষ করেছি। তাঁকে কেন ইংল্যান্ডে পাঠানো হলো সে সম্পর্কে জ্ঞানদা নিজেও একটা কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বোধহয় ওদের ভাষা কায়দাকানুন শেখার জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরেজ সভ্যতার খুব ভক্ত ছিলেন।' তদুপরি প্রথম যৌবনে পিতার বিরোধিতার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বিলেতে নিয়ে যেতে পারেননি। পিতার কর্তৃত্ব থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হবার পরে তিনি তাঁর সেই ইচ্ছাও পূরণ করতে চাইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যথাক্রমে ৫, ৪ এবং ২ বছরের তিনটি শিশুসহ গর্ভবতী জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংল্যান্ডে পাঠান ১৮৭৭ সালের মে মাসে। এর আগে ১৮৭৪ সালেও তিনি স্ত্রীকে নিয়ে য়োরোপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে অজ্ঞাত কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। তাঁর আগে আরও কয়েকজন নারী বঙ্গদেশ থেকে বিলেতে গিয়েছিলেন, সুতরাং তিনি এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন না।

তাঁর আগে যাঁরা যান, তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত। সবার আগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর যান তাঁর স্ত্রী কমলমণি ও তাঁদের তিন সন্তানকে নিয়ে – ১৮৫৯ সালে। এর পরে মাইকেল মধুসূদনের 'স্ত্রী' হেনরিয়েটা তাঁর পুত্রকন্যা নিয়ে যান ১৮৬৩ সালে। আর ১৮৬৯ সালে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত যান তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের দুই কন্যা তরু এবং অরুকে নিয়ে। এঁদের মধ্যে হেনরিয়েটা অবশ্য বাঙালি ছিলেন না। আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে এ বিলেতযাত্রী নারীদের নিয়ে আলোচনা করবো।

এই তিন খৃষ্টধর্মাবলম্বী পরিবারের বাইরে স্ত্রী রাজকুমারীকে নিয়ে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেতভ্রমণে যান ১৮৭১ সালে। এসব দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি তাঁর তিন সন্তান এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে বিলেতে পাঠান ১৮৭৪ সালের দ্বিতীয় ভাগে। এ ছাড়া বারো বছরের পুত্র বিনয়, দশ বছর বয়সী মনোমোহন, প্রায় সাত বছরের অরবিন্দ ঘোষ এবং গর্ভস্থ সন্তান বারীন্দ্রসহ তাঁদের মা স্বর্ণলতাকে নিয়ে কৃষ্ণধন ঘোষ বিলেতে যান ১৮৭৯ সালের প্রথম দিকে। স্বর্ণলতা ছিলেন

রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী, স্বর্ণলতা ঘোষও গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে – ঠিক কোন বছর, আমি তা আবিষ্কার করতে পারিনি। এ ছাড়া ১৮৮০ সাল পর্যন্ত কোনো বাঙালি মহিলা ইংল্যান্ডে যাননি। সত্যি বলতে কি, বিলেত যাবার মধ্য দিয়ে জ্ঞানদা দেবী কেবল চার দেয়ালের বন্দীত্বই ভাঙেননি; তাঁর বিচরণের ক্ষেত্রটাকে অনেক বেশি প্রসারিত করেছিলেন।

সুতরাং বলতে পারি, জ্ঞানদা দেবী বিলেতগামী বাঙালি মহিলাদের মধ্যে সবার আগে না-গেলেও, প্রথম দিকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক বাঙালি মহিলাদের একজন। সন্তানদের নিয়ে তিনি আড়াই বছর ইংল্যান্ডে (জুন, ১৮৭৭ থেকে নভেম্বর, ১৮৭৯) এবং প্রায় তিন মাস ফ্রান্সে বাস করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথসহ তিনি এস এস অক্সাস জাহাজে করে ফ্রান্স ত্যাগ করেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে। প্রবাসে থাকার সময়ে তিনি এবং তাঁর সন্তানরা ভালো ইংরেজি বলতে শিখেছিলেন। তা ছাড়া, জ্ঞানদা দেবী নিজেই বলেছেন, তিনি সাধারণ কথাবার্তা চালানোর মতো ফরাসি ভাষাও শিখেছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরাও অল্পস্বল্প ফরাসি শিখেছিলেন।[২০] একাধিক ভাষা শেখা ছাড়া, য়োরোপ ভ্রমণের ফলে জ্ঞানদা দেবী খুব ফ্যাশনদুরস্ত ও বিদগ্ধ মহিলায় পরিণত হয়েছিলেন। মোট কথা, বিলেত যাবার ফলে তিনি হিন্দুদের বহু যুগের লোকাচারে একটা রূঢ় আঘাত দিয়েছিলেন। এই আঘাতের ফলে পরবর্তী সময়ে অন্য মহিলাদের পক্ষে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছিলো।

এভাবেই জ্ঞানদা দেবী আর সত্যেন্দ্রনাথের মিলিত প্রয়াসে সেকালের প্রথম আধুনিকার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিলো। বস্তুত, জ্ঞানদা তাঁর স্বামীকে যোগ্যতা এবং সাহসিকতার সঙ্গে সাহায্য না-করলে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে জ্ঞানদার অবরোধ মোচন করা অথবা তাঁকে স্বাধীন নারীর দৃষ্টান্ত হিশেবে দাঁড় করানো সম্ভব হতো না। জ্ঞানদা যে প্রতিভাবান ও সাহসী নারী ছিলেন, এ বিষেয়ে সন্দেহ নেই। নয়তো ১৮৮০-এর দশকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটক রাজা ও রানির অভিনয়ে অংশ নিয়ে জ্ঞানদা নিজেকে সেকালের পত্রিকার মতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিশেবে প্রতিপন্ন করতে পারতেন না। কেবল মাত্র স্বামীর উৎসাহেই এটা সম্ভব হতে পারেনি। তাঁর নিজের সুপ্ত প্রতিভা ছিলো বলেই, উৎসাহ দিয়ে স্বামী সেটাকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

পাঁচ

মহিলাদের সংগঠিত করে তাঁদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত করার কাজেও জ্ঞানদা দেবী যোগ দিয়েছিলেন। সখী সমিতির তিনি কেবল সদস্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই সমিতির অন্যতম উৎসাহী কর্মী। জ্ঞানদা দেবী আরও একটি অভাব লক্ষ করেছিলেন, যা একজন সচেতন নারীকর্মী হিশেবে তাঁর নজরে আসা স্বাভাবিক ছিলো। তিনি লক্ষ

করেছিলেন, সেকালের সংস্কারবাদী পুরুষরা সমাজ এবং নারীদের জাগরণের জন্যে নানা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করাসহ নানা ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু শিশুদের মনের বিকাশের জন্যে কিছুই করছিলেন না। জ্ঞানদা দেবী এই জন্যে বালক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালের বৈশাখ মাসে। তিনি বছর খানেক সম্পাদিকা হিশেবে এ পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠক হিশেবে তাঁর এই উভয় ভূমিকাই অসামান্য বলে বিবেচিত হতে পারে। শিশুদের জন্যে বালক পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও, তিনি দুটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন টাকডুমা ডুম ডুম এবং সাতভাই চম্পা। পুস্তিকা দুটির বিশ্বভারতী সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ ১৯৫১ সালে।

আগেই দেখেছি, সামাজিক মনোভাবের দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বেশ রক্ষণশীল। পরিবারের সদস্যদের ওপর তাঁর প্রভাবও ছিলো অপরিসীম। সুতরাং ঠাকুর পরিবারে অবরোধ প্রথা কমবেশি কঠোর নিয়মের সঙ্গে পালিত হতো। তা সত্ত্বেও, ১৮৭০-এর দশকে সে পরিবারে অবরোধ প্রথা অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার জনবহুল রাস্তায় ঘুরতে বের হন – ঈশ্বর গুপ্ত যা তাঁর উর্বর কবিত্ব দিয়েও কল্পনা করতে পারেননি। এই যে কল্পনাতীত দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারলো, তার পেছনে কাজ করেছিলো জ্ঞানদা দেবীর দৃষ্টান্ত। জ্ঞানদা আর সত্যেন্দ্রনাথ মিলে একবার অবরোধের ভিতটা নাড়া দেবার পরে তাঁদের তুলনায় আরও বেশি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলেন অন্যরা।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঠিক সাহিত্যিক ছিলেন না। তবে ১৮৭০-এর দশকে বামাবোধিনী পত্রিকায় দুতিনটি ছোটো রচনা এবং ১৮৮১ সাল থেকে মাঝেমধ্যে ভারতী-সহ একাধিক পত্রিকায় ছোটোখাটো প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সমাজ এবং সমাজসংস্কার। স্ত্রীশিক্ষা এবং সমাজসংস্কার বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলো বর্তমান কালে কিছু ঐতিহ্যিক বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সে যুগে এসব রচনায় আধুনিকতার অভাব ছিলো না। সত্যি বলতে কী, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি কোথাও কোথাও আন্তরিক মমত্ব দেখালেও, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে বহু কালের সযত্নে লালিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করতেও দেখি।

একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি তাঁর দরদের অভাব এমনি একটি স্ববিরোধ। সেকালে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশের ফলে কোনো কোনো মহিলার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়। এই শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা সমাজ এবং সংসার থেকে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিশেবে ভাবতে আরম্ভ করেন। নিজ নিজ সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির চিন্তা এবং নিজেদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা খাটানোর আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে জোরদার হয়ে উঠছিলো। এই ঘটনাকে বঙ্গদেশের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের এবং আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই নব্য যুবক-যুবতীরা একক অথবা বর্ধিত পরিবারের পরিমণ্ডলে ঘনিষ্ঠতর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এবং সন্তানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বন্ধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা স্বামী

এবং স্ত্রীকে গণ্য করেন অনেকটা পরস্পরের সঙ্গী হিশেবে। তাঁরা মনে করেন, স্বামী এবং স্ত্রীর এ ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেবল একক পরিবারেই গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং তাঁরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে আরম্ভ করেন।

জ্ঞানদানন্দিনী এবং সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য – যদিও জ্ঞানদা দেবী কোথাও সরাসরি একান্নবর্তী পরিবারের নিন্দা করেননি। সে যুগে যে-স্বল্পসংখ্যক মহিলা একক পরিবারে বাস করেন, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানদা দেবীই সম্ভবত প্রথম একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লেখেন। এই আত্মজীবনী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, একক পরিবারে বাস করে তিনি সুখী হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতোটা ভালোবাসা এবং বোঝাপড়ার ওপর স্থাপিত হতে পারার অন্যতম কারণও তাঁদের একক পরিবারে বাস। লম্বা ছুটিতে কলকাতায় এলে বেশির ভাগ সময়েই তাঁরা জোড়াসাঁকোয় না-উঠে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিতেন।

পশ্চিম ভারত এবং ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটায় জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে জ্ঞানদা যথেষ্ট পরিমাণেই ভিনদেশীয় রীতিনীতি আয়ত্ত করেছিলেন। যেমন তিনি ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে বিলেত থেকে ফেরার পর তাঁর সন্তানদের জন্মদিন পালন করতে আরম্ভ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মধ্যে অতঃপর এ রীতি ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। বিলিতি রেওয়াজের অনুকরণে জন্মদিন উদ্‌যাপনের রীতি চালু করলেও, স্বদেশী রীতি বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য রীতিনীতি গ্রহণের পক্ষে তিনি সায় দিতে পারেননি। তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে নব্যশিক্ষিতদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, এঁরা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া বা জামাইষষ্ঠীর মতো দেশীয় উৎসব পালন না-করে, পাশ্চাত্য কায়দায় জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন, ইংরেজি নববর্ষে অভিনন্দন পাঠান এবং পয়লা এপ্রিল বন্ধুদের এপ্রিল ফুল করেন। তিনি আরও বলেন যে, এঁরা খৃস্টান না-হলেও, ক্রিস্টমাস কেক কিনে বন্ধুদের সঙ্গে খান, অথচ কোজাগরি পূর্ণিমায় বাঙালিদের মধ্যে নারকেল কোরা এবং চিঁড়ে খাওয়ার যে-রীতি আছে, তাকে অবজ্ঞা করেন।

বিলেত থেকে ফেরার পর সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে তিনি খুব পাশ্চাত্য রীতিনীতির ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে তিনি বলতে গেলে মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

Aunt Jnanadanandini presided over the Inga-Banga Samaj consisting of English-educated Indians.... The afternoons would start with tennis and tea and end with supper....[২১]

তাঁর সান্ধ্য আসরে যোগ দিতেন তখনকার অভিজাত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকরা। তা ছাড়া, ইন্দিরা দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবীর মতো ঠাকুর পরিবারের অনেক আধুনিকাও সেখানে অসংকোচে হাজির থাকতেন। এ রকমের মেলামেশার ফলেই প্রতিভা দেবী এবং ইন্দিরা দেবীর বিয়ে হয়েছিলো আশুতোষ চৌধুরীর পরিবারের দুই বিলেত ফেরত পুত্রের সঙ্গে। লোকেন পালিত অথবা কবি

মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে সরলা দেবীর পরিচয়ও সম্ভবত এই আসরে। এই আধুনিকতা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এতো আধুনিকতা সত্ত্বেও, জ্ঞানদা দেবী বিয়ের ব্যাপারে তাঁর মতামত যেভাবে ইন্দিরা দেবীর ওপর চাপিয়ে দিতে চান, সেটাকে তাঁর একটা স্ববিরোধ বলেই আমার কাছে মনে হয়।

ছয়

কোথাও কোথাও তাঁর মধ্যে এক ধরনের পিছুটান থাকলেও, ১৮৮০ অথবা ১৮৯০-এর দশকের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো মহিলার চেয়ে সমাজসংস্কার বিষয়ক মনোভাবে তিনি কম প্রগতিশীল ছিলেন না। তিনি যে পাশ্চাত্যায়নের নির্বিচার সমর্থন করেননি, তার কারণ রাজনীতি সচেতন ভদ্রলোক সমাজই তখন মনোভাবের দিক দিয়ে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী এবং পাশ্চাত্যবিরোধী হয়ে পড়ছিলেন। তা ছাড়া, সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ঠাকুর পরিবারের অংশত যে রক্ষণশীল মনোভাব ছিলো, হতে পারে তার দ্বারাও তিনি খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর তিনি যে কেবল সীমিত মাত্রায় নারীমুক্তির জন্যে ওকালতি করেছিলেন এবং সন্তান লালন, ঘরের কাজ আর রান্নাবান্নাকেই মহিলাদের মুখ্য ভূমিকা বলে গণ্য করেন, এবং ক্ষেত্র বিশেষে এসব ভূমিকার ওপর গৌরব আরোপ করেন, তার কারণ তখনো বাঙালি মহিলাদের সচেতনতা নারীবাদের পর্যায়ে উপনীত হয়নি। পুরুষরা যে মহিলাদের নিজের কাজে লাগান এবং শোষণ করেন – এই ধারণা তখনো তাঁদের মধ্যে দানা বাঁধেনি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মারা যান ঠিক ৮৯ বছর বয়সে – ১৯৪১ সালে।

---

১ সমাচার দর্পণ, ৩ মার্চ ১৮৩৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সং; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৫০), ৯৯।

২ ইন্দিরা দেবী, স্মৃতিসম্পুট, ১ (পুনর্মুদ্রণ; শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী, ২০০০), পৃ. ৭৪।

৩ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি' প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৮। তিনি লিখেছেন, 'কলিকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুয্যে-মশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন।' সৌদামিনীকে স্কুলে পাঠানোর কথা জানিয়ে রাজনারায়ণ বসুকে ১৮৫১ সালের ২৫ আষাঢ় তারিখে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

৪ স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের বাড়ির মহিলারা আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া না-শিখলেও, কেউই নিরক্ষর অথবা অশিক্ষিত ছিলেন না। বরং তাঁরা অবসর সময়ে প্রায় সবাই কোনো না কোনো বই পড়তেন। একজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন যে, তাঁর মায়ের খুড়িমা এমন বইয়ের কীট ছিলেন যে, কোনো বই না পেলে তিনি অভিধান খুলে বসতেন। তাঁদের পড়া বই জমে

ক্রমে অন্তঃপুরে রীতিমতো লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিলো। ('আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার', প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬।)

৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, (দ্বিতীয় সং; কলকাতা : বৈতানিক, ১৯৬৭), পৃ. ৫।

৬ ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত পুরাতনী (কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েটেড), পৃ. ২৪-২৫।

৭ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি, পুরাতনী, পৃ. ৪৬-৪৭।

৮ ঐ।

৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (কলিকাতা : ১৯১৫), পৃ. ৪।

১০ সাহিত্যসাধক চরিতমালার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্বিতীয় সং; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬২), পৃ. ২৮। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের এই দাবি সঠিক নয় বলেই মনে হয়। অনন্ত এ বই মুদ্রিত হয়নি।

১১ পুরাতনী, পৃ ৪৭।

১২ পুরাতনী, পৃ ৪৮-৪৯।

১৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (কলকাতা : সিগনেট, ১৯৫২), পৃ. ৬৭-৬৮; ১১১।

১৪ পুরাতনী, পৃ ৫৩।

১৫ ঐ, ৪৯-৫০।

১৬ পুরাতনী, পৃ ৫৮।

১৭ Fanny Parks, Wanderings of a pilgrim: in search of the picturesque, during four and twenty years in the East : with revelations of life in the Zenana (London, 1850), p. 59, 60.

১৮ Nirod C Chaudhuri, Autobiography of an Unknown Indian (), p.

১৯ পুরাতনী, পৃ. ৪১।

২০ (পরবর্তী কালে [১৮৯২] কন্যা ইন্দিরা দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতক হয়েছিলেন।)

২১ Rathindranath Tagore, On the Edges of Time (Calcutta,1981). p.

৪

প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা

বিবি তাহেরন নেছা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছেন, 'একালের সাহিত্যে তিনিই প্রথম মুসলমান লেখিকা।'[১] এখানে *একাল* এবং *প্রথম* শব্দ দুটির অর্থ সুনিরূপিত নয়। *একাল* বলতে তিনি ঠিক কোন সময়সীমা বোঝাতে চেয়েছেন বলা শক্ত। *প্রথম* কথাটিও আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। কারণ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যের* অন্যত্র ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর (১৮৫৮?–১৯০৩) *রূপজালাল* গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[২] এই গ্রন্থটি রোকেয়ার জন্মের আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো। ফয়জুন্নেসাই প্রথম মুসলিম লেখিকা কিনা, সে সম্পর্কে আনিসুজ্জামান কোনো মন্তব্য করেননি। আধুনিক কালে প্রথম মুসলমান লেখিকা কে, আমরাও সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু রোকেয়া অথবা ফয়জুন্নেসা যে নন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর *উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পারমার্থিক ভাব* (১৮৬০) গ্রন্থকে প্রথম মুসলমান লিখিত গদ্য গ্রন্থ বলে দাবি করা হয়।[৩] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পাঁচ বছরের মধ্যে বিবি তাহেরন নেছা নামক একজন মুসলমান নারীর রচিত একটি গদ্য নিবন্ধ *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। এই মহিলাকে সম্ভবত প্রথম মুসলমান গদ্য–লেখিকা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকার 'বামারচনা বিভাগে' প্রকাশিত এই নিবন্ধের কোনো নাম দেওয়া হয়নি। প্রকাশের জন্যে রচনাটি লেখিকা যে ১৮৬৪ সালের অক্টোবর–নভেম্বর মাসের আগেই *বামাবোধিনী পত্রিকার* দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। *বামাবোধিনী পত্রিকায়* এ সময়ে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বিবি তাহেরন নেছা সহ পাঁচজন মহিলার উদ্দেশ্যে বলা হয় : প্রেরিত রচনাগুলো যে তাঁদেরই রচিত 'রচয়িত্রীরা অনুগ্রহপূর্বক ভাল করিয়া প্রমাণ দিয়া পাঠাইলে' তাঁদের রচনা প্রকাশিত হবে।[৪]

তাহেরন নেছার রচনাটি শেষ পর্যন্ত ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে লেখিকা নিশ্চয়ই এমন প্রমাণ পাঠিয়েছিলেন যে, নিবন্ধটি তাঁরই রচনা। প্রকাশিত নিবন্ধের শুরুতে *বামাবোধিনী পত্রিকার* 'বামাকুলহিতৈষী সম্পাদক'কে সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন।

তাহেরন নেছার কোনো পরিচয় মেলে না। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের শেষে তাঁর ততোধিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। এই বোদা হলো রংপুর-দিনাজপুর এলাকায়। রংপুরে একটি বোদা আছে। জেলার সীমানা অনেকবারই বদল করা হয়েছে, সুতরাং দিনাজপুরও হতে পারে। কিন্তু ১৮৬৪ সালে কলকাতা থেকে অতো দূরে একটি বালিকা বিদ্যালয় কাজ করছিলো এবং তাতে তখন প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হয়েছিলো—একে খুব সাধারণ ঘটনা বলে মনে করা শক্ত। সদ্যপ্রকাশিত *বামাবোধিনী পত্রিকা*ও ততোদিন সেখানে পৌঁছে গেছে, সেটাও খুব সাধারণ ঘটনা নয়।

সে যাই হোক, তখন বঙ্গদেশে মহিলাদের কোনো উচ্চ বিদ্যালয় ছিলো না। সুতরাং এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেকালের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েরা সামান্যই লেখাপড়া শিখতেন। বেথুন স্কুল খোলার পনেরো বছর পরে—১৮৬৪ সালে সে স্কুল পরিদর্শন করে স্কুল ইনসপেক্টর যে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন, তা থেকে লেখাপড়ার নিতান্ত নিম্নমানেরই আভাস পাওয়া যায়। মোট ৬৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ২১ জন ছাত্রী ছিলো যারা সামান্য পড়তে এবং খুব সহজ বই বুঝতে পারতো। একটি গল্প পড়ে বুঝতে পারতো তেমন ছাত্রী ছিলো মাত্র ১৬ জন। রাজধানী কলকাতার যখন এই পরিস্থিতি ছিলো, তখন কলকাতার বাইরে কটা স্কুল ছিলো অথবা সেসব স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা কতো ছিলো এবং সেই ছাত্রীরা কতোটা লেখাপড়া শিখাত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত, ১৮৬৩ সালে গোটা বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯৫-তে এবং এসব বিদ্যালয়ে মোট ২,৪৮৬ জন ছাত্রী তালিকাভুক্ত ছিলো।[৫] এর পরিপ্রেক্ষিতে তাহেরন নেছার অস্তিত্বকে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তাঁর রচনাটি প্রকাশিত হবার আগে সেটি যে তাঁরই লেখা তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাঠাতে বলা হয়েছিলো। সুতরাং ধরে নিচ্ছি, এটি তাঁর নিজেরই লেখা। এবং এ রকমের একটি পাঠশালায় অধ্যয়নরত মুসলিম পরিবারের একটি বালিকার পক্ষে লিখতে পারার কৃতিত্বকে অসামান্য বলে বিবেচনা করতে হয়।

লেখিকা এ নিবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা এবং উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন। শুরুতেই তিনি বলেছেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রেণী কোনো একটি না-থাকলে পৃথিবীর 'পরম মঙ্গলাকর নিয়মসকল প্রতিপালিত' হতো না, বরং পৃথিবী 'জনশূন্য অরণ্যানী তুল্য বোধ হইত।' সৃষ্টিকর্তা মানুষকে 'পরম হিতকর ও সুখবিধায়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী' জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু লেখিকা আক্ষেপ করে বলেছেন, এদেশের মহিলারা সেই বিদ্যাধনে বঞ্চিত হয়ে বিশ্বের অনুপম শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। 'স্ত্রীলোকেরা স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বভাবত চঞ্চল' —তাহেরন নেছা সেকালের

এই জনপ্রিয় বিশ্বাসের উল্লেখ করে বলেছেন বিদ্যার অভাবে এই স্ত্রীলোকেদের পক্ষে যে-কোনো অনর্থ করা সম্ভব। কারণ 'এমন কোন গর্হিত কর্মই নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয় না।' তা ছাড়া, 'অজাত ও মৃত পুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান অসীম দুঃখের উৎস।'

অপর পক্ষে বিদ্যোপর্জনের দ্বারা স্ত্রীগণের হৃদয়াকাশ আলোকিত হলে তাঁরা 'শৃঙ্খলার সঙ্গে সংসার ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্বচনীয় আনন্দোপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।' লেখিকা আরও বলেন শিক্ষার আলোক পেলে মহিলারা গুরুজন, সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্যের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারেন। এবং বিদ্বান পুত্রের মতোই 'পিতৃ ও স্বামী উভয়কুল সমুজ্জ্বল' করতে পারেন। প্রসঙ্গত লেখিকা লীলাবতী, খনা, রানি ভবানী প্রমুখ মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন।

উপসংহারে লেখিকা বলেন, 'যদি ধরাধামকে যথার্থই সুখধাম রূপে দেখার বাসনা থাকে' তা হলে পুরুষ সমাজ যেন সকল ঔদাসীন্য বর্জন করে 'স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা' পান।

দুই

বর্তমান প্রবন্ধটি তাহেরন নেছার প্রকাশিত রচনার মধ্যে সম্ভবত সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ। কিন্তু এই প্রবন্ধের ভাষা ও রচনাশৈলী এবং লেখিকার শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বিবেচনা করলে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনাটিকে অসাধারণ বলে আখ্যায়িত করতে হয়। সে সময়কার অন্য দুজন মুসলমান লেখকের গদ্যের সঙ্গে তাহেরন নেছার গদ্যের তুলনামূলক আলোচনা করলেই তাহেরনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারি। শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীর *উচিৎ শ্রবণ* গ্রন্থের গদ্যের একটি নমুনা :

> কখনো কখনো সকালে সন্ধে অবকাশ মতে মনো আকিঞ্চন দ্বারায় মনোযোগ হইয়া অত্র পুস্তকের দুই এক গল্প যাহা পাঠ করিতে অল্প হয় দৃষ্ট করিলেই অতি অবশ্য কল্পতরু হইবার সম্ভাবনা রসনার দ্বারায় ঘোষণা করিলেই বাসনা পূর্ণ হয়, আর যাহাকে দৃষ্টি বলা যায় তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে নিরক্ষণ করিলেই অত্র পুস্তকের মধ্যে যে সকল বচন রচন হইয়াছে অমূল্য রতন জ্ঞানে যতন করিলেই শারীরিক পত্তন ঔ পতনের মর্ম্ম ও নিরঞ্জন আরাধন ধর্ম্ম আর যে সকল কর্ম্ম তাহা সকল হইতে জ্ঞাপন হইবে।[৬]

প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রাসের ব্যবহার থাকলেও, গুণের বিচারে উদ্ধৃত বাক্যটিকে উৎকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করা মুশকিল। সংকলিত শব্দসমূহের মধ্যে যে যোগাযোগ তা আদৌ ঘনিষ্ঠ বা দৃঢ় নয়। আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'এই দীর্ঘায়িত এবং অনুপ্রাসমণ্ডিত বাক্যরীতি আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' এ উক্তির মধ্যে সত্যতা আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষায় সুচিন্তিত পদক্রম ও যে-সাবলীল গতি আছে, শামসুদ্দীনে তা একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক ছিলেন

বলে তাঁর ভাষায় যে প্রকাশ ক্ষমতা এবং বোদ্ধতা ছিলো, এ রচনায় তার অভাবও অত্যন্ত প্রকট। বস্তুত, এ ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং দুর্বোধ্য।

শেখ আজিমুদ্দীনের *কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে* প্রহসনে যে গদ্যের নিদর্শন মেলে তাও খুব আড়ষ্ট এবং সাবলীলতাবর্জিত। এই প্রহসনের একটি অংশ নিম্নরূপ :

> এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট অধিক ধন ও স্বর্ণমুদ্রা রজত কাঞ্চন এবং মুক্তা পরলাদিতে গুঞ্জিতা, অলঙ্কারাদি অধিক, লৌহ সিন্ধুকে পূর্ণিত ও বশত শালভূমি ইত্যাদি উত্তম ২ অট্টালিকা দোতালা তেতালা থাকায় পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ আয়ু দ্বারা তাহার জীবদ্দশায় স্বপরিবারের লোকান্তর হওয়াতে বৃদ্ধ কর্ত্তা একা ভৃত্যগণের সেবার দ্বারা কাল যাপন করিবায় উক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির বণিতার কাল হওয়া পর্য্যন্ত অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে দিনপাত করেন...।[৭]

১৮৬৮ সালের আগেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ প্রধান রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং আজিমুদ্দীনের ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব থাকা সম্ভব ছিলো। কিন্তু আজিমুদ্দীনের ভাষায় কোথাও কোথাও বিদ্যাসাগরের শব্দাড়ম্বর থাকলেও, তাঁর রচনাশৈলীর গুণগুলো অনুপস্থিত। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগরের গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দঃস্রোত উদ্ধৃতাংশে আদৌ লক্ষ করা যায় না।

বিদ্যাসাগরের শব্দ যোজনার কৌশল, বিশেষত যতি সংস্থাপন, সম্পর্কে জানা মুসলমান লেখকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনেই দেখা যায়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *রত্নবতী* (১৮৬৯) থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটি এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারবে।

> গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল। রাজপুত্রের নাম সুকুমার এবং মন্ত্রিপুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালাবধি যৌবনকাল পর্যন্ত একত্র ভোজন একত্র শয়ন এবং এক সঙ্গে ক্রীড়াদি করাতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য গতি! মানুষের সৌভাগ্যশশী কখনই সমভাবে থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[৮]

এই গদ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যাসাগরের প্রভাব আছে, এ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। বস্তুত, এই রচনাশৈলী বিশেষভাবে *বেতালপঞ্চবিংশতি*কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে লেখক বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গি পুরোপুরি অনুকরণ করতে না-পারায় বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের তাবৎ গুণ এতে অবর্তমান।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য, মীর মশাররফ হোসেনের আগে তাহেরন নেছার গদ্যেই বিদ্যাসাগরের প্রভাব পড়েছিলো। তাঁর গদ্য সম্পর্কে *বামাবোধিনী পত্রিকার* সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন যে, তা শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। এ মন্তব্য সঠিক। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য এ ভাষাতে সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু শব্দগুলো ধ্বনিসামঞ্জস্য এবং অর্থের দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ অন্বয়বিশিষ্ট। শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী এবং আজিমুদ্দীনের ভাষার আড়ষ্টতার পরিবর্তে তাহেরন নেছার ভাষায় একটি অভ্রান্ত সাবলীলতা লক্ষণীয়। বয়সে বালিকা

এবং বিদ্যায় অপরিণত হলেও, তাহেরেন নেছা সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের ভাষার সেই বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার এবং আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথ যাকে গদ্যের ছন্দঃস্রোত বলে অভিহিত করেছিলেন। বিবি তাহেরেনের রচনার একটি অংশ বিশ্লেষণ করলে এই উক্তির সত্যতা অনুধাবন করা সহজ হবে।

> বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্মই নাই যে তাহা মূর্খদ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত এবং মৃতপুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে? বিদ্যোপার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয় আকাশ জ্ঞানশশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম প্রতিপালনপূর্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।... পুত্র বিদ্বান হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃকুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবলম্বিনী হইলে সে যে তদ্রূপ পিতৃ এবং স্বামী উভয় কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি?

উপরের অংশে দেখতে পাই, লেখিকা বেশ দক্ষতার সঙ্গে শ্বাসযতি এবং অর্থযতির সম্মিলন ঘটিয়েছেন। সে জন্যেই পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। বরং সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে পাঠক এগিয়ে যেতে পারেন। অর্থের দিক দিয়েও এ অংশে কোথাও অস্পষ্টতা নেই।

বিদ্যাসাগরের রচনার সঙ্গে আলোচ্য নিবন্ধের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ রচনাশৈলীর। একটির পর একটি যুক্তি সাজিয়ে বিদ্যাসাগরের মতোই বিবি তাহেরেন আপন বক্তব্যে উপনীত হন—স্ত্রীলোককে শিক্ষাদান অবশ্যকর্তব্য। পরিমিত ভাষণ এবং জোরালো যুক্তি দিয়ে আপন বক্তব্য পেশ করতে পারার এই দুর্লভ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সমকালে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্ত ছাড়া এই ক্ষমতার অধিকারী খুব বেশি লেখক ছিলেন না। বিবি তাহেরেন নেছা সেকালের নিতান্ত তুচ্ছ বালিকা বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর ভাষা এবং রচনাশৈলী সেকালের বহু গদ্য লেখকের তুলনায় পরিণত ছিলো। তাহেরেন নেছা এই রচনার যেখানটায় অন্ধত্ব ও মূর্খত্ব থেকে বিপদ ঘটতে পারে এবং অজাত ও মৃতপুত্র একবারই শোকের কারণ হয় বলে উল্লেখ করেছেন, সেখানটায় তাঁর যুক্তি খুব জুতসই হলেও, এ ধারণাটি তাঁর মৌলিক নয়। এটি তিনি ধার করেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *হিতোপদেশ* থেকে।

বিবি তাহেরেনের আর কোনো রচনা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বর্তমান রচনায় যে-মহৎ সম্ভাবনার বীজ লুকানো ছিলো, হয়তো লেখিকার বিবাহের ফলে সেকালের বহু মহিলার মতোই তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায়, আলোচ্য নিবন্ধটি গুণগত মানের বিচারে এতো অসাধারণ যে, এরই দাবিতে বিবি তাহেরেন প্রথম যুগের মুসলমান গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে তো

বটেই, এমন কি তাবৎ মহিলা লেখকের মধ্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে পারেন।

বিবি তাহেরন নেছার রচনাটির প্রতিলিপি

বামাগণের রচনা

বামাকুলহিতৈষী শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

পরাৎপর পরম পিতা জগদীশ্বরের কি অপার মহিমা যে তিনি স্বীয় সৃষ্টি রক্ষার কারণ স্ত্রীপুরুষ এই উভয় জাতি সৃজনপূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রমণীয় শোভাবর্দ্ধন করতঃ আপনাভিপ্রায়সকল সাধন করিতেছেন। এই দ্বিবিধ জাতির মধ্যে একের অভাবে বিশ্বস্থিত মঙ্গলাকর নিয়মসকল প্রতিপালিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং মেদিনীমণ্ডল কত দূর পর্য্যন্ত যে জনশূন্য অরণ্যানীতুল্য বোধ হইত তাহা বাক্‌পক্ষাতীত। হা, পরম করুণাকরের কি কারুণিক ভাব যে যাবতীয় বাহ্য দ্রব্য প্রদানেও তিনি ক্ষান্ত না থাকিয়া ধর্ম্মসুখে সুখী করণার্থ সর্ব্বধনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরম হিতকর ও সুখবিষয়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী জ্ঞান মনুষ্যজাতিকে প্রদানপূর্বক তাহাদের সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মানুসারে কার্য্য সম্পাদনার্থে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এ দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারত্ন অভাবে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তার সেই অনুপম সুশৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলা করিতেছে। দেখুন, যখন জনপ্রবাদ আছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বল্পবুদ্ধি ও স্বভাবতঃ চঞ্চলা, অথচ তাহারাই আবার কুলাচার অবলম্বনের প্রধান কারণ, তখন যদি ঈদৃশ পরম হিতসাধন বিদ্যা দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধতাকে দূরীকরণ করা না যায়, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র মহিমায়, স্বীয় সন্তানসন্ততি ও আপনার শরীর রক্ষার ও পিতামাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি অজ্ঞানতা হেতু কুসংস্কারাপন্ন হইয়া উঠে। শস্ত্রোক্তি আছে যে যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেকতা এই চতুষ্টয় মধ্যে প্রত্যেকেই অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকেরা অবিদ্বান হইয়া প্রাগুক্ত চতুষ্টয়ের সংশ্রবে কি না করিতে পারে? বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্মই নাই যে তাহা মূর্খদ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত এবং মৃতপুত্র কেবল একবার দুঃখদায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে? বিদ্যোপার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয় আকাশ জ্ঞানশশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা বিদ্যাবতী হইলে পিতৃ মাতৃ স্বামী প্রভৃতি গুরুজন, সন্তানসন্ততির ও অন্যান্যের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষমা হয়। পুত্র বিদ্বান হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃকুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবলম্বিনী হইলে সে যে তদ্রূপ পিতৃ এবং স্বামী উভয় কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি? এ দেশীয় পূর্বতন রমণীগণ মধ্যে লীলাবতী, খনা, রানি ভবানী প্রভৃতি স্ত্রীগণ আপন আপন বিদ্যা প্রভাবে কিরূপ যশোরাশি বিস্তার করত পিতৃ ও স্বামী বংশ উজ্জ্বল করিয়া জীবনের

সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আহা! এই অনিত্য অবনীধামে যদি স্ত্রীলোকেরা প্রত্যেকেই বিদ্যাবতী হইয়া ধর্ম্মপথানুগামিনী হন; তবে দুঃখমণ্ডল পরিবৃত এই ভূমণ্ডলে যে কি প্রকার এক আনন্দের ধাম হয় তাহা মনে উদয় হইলে অসীম আনন্দোৎপত্তি হয়। অতএব হে দেশীয় সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা আর স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না। যদি এ ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যাভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা পান।

শ্রীমতী বিবি তাহেরণ লেছা
বোদা বালিকা বিদ্যালয়,
১ম শ্রেণীস্থ ছাত্রী।

তাহেরন নেছার নামের বানান সম্পর্কে একটি কথা :

তাহেরন নেছার নামের বানান *বামাবোধিনী পত্রিকায়* তাহেরণ লেছা লেখা হয়েছে। মুসলমানদের নামের সঙ্গে হিন্দু লেখকদের পরিচয় তাহেরন নেছার সওয়া শো বছর পরেও যতো নগণ্য বলে দেখতে পাচ্ছি, তাতে ১৮৬০–এর দশকে সম্পাদক যদি নেছার *নে*–কে *লে* হিশেবে পড়ে থাকেন, তা হলে তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বিশেষ করে সেকালের হাতের লেখায় *ন* এবং *ল*–এর পার্থক্য সামান্যই ছিলো। আর নেসার *স*–কে এখনো অনেকেই *ছ* লেখেন।

১ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম–মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০১), পৃ. ২৮২।

২ ঐ, পৃ. ১৪৫–৪৭।

৩ ঐ, পৃ. ১৪১। আনিসুজ্জামান তাঁকে প্রথম গদ্য লেখক বলে আখ্যায়িত করেননি। তবে যাঁরা প্রথম দিকে গদ্যে লিখেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁদের মধ্যে এঁকেই প্রথম উল্লেখ করেন।

৪ *বামাবোধিনী পত্রিকা,* **(অক্টোবর**-নভেম্বর, **১৮৬৪)।**

৫ *General Report on Public Instruction in Bengal, 1863-64* (Calcutta: B. S. Press, 1864).

৬ *মুসলিম–মানস ও বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪২।

৭ **শেখ আজিমুদ্দীন,** *কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে* (দ্বিতীয় মুদ্রণ, **কলিকাতা, ১৮৬৮)।**

৮ মীর মশাররফ হোসেন, রত্নবতী,।

৫

প্রথম নারীপ্রগতিবাদী

কৃষ্ণভাবিনী দাস

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁকে বলেছি প্রথম আধুনিকা। সত্যি সত্যি, শিক্ষা এবং বৈদগ্ধ্য লাভ করে ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে তিনি তখনকার বাঙালি সমাজে মহিলাদের আধুনিকতার এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যার কোনো তুলনা অন্তত পরবর্তী দু দশকের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিলেত ঘুরে এসে তিনি তাঁর নিজেরই গড়া আধুনিকতার সংজ্ঞাকে আর-এক বার ভাঙেন ১৮৮০-র দশকে। কিন্তু পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, শিক্ষায় এবং রুচিতে আধুনিক হয়ে ওঠা আর নারীপ্রগতি সম্পর্কে যথার্থই সচেতন হয়ে ওঠা, এক জিনিশ নয়। জ্ঞানদা দেবী ইংরেজদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে এবং বিলেত ঘুরে এসে ইংরেজ মহিলাদের বৈদগ্ধ্য আয়ত্ত করেছিলেন অনেকটাই, কিন্তু তখনকার ইংল্যান্ডের নারীসমাজে নারীর অধিকার এবং প্রগতির যে-আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করছিলো, তাতে দীক্ষিত হননি, অথবা সে ধারণার দ্বারা বাঙালি সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসও পাননি। সেটা প্রথম বারের মতো লক্ষ করি কৃষ্ণভাবিনী দাসের মধ্যে।

দেশাচারের অত্যাচার থেকে অংশত মুক্ত যে-পরিবেশে কৈলাসবাসিনী দেবী অথবা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লালিত হয়েছিলেন, কৃষ্ণভাবিনী দাসের পরিবেশ তেমন ছিলো না। তিনি জন্মেছিলেন আধুনিকতার হাওয়া-লাগা কলকাতা থেকে অনেক দূরে মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে - চোয়ায়।[১] তাঁর পিতৃপরিবার ছিলো নিতান্তই একটি ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবার। তাঁর জন্ম ১৮৬৪ সালে বলে উল্লিখিত হয়েছে। (সত্যিকার বয়স হয়তো আর-একটু বেশি। কারণ, তিনি প্রথমবার গর্ভবতী হন ১৮৭৬ সালে। বারো বছর বয়সে গর্ভবতী হওয়া সম্ভব, কিন্তু খানিকটা অস্বাভাবিক।) আগেই লক্ষ করেছি, গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে কলকাতার মতো নগরকেন্দ্রে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মনোভাব খানিকটা নরম হতে শুরু করলেও, সেকালের গ্রামে কেবল যে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না, তা নয়; স্ত্রীশিক্ষার ধারণা ছিলো রীতিমতো লোকাচারবিরোধী।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, সৌভাগ্যক্রমে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে তাঁর হাতে-খড়ি হয়েছিলো। এর কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি ছিলেন শিক্ষিত পিতার আদুরে কন্যা।

পিতার একমাত্র সন্তান হিশেবে অথবা শিক্ষিত এবং ব্যতিক্রমধর্মী পিতার সন্তান হিশেবে দ্রবময়ী দেবীর (১৮৩৭-?) মতো কোনো কোনো মহিলা সে যুগে খানিকটা বাড়তি সুযোগসুবিধা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী সেই শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। তবে পিতৃগৃহে তাঁর লেখাপড়া সামান্যই হয়েছিলো। তিনি সত্যিকার লেখাপড়ার সুযোগ পান কৈলাসবাসিনী দেবী, নিস্তারিণী দেবী (১৮৪০-৬০), কুমুদিনী (১৮৪০?-১৮৬৪)[২], ব্রহ্মময়ী (১৮৪৫-৭৬), মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬), রাজকুমারী দেবী (১৮৫০-৭৬) অথবা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো—বিবাহসূত্রে। মাত্র ন বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। এবং স্বামীর আগ্রহেই তিনি লেখাপড়া শিখতে থাকেন। স্কুল কলেজে না গেলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি এতোটা লেখাপড়া শিখেছিলেন যাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তাঁর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৬ সালে বিএ পাস করার পর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনি বিলেতে যান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নেবার উদ্দেশ্যে। পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন, কিন্তু নতুন আইনে তাঁর বয়স বেশি বলে বিবেচিত হয়। ফলে তিনি কাঙ্ক্ষিত আইসিএস পদ লাভ করতে পারেননি। জ্ঞানের প্রতি, বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার প্রতি, তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিলো। ভারতবর্ষীয় অনেকগুলো ভাষা ছাড়াও, তিনি ইউরোপীয় ভাষা গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা ফারসিতে দক্ষতা অর্জন করেন। সিভিল সার্ভিস না-পাওয়ার পর তিনি বহু বছর লন্ডনে বাস করেন। এ সময়ে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের কাজ আরম্ভ করেন। তারপর ১৮৯০ অথবা ৯১ সালে তিনি দেশে ফিরে এসে কলকাতার সেঞ্চুরি কলেজসহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এবং ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস কলকাতা হাই কোর্টের উকিল এবং বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস নাট্যকার এবং নাট্যপ্রযোজক হিশেবে ১৮৭০-এর দশকে দেশাত্মবোধক নাটক লিখে এবং প্রযোজনা করে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন; এমন কি, খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করেই তিনি সরকারের রোষে পতিত এবং দণ্ডিত হন। এবং এই অভিনয়ের কথা মনে রেখে সরকার শেষ পর্যন্ত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। কেবল নাটক লিখে অথবা তার অভিনয় দিয়ে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ১৮৬৯ সালে এক বিধবাকে বিবাহ করে পরিজন এবং পরিচিতদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীনাথ দাস বিদ্যাসাগরের বন্ধু হলেও, অথবা অন্যদের

বিধবাবিবাহে সমর্থন জানালেও, নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রই এক বিধবাকে বিবাহ করবে, এতোটা আশঙ্কা করতে পারেননি। পারলে তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন জানাতেন কিনা, সন্দেহ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা কেশবচন্দ্র সেনসহ সেকালের সংস্কারকদের মধ্যে এ ধরনের স্ববিরোধ অবশ্য মোটেই অসাধারণ ছিলো না।

১৮৭৬ সালে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হবার অল্পকাল পরেই উপেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেতে যান। এবং বেশ অর্থকষ্টের মধ্যে সেখানে বারো বছর বাস করেন। অর্থকষ্টের ফলে তিনি লিভারপুলে বিপদে পড়েছিলেন। সম্ভবত বিলেত গমনের ফলেই তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল জীবনে কেবল সীমিত পরিমাণে সাফল্য আসে। তাঁর মেজভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস উচ্চশিক্ষিত এবং আইনজীবী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিলো বলে শোনা যায়। দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, তাঁর প্রকাশিত *সময়* পত্রিকা তাঁর প্রগতিশীল মনের স্বাক্ষর বহন করে।

এ রকমের শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে হয় বলেই হয়তো কৃষ্ণভাবিনীর জীবনধারা এবং সামাজিক মনোভাব ব্যাপকভাবে পাল্টে যাবার সুযোগ পেয়েছিলো। তা ছাড়া, ১৮৭০-এর দশকের শেষ ভাগে বিলেতে থাকার সময়ে স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর স্বামীর মনে এ বিষয়ে যে উদার মনোভাব দেখা দিয়েছিলো, কৃষ্ণভাবিনী তার দ্বারা সরাসরি উপকৃত হন। দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রার আগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনি স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আত্মীয়দের অনুমতি চান। তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্ম হিশেবে, মনোমোহন ঘোষ ও কৃষ্ণধন ঘোষ ব্রাহ্ম প্রভাবিত হিন্দু হিশেবে অথবা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হিন্দু হিশেবে যে-কাজটা অল্প চেষ্টাতেই করতে সমর্থ হয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা করা অতো সহজ ছিলো না। কারণ রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের সদস্য হিশেবে কালাপানি পার হওয়া পুরুষদের জন্যেই নিষিদ্ধ এবং ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য হতো, মেয়েদের তো কথাই নেই।

বস্তুত, লোকাচার অগ্রাহ্য করে বিলেত যাবার দরুন, দেবেন্দ্রনাথের পরিবার নাকি জাতিচ্যুত হয়েছিলো এবং সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্যে তাঁর পিতাকে নাকি অন্তত বাইরে দেখাতে হয়েছিলো যে, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। এই বিরোধিতার মুখে আত্মীয়দের অনুমতি ছাড়াই দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে বিলেত যাবার সিদ্ধান্ত নেন। যাবার সময়ে কৃষ্ণভাবিনী তাঁর ছ বছরের সন্তানকে শাশুড়ির কাছে রেখে যান। এ থেকে আমার মনে হয়, পুত্রকে ত্যাজ্য করার অথবা কৃষ্ণভাবিনীকে বিলেত যাবার অনুমতি না দেবার বিষয়টা ছিলো লোক-দেখানো। সে যাই হোক, লোকাচার অমান্য করে কৃষ্ণভাবিনী যেতে পারার বড়ো একটা কারণ হলো—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্তের স্ত্রী এবং কন্যারা, রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমাঙ্গিনী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লোকাচার ভাঙার প্রাথমিক কঠোর দায়িত্ব আগেই পালন করেছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী দাস স্বামীর

সঙ্গে বিলেতের পথে বোম্বাই যাত্রা করেন ১৮৮২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ২০ অক্টোবর তাঁরা ইটালি, সুইৎজারল্যান্ড এবং ফ্রান্স হয়ে লন্ডনে পৌঁছান।[৩] তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৮৮৯ অথবা ৯০ সালে।

দুই

বাল্যকাল থেকেই তাঁর অন্তঃপুরের বাইরের জগৎ দেখার প্রবল আগ্রহ ছিলো। এমন কি, স্বামী আইসিএস পরীক্ষা দিতে বিলেত যাবার পর, সে দেশে যাবার জন্যে তাঁর মনেও দারুণ আগ্রহ জন্মে। ইংল্যান্ড যাবার এবং সেখানে বাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যে-বইটি লেখেন, তার ভূমিকায় খাঁচার বাইরে যাবার আগ্রহ তাঁর কী প্রবল ছিলো, তা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের মত একটি বাড়িতে বদ্ধ ছিলাম; দেশের, পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলাত যাইতেছেন কিম্বা কেহ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন নাচিয়া উঠিত। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার নূতন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না; সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম।[৪]

স্বামী ইংল্যান্ডে থাকায় তিনি ছ বছর ধরে তাঁর জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলেন। এ সময়ে বিলেত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছিলো বলে অনুমান করাই সঙ্গত। তাঁর স্বামীও হয়তো তাঁকে বিলেতে নিয়ে যাওয়ার আশা দিয়েছিলেন। ফলে তিনি বিলেতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। বাইরের জগৎকে দেখার জন্যে তাঁর আগ্রহ কতোটা আন্তরিক ছিলো, তা বোঝা যায় তাঁর লেখা থেকে।

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,
যাইব যে দেশে বসতি উহার।...
যাইব তথায় স্বাধীনতাদেবী,
বিরাজে যেথায় প্রতি ঘরে ঘরে ...[৫]

বিলেতে গিয়ে তিনি সেখানে কেবল স্বাধীনতার বসতি দেখেননি, দেখেছিলেন সমাজে নারীদের উন্নত অবস্থা ও মর্যাদা। সেখানে বিদ্যার যে-ভোজ চলছে, তাতে তাঁর নিজের দেশের পুত্ররা অংশ নিতে পারেন, অথচ কন্যারা পারেন না—এটাকে তিনি সুবিচার হিশেবে মেনে নিতে পারেননি।

কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে,
যায় মা! ইংলণ্ডে ছাড়ি প্রিয়জনে,
কত জ্ঞানরত্নে নিজ নিজ মন;
মণ্ডিত করিয়া পুন আসে ফিরে।
কেন মোরা তবে হয়ে তব সুতা,
পারি না জননি! সে দেশে যাইতে,
বিদ্যাজ্ঞান ধনে হৃদয় ভূষিতে,
দেখিয়া স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা।
মোরা হইয়া মানব,
রয়েছি পিঞ্জরে চক্ষুহীনা সব,
করিতে পারি না কোন উপকার
তাই বহু কষ্টে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে
হয়েছি বাহির জ্ঞানচক্ষু তরে,...৬

কৃষ্ণভাবিনী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করতে বিলেতে যাননি। কিন্তু সেখানে গিয়ে সমাজ ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে তাঁর মনে প্রবল বাসনা ছিলো। তিনি উপরের কবিতার শেষাংশে লিখেছেন যে, তিনি নিজের চোখে দেখতে চান কেন ব্রিটেন সবার কাছে এতো পূজ্য এবং কিভাবে অতো ছোটো দ্বীপ হয়েও ব্রিটেন জগতের রাজা।

দেখি ব্রিটেনের ধর্মনীতিচয়,
লিখিব হৃদয়ে প্রতি স্তরে স্তরে;
করিব যতন শিখিবার তরে
পারি যদি, ...

তাঁর এই আশা বিফলে যায়নি। তিনি কয়েক বছর ব্রিটেনে থেকে দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন সে দেশের শিক্ষা, সভ্যতা এবং সমাজ দিয়ে।

তাঁর গ্রন্থে প্রথমেই তিনি অন্যান্য ভ্রমণকারীর মতো লন্ডননগরী কতো বড়ো এবং কী সুন্দর তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট এবং পাতালরেলসহ যানবাহনের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এসব ছাড়া তিনি এমন কতোগুলো জিনিশের বর্ণনা দিয়েছেন, সাধারণ ভ্রমণকারীদের রচনায় যা লক্ষ করা যায় না। যেমন পার্লামেন্টের নির্বাচন-ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের গ্রামের জীবন, ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ইত্যাদি। এমন কি, তখন যেসব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতো, তারও পরিচয় দিয়েছেন। কারা এসব পত্রিকা পড়েন এবং কেন পড়েন, সে কথা লিখতেও ভুলে যাননি। রাস্তায় ফেরিওয়ালারা কী কী বিক্রি করেন, তারও সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন।

ইংরেজদের চরিত্র তিনি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন। তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায় বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় তিনি যেসব

মন্তব্য করেছেন, তা থেকে। এসব মন্তব্যের মধ্যে ইংরেজদের প্রশংসা যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁদের নিন্দা। বলা বাহুল্য, এই ভালোমন্দ বিচার তিনি করেছিলেন, তিনি যে-শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সেই মানদণ্ড দিয়ে। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের প্রশংসা করেছিলেন।

> ইংরাজদের দেখিলেই বলিষ্ঠ, সাহসী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়।... কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই যেমন উপার্জ্জন করে, ... কার্য্যক্ষমতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তেজ, সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ থাকাতেই এই জাতির এত সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কর্ম্ম ইংরাজজীবনের সঙ্গীর মত ... ইংরাজরা যেমন স্বার্থপর, সেই রূপ আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা করিতে জানে। ... এই জাতির মধ্যে চমৎকার কর্ত্তব্যকর্ম্মের জ্ঞান দেখিতে পাই। ... ইংরাজরা অতিশয় বিদেশভ্রমণ প্রিয়।...[৭]

ইংরেজদের চরিত্রের অনেক কিছুই তাঁর আদৌ ভালো লাগেনি। তিনি সেসবের তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

> টাকা ইংরাজদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ... হিন্দুদের মত ইংরাজদের জাতিভেদ নাই, কিন্তু এখানে ভয়ানক শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই। ... ইংরাজদের অন্তঃকরণে স্নেহ, মমতা, বিনয় ও দয়াদাক্ষিণ্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ... অধিক ব্যয় করে, আর মদ্যপানে ইংরাজরা অদ্বিতীয়। ... এ জাতির মধ্যে অনেক ভণ্ড দেখিতে পাই। ... ইহাদের ভদ্র ব্যবহার অনেক সময়ে কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। ... কোন ভিন্নকৃতি [অর্থাৎ বিদেশী] লোক দেখিলে ইহারা তাহাকে জন্তু মনে করিয়া চাহিয়া থাকে ... ইংরাজরা মুখ বুজিয়া থাকিয়া কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না।[৮]

তাঁর পর্যবেক্ষণের মধ্যে যা সবচেয়ে লক্ষ করার বিষয়, তা হলো : তাঁর সমাজসচেতনতা। সেই কালেই তিনি তাঁর শ্রেণীসচেতনতার পরিচয় রেখেছিলেন। সে জন্যে ইংরেজ-সমাজে জাতিভেদ না-থাকলেও শ্রেণীভেদ যে তার চেয়েও গুরুতর সমস্যা, তা লক্ষ করেছিলেন।

একজন নারী হিশেবে তিনি ইংরেজ নারীদের দেখেছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি কৌতূহল নিয়ে এবং তাঁদের তিনি বিচার করেছিলেন সূক্ষ্মভাবে। ইংল্যান্ডে যাবার পথে তিনি ইতালীয় এবং ফরাসি মহিলাদের দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতীয় নারীদের সঙ্গে য়োরোপীয় নারীদের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বারবার য়োরোপীয়দেরই উন্নততর বলে গণ্য করেন। তাঁদের ভালোমন্দ প্রতিটি জিনিশ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। তাঁর সেই পর্যবেক্ষণের কথাই তিনি বলেছেন উচ্ছ্বাসিতভাবে। নিজের দেশের অশিক্ষিত এবং সামাজিক ভূমিকাবর্জিত নারীদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি ইংরেজ নারীদের অনেক শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছিলেন। পরিবার এবং সমাজে ইংরেজ নারীদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে দেখেও তিনি তাঁদের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিলেন। তবে তিনি তাঁদের বিচার করতে গিয়ে দেশীয় মূল্যবোধ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, বলা বাহুল্য। প্রথমেই দেখা যাক, ইংরেজ-নারীদের কোন দিকগুলোর তিনি প্রশংসা করেছিলেন।

ইহারা অতিশয় কর্ম্মদক্ষ ও চতুর এবং অনেকে শিক্ষিত। এ দেশের পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও কখন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা দেখায় না। ... আমাদের দেশের মত এখানে 'বাহির' ও 'ভিতর' বাড়ী নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকদের চারিদিকে দেখাশুনা করিতে এবং বন্ধু অথবা অভ্যাগত লোক আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয়।[৯]

... আজকাল লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান শিক্ষা পাইতেছে। ... ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে;[১০]

... এ দেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী; কারণ একেবারে পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত না মিশিয়া অনেকে সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহারা পুরুষের মধ্যে থাকিয়া, পুরুষের সহিত সমভাবে বেড়াইয়া, ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্ম্মরত্নকে না হারান, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যোগ্য ...। ইহারা ... পাগলের মত হইয়া পুরুষকে স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া সর্ব্বদা প্রণয় ও সুখস্বপ্নের চিন্তা করে না।[১১]

সবচেয়ে ইংরেজ–নারীদের যে–জিনিশটার তিনি প্রশংসা করেছিলেন, তা হলো স্বামীর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা এবং স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক।

লোকে বিবাহ করে কেন? সকলেই... উত্তর দিবেন 'পৃথিবীতে জীবনের একজন সমসুখদুঃখভাগিনী, সহধর্ম্মিণী ও সহকারিণী পাইবার জন্য।' এ দেশীয় স্ত্রীরা যে স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী, সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। স্ত্রীপুরুষ সমভাবে সুখদুঃখ ভোগ করেন, এক সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং স্ত্রী অনেক সময়ে নানা কার্যে স্বামীর সাহায্য করেন। অনেক সময়ে স্বামী অপারগ হইলে স্ত্রী পরিশ্রম করিয়া স্বামীর ও সন্তানদের আহার জোগাইয়া থাকেন।....[১২] আমার মতে ইহারা বরং পুরুষদের যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গ। এখানে স্ত্রীলোক সচরাচর যেরূপ পুরুষের সহায়তা করে ও অনেক সময়ে পুরুষের কাজ করিয়া থাকে, এরূপ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। নারীদের উচিত কাজ ব্যতীত ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা দোকান চালায়, কেরানীগিরি করে, স্কুলে শিক্ষা দেয়, পুস্তক ও সংবাদপত্রে লেখে, সভা করিয়া বক্তৃতা দেয়...। দেশের স্ত্রীলোকেরা জাতির অর্দ্ধ ভাগ; তাহারা কেবল অতি যৎসামান্য কাজ করিয়া কিম্বা অলসভাবে থাকিয়া জীবন যাপিলে সমস্ত জাতির অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে।[১৩]

তিনি কেবল ইংরেজনারীদের প্রশংসাই করেননি, তাঁদের নিন্দাও করেছেন। তাঁরা যে রোগাপাতলা এবং প্রেমের মাধ্যমে বিয়ে করে—এটা তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁরা যে পোশাক–প্রিয়, সেটাও নয়।

অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কৃশাঙ্গী, এবং পুরুষদের ন্যায় কাজ ও পুরুষের সঙ্গে মিশামিশি করাতে ইহাদের শরীর পুরুষের মত অনেকটা লাবণ্যহীন। ... পোষাকের লালসা ইংরাজ মহিলাদের মনে একটা বিষম রিপুর মত হইয়াছে। ... ইংরাজ মহিলারা বিনয়বতী ও আতিথেয়ী নয়। ... ইহারা সময়ে সময়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরাজ মহিলারা জেলেদের মত বড় বড় স্থানে জাল পাতিয়া রাখে; মাছের মত পুরুষরা একবার জালে আসিয়া পড়িলে আর নিস্তার নাই।[১৪]

এবং সাত-আট বছর বিলেতপ্রবাস কৃষ্ণভাবিনীর জীবনে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এর ফলে তিনি বস্তুত এক ভিন্ন নারীতে পরিণত হন। তাঁর এই পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। একটি কৌতূহলোদ্দীপক অনুচ্ছেদে এই পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন :

> কথায় বলে যে ক্রীতদাস পর্য্যন্ত ইংলন্ডের মাটিতে পা দিলে তৎক্ষণাৎ স্বাধীন হইয়া যায়; আমি নিজেও দেখিতেছি যে যতদিন হইতে ইংলন্ডের স্বাধীন বায়ু সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। এ ভাব যে কি তাহা আমার দেশীয় ভাইভগিনীদের নিকট প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। ভারতবর্ষে যতদিন ছিলাম এ সকল কিছুই জানিতাম না, মনেও ভাবিতাম না যে মানুষের জীবনের এত রূপান্তর আছে। পুস্তকে নানা দেশের বিষয় পড়িতাম—এ দেশ স্বাধীন, ও দেশ পরাধীন, এ দেশের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার, ও দেশের রাজ্যব্যবস্থা নিয়মতন্ত্র—এরূপ কত পড়িতাম, এক রকম করিয়া কথার মানে বুঝিতাম, কিন্তু ঐ কথাগুলি যে কত ভাব প্রকাশ করিতেছে, কত গূঢ় বিষয় সূচনা করিতেছে, তাহা কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হইত না।... এখন দেখিতেছি যেমন অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত, তাহাকে রাত দিনের প্রভেদ যতই কেন বুঝাইয়া দাও না সে সকল জিনিস কাল দেখিবে, সেই রূপ আমিও এত দিন সকল লোককে পরাধীন দেখিতাম।[১৫]

নিজের সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনীর এই বিশ্লেষণ যথার্থ। যথার্থই লজ্জাকাতর, অন্তঃপুরের সংকুচিতা, অল্পশিক্ষিত নারী কৃষ্ণভাবিনী বিলেত যাবার অল্পকালের মধ্যেই ব্যাপক পরিবর্তিত একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করলে এই পরিবর্তিত মূল্যবোধ এবং মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষিত এবং পর্দানশিন হলেও, ইংল্যান্ডে যাবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করেন এবং জীবনযাত্রায়ও বৈদগ্ধ্য নিয়ে আসেন। সেখানে থাকার সময়েই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এবং তার মধ্য দিয়েই তাঁর এই পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিন

কৃষ্ণভাবিনীর প্রথম রচনা *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* ১৮৮৫ সালের অগস্ট মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নানা কারণেই এ গ্রন্থ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এমন বিস্তৃত ভ্রমণকাহিনী আর প্রকাশিত হয়নি, বিশেষ করে য়োরোপভ্রমণের। রবীন্দ্রনাথের *য়োরোপপ্রবাসীর পত্র* অবশ্য এর আগেই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো, কিন্তু গ্রন্থাকারে নয়। তার চেয়েও কৃতিত্বের কথা : কোনো বাঙালি মহিলা তখনো ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন বলে আমার জানা নেই।

কিন্তু যে-কারণে তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তা হলো : সেকালে ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে নারীমুক্তির আন্দোলন চলছিলো, এ গ্রন্থের মাধ্যমে

ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা

বঙ্গমহিলা-প্রণীত।

"বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

কলিকাতা।
শ্রীসত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী দ্বারা
প্রকাশিত।

PRINTED BY
J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,
119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD.

1885.

ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলার টাইটেল-পেইজ

তিনি তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দেন এবং বাঙালি মহিলাদের জন্যে একই ধরনের অগ্রগতির ওকালতি করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। মনে রাখা দরকার যে, তখনও ইংরেজ নারীরা অনেক ব্যাপারেই অধিকার–বঞ্চিত ছিলেন। তখন তাঁরা কেবল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন, কিন্তু অক্সফোর্ড–কেমব্রিজে পরীক্ষার অধিকার তাঁরা পেয়েছিলেন আরও চল্লিশ বছর পরে।[১৬] স্বামীর সম্পত্তিতেও তাঁদের কোনো অধিকার ছিলো না। আর ভোট দেওয়ার অধিকার তো ছিলোই না। বিবাহভঙ্গ করার অধিকারও ছিলো না। চাকরিতে পুরুষদের তুলনায় একই কাজের জন্যে তাঁরা বেতন পেতেন অনেক কম।

তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে আরও একটা অসাধারণ জিনিশ হলো : এতে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবিনীকে ক্বচিৎ দেখা যায়। সর্বত্রই বরং লেখিকার কৌতূহলী দৃষ্টির মাধ্যমে ইংল্যান্ডের জীবন এবং সমাজ চোখে পড়ে। তিনি ইংরেজদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিচয়ের দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন, নিজের কথা কমই বলেছেন। ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা, বিবাহ এবং গার্হস্থ্যজীবন, ধর্ম ও উৎসব, মহারানি ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর সংসার, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদিরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন উৎসাহের সঙ্গে। সেকাল এবং একালের বাংলা ভ্রমণকাহিনীতে বেশি যা থাকে, তা হলো : আবার পথের বিবরণ, যানবাহন, রাস্তাঘাট, খানাপিনা, কার সঙ্গে আলাপপরিচয় হলো, কী কথাবার্তা হলো, দেশটা দেখতে কেমন, দেখে কেমন লাগলো ইত্যাদি। আর থাকে রাশ রাশ লোকের নাম। এতে লেখককে যতোটা দেখা যায়, অন্য কিছুই অতোটা দেখা যায় না। কৃষ্ণভাবিনীর ভ্রমণকাহিনী প্রায় তার উল্টে।

ইংরেজ মহিলাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদির আদর্শ দেখিয়ে তিনি বাঙালি মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে ওকালতি করেন। তিনি বলেন, পর্দা ভেঙে ফেললে অথবা মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে মিশতে দিলেও মহিলারা অসতী হবেন না। নারীদের স্বাধীনতা প্রদানের জন্যে তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন :

> ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দিতে ভয় পান। কারণ স্ত্রীরা বহুকাল অবধি পরাধীন থাকাতে তাহাদের মন এত দুর্বল এবং তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বাধীন হইলে নিজেদের শাসন করিতে পারেন না। অবশ্য ইহা অনেকটা সত্য; কেহ অনেক বৎসর অধীন অবস্থায় থাকিয়া সহসা স্বাধীন হইলে নিজেদের শাসন করিতে অথবা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে সকলকেই শিখিতে হয়, শিশু একবারে চলিতে শিখে না। তাহাকে অনেকবার দেখাইয়া দিতে হয় ও ধরিতে হয় এবং সে অনেকবার পড়িয়া যায়। আমাদের স্ত্রীদের বর্তমান অবস্থা এইরূপ। তাহারা এত হীন এবং দুর্বল অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে যে পুরুষেরা তাহাদের আদর করিয়া ধরিয়া না তুলিলে, তাহাদের অবস্থার কখনই উন্নতি হইবে না। এবং অল্প অল্প করিয়া

তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে প্রবর্তিত না করিলে তাহারা কখনই নিজেদের শাসন করিতে শিখিবে না বা স্বাধীন হইয়া বেড়াইতে পারিবে না।[১৭]

স্ত্রীলোককে পুরুষের সহযোগিনী, সহকর্মিণী ভাবার মতো মনোভাব তখনো বাঙালি সমাজে জন্ম নেয়নি। সে জন্যেই কৃষ্ণভাবিনীর এই বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যকে বাঙালিদের চোখে অভিনব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি, সেকালের ইঙ্গ–বঙ্গ সমাজের চোখেও এটা কম অভিনব ছিলো না। *Calcutta Review পত্রিকায়* এ গ্রন্থের যে সমালোচনা করা হয়েছিলো, তা থেকে সেকালের পুরুষদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট করেই চোখে পড়ে।[১৮]

পরবর্তী কালে কৃষ্ণভাবিনী যেসব রচনা প্রকাশ করেন, তার মধ্যে কোথাও কোথাও মহিলাদের কাজ করার আদর্শকে তিনি খুব প্রশংসা করেন। সেকালের নারীদের কর্ম–ভূমিকা সম্পর্কে বাঙালি নারী এবং পুরুষের যে–সার্বজনিক আদর্শ ছিলো, তা থেকে তাঁর চিন্তাধারা ছিলো অনেকাংশেই আলাদা। পুরুষদের সমান মর্যাদা এবং অধিকার পেতে চাইলে মেয়েদেরও সমান এবং একই ধরনের কাজ করতে হবে এবং আর্থিক কাজকর্মের উপযোগী হয়ে উঠতে হবে—এ তিনি সেকালেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মেয়েরা যে 'বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; বরং অনেক অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বিদ্যায় পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা' অর্জন করতে পারে—এ তাঁর মতে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের শ্রেষ্ঠতারই নিদর্শন।[১৯] নারীদের কর্ম–ভূমিকা এবং কর্মদক্ষতা সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনীর এই মনোভাব সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই প্রাগ্রসর বলে বিবেচিত হতে পারে।

ইংরেজ মহিলাদের 'বিলাসিতা এবং জাঁকজমকের', পোশাকের এবং 'স্বামী অন্বেষণে পাগল হইয়া' বেড়ানোর তিনি নিন্দা করেন বটে, কিন্তু তাঁর মতে, ইংরেজ মহিলাদের দৃষ্টান্তকে আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করলে দেশীয় মহিলাদের যথার্থ উন্নতি হতে পারে। ইংরেজ মহিলাদের উন্নত জীবন এবং স্বাধীনতা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণভাবিনী বাঙালি নারীদের এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন 'পায়ের শিকল ছিঁড়ে', 'পিঞ্জর কেটে' অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁরা 'অকেজ' নন এবং তাঁরা 'পশুর মতন' জীবনযাপন করতে তৈরি নন। উচ্ছ্বসিত লেখিকা এ আহ্বান জানান কবিতার ভাষায়।

আয় বোন! সবে পিঞ্জর কাটিয়ে,
প্রিয় ভ্রাতাগণে অথবা বুঝায়ে
দেখে যাও হেথা স্বাধীন জীবনে
    জর্মন, ফরাসী, ব্রিটন ললনে,
প্রফুল্লতাময়, সতেজ হৃদয়,
    হীন অশ্রুজল ধরে না নয়নে।
দ্যাখ, পুরুষেরা স্ত্রীলোক বলিয়ে,
    নাহি করে হেথা 'অকেজ' ভাবিয়ে;

পশুর মতন নারীর জীবন,
‘অন্দর পিঞ্জরে’ রাখে না পুরিয়ে
*　　*　　*
আর কত কাল গৃহ কারাগারে
থাকিবে রে সবে বন্দীর মতন,
না জানি কি গেল, কোথায় কি হলো
জগতে অথবা ভারত মাঝারে।
*　　*　　*
থাকে না হৃষিত এদের হৃদয়
সীমাবদ্ধ গৃহে, কেমনে বা রয়?
উন্নত জীবনে, স্বাধীনতা বিনে,
পারে না মানুষ জীবিতে ধরায়।
*　　*　　*
গৃহকার্য বিনা কিছুই দেখ না ...
বারেক যদি রে পাও এ আস্বাদ
অধীন জীবনে স্বাধীনতা সুখ,
থাকিতে না চাবে আর কারাগৃহে
ঢাকিবে না আর ঘোমটাতে মুখ...[২০]

কৃষ্ণভাবিনীর পদ্য যে উন্নত মানের নয়, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু স্বাধীনতার কথায় তিনি যে উচ্ছ্বসিত এবং স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অনুরাগ যে একান্তই আন্তরিক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আরও একটি প্রসঙ্গে তিনি এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন—ইংরেজদের দাম্পত্যজীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে। ‘বাস্তবিক ইংরাজদের দাম্পত্যজীবন আমাদের নিকট অতি সুখময় ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সুখের সময় দুজনেই সমানরূপে সুখভোগ করে; এবং দুঃখের সময় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে ক্লেশ সহ্য করে।’[২১] প্রতিতুলনা হিশেবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন যে, বাঙালি নারীদের জীবনে যে অশান্তি এবং দুর্ভোগ তার সূচনা বিবাহ থেকে এবং তার বিস্তার বিবাহ-পরবর্তী কালে।

> আমাদের দেশে দম্পতির জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধা স্ত্রী, স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ীর গৃহিণীরা ভয় পান।[২২]

ইংরেজদের বিবাহ এবং দাম্পত্যজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, সে সমাজে পুরুষ এবং নারী নিজের ইচ্ছা এবং পছন্দ ছাড়া বিয়ে করেন না।[২৩] তিনি দাবি করেন, এর ফলে অনেক সুফল ফলে। যেমন ব্যভিচার সেখানে খুব

বিরল। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে ব্যভিচার খুব বিরল ছিলো, এ কথা আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী যা বলতে চেয়েছেন, তা হলো : পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ হতো বলে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অনেক বেশি প্রেম এবং বোঝাপড়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটা স্ববিরোধিতা চোখে না-পড়ে পারে না। সে হলো তিনি পরস্পরের সম্মতিতে বিয়ে করার প্রশংসা করলেও বিবাহ-পূর্ব প্রণয়ের নিন্দা করেছেন।

স্বদেশে তিনি লক্ষ করেছিলেন, ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা তাঁদের অশিক্ষিত বৈদগ্ধ্যবর্জিত স্ত্রীদের পছন্দ করেন না। এবং তার ফলস্বরূপ তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ-অতিরিক্ত উপায়ে যৌনবাসনা চরিতার্থ করেন। প্রতিতুলনা হিশেবে ইংল্যান্ডের পুরুষসমাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পুরুষেরা পর্যন্ত ব্যভিচার করাকে ভয়ানক পাপ বলিয়া ভাবে।' এ বাক্যে *পুরুষেরা পর্যন্ত* কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। কিন্তু এ কথায় অতিরঞ্জন থাকলেও, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক যে সে দেশে প্রণয় এবং অংশত সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এ তিনি একাধিক স্থানে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন।

> কোনো কর্ম্ম করিতে হইলে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্বামী স্ত্রীর পরামর্শ লন ও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে প্রভু না ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয়সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান। এ জন্য ইংরাজ পুরুষেরা গৃহে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুখ পান বলিয়া অন্য কোন বাহিরের সুখের নিমিত্ত লালায়িত হন না। এক কথায় ইংলণ্ডীয় স্ত্রী স্বামীর ডান হাত।[২৪]

এই অবস্থার সঙ্গে স্বদেশের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের তুলনা করে তিনি বলেন,

> আমাদের দেশে দম্পতির জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধা স্ত্রী, স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর বৈঠকখানায় বসিয়া হুঁকা টানেন, তাস পেটেন কিম্বা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান; কিন্তু গৃহিণীরা সেই বাড়ির ভিতর বসিয়া এক সংসার লইয়াই ব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন, তিনি কি প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবেন তাহার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামী তাহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করেন না এবং তিনিও পতির প্রতি যথার্থ ব্যবহার করিতে পান না বা জানেন না। স্ত্রীপুরুষের যথার্থ কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের অতি অল্প লোকই বুঝেন। ... ভারতললনাদের সুদৃঢ় সতীত্ব বন্ধন থাকিলেও ঐ সকল নানা কারণে দম্পতিরা পরস্পরের সুখের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না।[২৫]

ইংরেজ সমাজে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া, পুত্রকন্যারা যে পিতামাতার ঘনিষ্ঠ এবং ভাইবোনদের সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ, এও তাঁকে মুগ্ধ করে। মোট কথা, স্বদেশে তিনি যার অভাব বোধ করেন, তার সব কিছু দিয়েই তিনি ইংল্যান্ডের সমাজ কল্পনা করেন। সত্যি সত্যি ইংল্যান্ডের সমাজে এর সব কিছু ছিলো কিনা, তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ

নয়। বরং এটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেকালের একজন বাঙালি নারী নতুন দৃষ্টিতে জগৎ এবং জীবনকে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে নিজের সমাজের ত্রুটিগুলো খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলেন।

আবাল্যপোষিত কোনো কোনো সংস্কার যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডিত করেনি, তা নয়। ইংরেজ মহিলাদের 'নির্লজ্জ' পোশাক সম্পর্কে তিনি যেমন খুব স্পর্শকাতর। সতীত্ব সম্পর্কেও তিনি অতিমাত্রায় সজাগ। মেয়েদের 'পুরুষালি' ভাব তাঁকে খুবই পীড়িত করে। তিনি মনে করেন, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করায়, পুরুষের কাজ করায় ইংরেজ নারীরা পুরুষের মতো অনেকটা লাবণ্যহীন। এমন কি, সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ধরনের ছিলো বলে তিনি ইংরেজ মহিলাদের কৃশাঙ্গী চেহারাকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি। এবং এই কৃশাঙ্গ হবার কারণ তিনি মনে করেছেন, মেয়েদের পুরুষালি ভূমিকা।[২৬]

নারীদের সম্পর্কেই কৃষ্ণভাবিনী সমধিক উদ্বিগ্ন এবং মনোযোগী ছিলেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে তিনি জাতীয়তাবোধের যে সচেতন স্বাক্ষর রাখেন, তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রন্থের শেষে তিনি এই বলে আক্ষেপ করেন যে, এক কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা যখন উন্নত ছিলেন, ইংলণ্ডবাসীরা তখন ছিলেন অনুন্নত। তথাকথিত গৌরবারোপিত অতীত এবং হিন্দুত্ব নিয়ে এ ধরনের গর্ব করা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছিলো। আর ১৮৮০–র দশকে এই জনপ্রিয়তা রীতিমতো হিন্দু পুনর্জাগরণের চেহারা নিয়েছিলো। সুতরাং এ ধরনের মন্তব্য করা তাঁর মতো সমাজ সচেতন ব্যক্তি জন্যে মোটেই অসাধারণ ছিলো না। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী শুধু গর্ব করেননি। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, 'এখন পুরাকালের কথা লইয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বর করার অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করা আমাদের সর্বতোভাবে বিধেয়।' 'স্বাধীন হইব, স্বাধীন হইব' বলে না–নেচে, তাঁর মতে, 'সমস্ত কুসংস্কার ও অনিষ্টকারী পুরাতন রীতির প্রতি আসক্তি ত্যাজিয়া' যাতে ইংরেজদের সদ্ গুণগুলি লাভ করিতে পারি' তার চেষ্টা করা উচিত। বাঙালিরা ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যবনরাই ভারতবর্ষের সকল দুর্ভাগ্যের মূল—সমকালের এই দুই জনপ্রিয় মনোভাবও তাঁর জাতীয়তাবোধকে প্রভাবিত করেছিলো।[২৭]

ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা যখন প্রকাশিত হয়, লেখিকার বয়স তখন ২৫ বছরেরও কম। তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি স্বদেশে লেখাপড়া তেমন শেখেননি। তা সত্ত্বেও, ইংল্যান্ড এবং সে দেশের সমাজ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং মন্তব্যকে পরিণত বলে মনে হয়। ভূমিকায় তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে, এ গ্রন্থ রচনায় তিনি বহু ইংরেজি গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর স্বামীও তাঁকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সাহায্য তিনি যেখান থেকেই নিয়ে থাকুন না কেন, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* সত্যি সত্যি খুব তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। এবং এ বইয়ের জন্যে সেকালের একজন অর্ধশিক্ষিত বঙ্গমহিলা কেন, একজন বাঙালি পণ্ডিতও শ্লাঘা বোধ করতে পারতেন।

এদেশে শীতকালে অধিক কষ্টভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালের সুখ ও আরামে লোকে সে সকল ক্লেশ ভুলিয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শিক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা।

কোন দেশের শিক্ষার অবস্থা জানিলে উহার সভ্যতা ও উন্নতির অবস্থা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। দেশের লোকেরা কতদূর উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে, সর্ব্বসাধারণে কত দূর শিক্ষা লাভ করিয়াছে আর সামান্য ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে কতগুলি লেখা পড়া করিতে পারে, এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কতদূর কার্য্যে পরিণত করে—এই বিষয়গুলি যথার্থ রূপে জানিলে, সে দেশ কত সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী তাহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। দেখ, চীনদেশ শিক্ষা সম্বন্ধে যদিও এখন আসিয়ার অন্যান্য দেশের উপর দাঁড়াইয়াছে, যদিও ঐ দেশের অতি সামান্য লোকে পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং সাধারণ পরীক্ষা সকল অতিশয় কঠিন, তথাপি সভ্যতা সম্বন্ধে চীন ইউরোপের কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে চীনের উচ্চশিক্ষার অবস্থা ইউরোপীয় দেশের মত উত্তম নয় এবং কিছু কিছু বিজ্ঞান জানিলেও চীনেরা তাহাদের জ্ঞানকে তত কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। আবার দেখ, জর্ম্মণেরা অতি সুশিক্ষিত, তথাকার সামান্য লোকে দুই

চার

১৮৮৫ সালে তাঁর এ বই প্রকাশের পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষ্ণভাবিনীর আর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি। তখন তিনি প্রধানত লন্ডনেই ছিলেন। কোনো রচনা প্রকাশিত না–হলেও, অনুমান করা যেতে পারে যে, ততোদিনে তিনি আরও অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। স্বদেশে ফিরে আসার প্রাক্কালে অথবা ফেরার ঠিক পরে ১৮৯০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা *ভারতী ও বালক* পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' নামক প্রবন্ধে তিনি নিজেই বলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায়* ইংল্যান্ড সম্পর্কে তাঁর অনেক মতামতই প্রকাশিত হয়েছে, যা অপরিণত। তবে পরিণতি দেখা দিলেও, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে না। অন্তত মূল্যবোধ এবং মনোভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। 'বিলাত–ভেল্কি' নামক প্রবন্ধে বিলিতি সবকিছুকে ভালো বলার মনোভাবকে তিনি লজ্জাজনক বলে অভিহিত করলেও, তাঁর ইংরেজপ্রীতি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্নই ছিলো (*সাহিত্য*, কার্তিক–চৈত্র, ১২৯৭)। যখনই স্বদেশের কোনো ধর্মীয়–সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কুসংস্কার অথবা ক্ষুদ্রতার সমালোচনা করেছেন, তখনই প্রতিতুলনা হিশেবে তিনি পাশ্চাত্যকে হাজির করেছেন। তবে এসব রচনায় তাঁর বক্তব্য আগের তুলনায় স্পষ্টতর এবং তীক্ষ্ণতর। তাঁর ভাষাও ততো দিনে আরও উন্নত হয়েছে। *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায়* তিনি ইংল্যান্ডের কথা বঙ্গদেশীয় পাঠকদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাসমূহে তিনি একটি কল্পিত প্রতিপক্ষ সামনে খাড়া করে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাঁর কতোগুলো মূল্যবোধ পাঠকদের কাছে প্রচার করার প্রয়াস পান। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির তেমন না হলেও, তাঁর বাচনভঙ্গির এবং অংশত উদ্দেশ্যের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।

কৃষ্ণভাবিনীর প্রধান লক্ষ্যই ছিলো স্বদেশের নারীদের হীনদশা থেকে টেনে তোলা। ইংল্যান্ডে তিনি এ বিষয়ে যে ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা লক্ষ করেছিলেন, তাকেই তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে স্বসমাজে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায়* তিনি সংক্ষেপে মেরি কার্পেন্টার (১৮০৭–৭৭), ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল (১৮২০–১৯১০), লেডি বেকার এবং লেডি ব্যাসির সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের একাধিক প্রবন্ধে তিনি সরাসরি ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা বলেন। 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, সংসারে স্ত্রীলোকের স্থান এবং স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেছে বলে মনে করা হতো। কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ে 'সভ্য জগতে এক আলোড়ন উঠিয়াছে।' ভারতবর্ষেও কয়েক দশক থেকে নারীমুক্তিবিষয়ক যে সচেতনতার উদ্রেক হয়, তাঁর মতে, তাও 'সভ্যজগতের এই আন্দোলনের

প্রভাবজাত।' 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি' এবং 'সংসারে নারীর ক্ষমতা' প্রবন্ধেও তিনি ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন।

'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি' প্রবন্ধে তিনি ইংল্যান্ডে স্ত্রীশিক্ষার উন্মেষ ও বিকাশের ধারাকে কালানুক্রমিকভাবে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়কে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রানি অ্যানের কাল; তৃতীয় পর্যায়ে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রথম দিক এবং চতুর্থ পর্যায়ে তাঁর শাসনের শেষ দিক। তাঁর প্রদত্ত ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু এর মধ্যে তাঁর যে-ইতিহাস চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তা বেশ স্পষ্ট। সেই সঙ্গে এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনোভাবও স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। দুটি বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ জোর দেন। প্রথমটি হলো : ইংল্যান্ডে সাম্প্রতিক কালের নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার যে-বিকাশ ঘটেছে, তার পেছনে ছিলো সেখানকার শিক্ষিত নারীদের সমবেত আন্দোলন। আর দ্বিতীয়টি হলো : যদি তাঁরা স্বনির্ভর হতে পারেন, তবেই নারীদের শিক্ষা লাভ এবং অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

ইংল্যান্ডের নারী আন্দোলনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যে দুজন মহিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, তাঁরা হলেন মিসেস মিলিসেন্ট ফসেট (১৮৪৭–১৯২৯) এবং মিসেস অ্যানি বেসান্ট (১৮৪৭–১৯৩৩)। মিসেস ফসেট এবং অ্যানি বেসান্ট উভয়ই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরে মিসেস ফসেট বিখ্যাত হন নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের একজন প্রধান নেত্রী হিশেবে। সামগ্রিকভাবে নারীদের শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন অ্যানি বেসান্ট। তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় এই ভূমিকায় ছেদ পড়ে। এঁদের আন্দোলনের ফলে কেবল যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার দাবি স্বীকৃত হয়, তাই নয়; কৃষ্ণভাবিনীর মতে, মিসেস বেসান্টের মতো মহিলার তুমুল আন্দোলনের ফলে বিবাহিত নারীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং বিবাহ বিষয়ক আইনের যথেষ্ট সংশোধন হয়। লেখিকা আশা করেন, এঁদের আন্দোলনের মুখে ভোটাধিকারের দাবিও একদিন স্বীকৃত হবে। এঁদের আন্দোলনের মুখে তখনই মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলেও, কয়েক দশকের মধ্যে সত্যি সত্যি তাঁর আশাবাদ সফল হয়েছিলো। ইংরেজ মহিলারা সীমিত মাত্রায় ভোটাধিকার লাভ করেন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে।

কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর বক্তব্যের পেছনে যে মনোভাবটি ক্রিয়াশীল ছিলো, তা হলো আন্দোলনের মাধ্যমেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কান্না অথবা অনুনয় দিয়ে নয়। *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায়*ও এ মনোভাব চকিতের জন্যে প্রকাশিত। স্বদেশের নারীদের শোচনীয় দুর্গতি থেকে রক্ষা করার প্রশ্নে তিনি এক জায়গায় লেখেন,

> আজ যদি আমরা, যেমন ইংরাজ মহিলারা পার্লামেন্টের সভ্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা এবং গোলযোগ করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতাম; আজ যদি আমরা স্ত্রীলোকের

অবলা ও নম্র নাম বিসর্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গোপন না রাখিয়া, তাঁহাদের (*পুরুষদের*) সম্মুখে চীৎকার স্বরে কোলাহল করিতাম; তা হইলে হয়ত বঙ্গবাসীর কর্ণ আমাদের যন্ত্রণারবে আকৃষ্ট হইত।[২৮]

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এ মনোভাব নিতান্তই ব্যতিক্রমধর্মী। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র এবং যামিনী সেনের কথা বাদ দিচ্ছি— তাঁরা চিকিৎসক, লেখক নন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রাধারানি লাহিড়ী, কামিনী সেন, মানকুমারী বসু, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, সরলা দেবী প্রমুখ তখন কমবেশি নিয়মিত লিখতেন, এবং চন্দ্রমুখী বসু, কুমুদিনী খাস্তগির, সুরবালা প্রমুখ অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং সরলা দেবী রাজনীতিতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁরাও নারীমুক্তি সম্পর্কে সে সময়ে কোনো বলিষ্ঠ কথা উচ্চারণ করেননি। এঁদের মধ্যে কামিনী সেন এবং মানকুমারী বসু নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বেশ কয়েকটা রচনাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে প্রকাশিত মনোভাব মোটামুটি ঐতিহ্যিক। নারীদের দুর্দশা দেখে মানকুমারী একটি কবিতায় বলেছিলেন,

কাঁদ তোরা অভাগিনী! আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক ফোঁটা নয়নবারি,
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব।

এ মনোভাব আন্দোলন করে অধিকার আদায়ের মনোভাব নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাবো, অল্পকাল পরে মানকুমারীর এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। কিন্তু আর কেউ করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। কৃষ্ণভাবিনীও ইংল্যান্ডের নারীমুক্তি প্রসঙ্গে মানকুমারীর বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। রোকেয়ার মনোভাব ছিলো কৃষ্ণভাবিনীর মতো প্রতিবাদী। কিন্তু তিনিও আন্দোলন করার উপদেশ দেননি।

প্রসার যতো কমই হোক না কেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভদ্রলোক পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্তত নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছিলো। তবে শিক্ষিতদের মধ্যেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে মনোভাব বেশ তীব্রই ছিলো। ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*সহ বহু পত্রপত্রিকাই তার প্রমাণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের প্রসঙ্গে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* নারীদের পক্ষে গণিত শিক্ষা করা অনুচিত—এমন মন্তব্যও প্রকাশ করেছিলো।[২৯] এমন কি, কেশব সেন একটা পর্যায়ে প্রগতিশীল হলেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন।[৩০] আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মেয়েদের নারীসুলভ গুণ যে কী বিপুল মাত্রায় বিনষ্ট করে, শতাব্দীর শেষেও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোটা বই লিখে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।[৩১] রবীন্দ্রনাথও তাঁর কন্যাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেননি, সে কি শুধু কখনো কখনো মফস্বলে থাকার দরুন সুযোগের অভাবে[৩২], না এই বিশ্বাসেরই ফলে, তা বলা শক্ত।

কৃষ্ণভাবিনী নিজে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেননি; কিন্তু তিনি নিজে এবং স্বামীর সহায়তায় লেখাপড়া শিখে কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখের মতো সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন, নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত। তাঁর মতে, শিক্ষা লাভ করলে তবেই নারীদের ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে পারে। তবে সেকালের পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা-ব্যবস্থা যে নিতান্তই পুস্তকী এবং অকিঞ্চিৎকর এবং তা যে আত্মশক্তিকে পুরোপুরি বিকশিত করে না, এও তিনি অনুভব করেছিলেন। মেয়েদের জন্যে কী ধরনের শিক্ষা উপযোগী, তা নিয়ে দেশে ফেরার পর তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধই লিখেছিলেন। তার মধ্যে একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো বিতর্ক হয়েছিলো। এই বিতর্কের সূচনা হয় ১৮৯১ সালের আশ্বিন সংখ্যা *সাহিত্যে* প্রকাশিত কৃষ্ণভাবিনীর 'শিক্ষিত নারী' প্রবন্ধ নিয়ে। এ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, শিক্ষিতা নারীরা সংসারের দেখাশোনা করেন না বলে যে-অভিযোগ করা হয়, তা ঠিক নয়। মার্কিন ও ইংরেজ মহিলাদের দেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৩]

> লেখাপড়া শিখে মেয়েরা নারীসুলভ কোমল গুণাবলী হারিয়ে ফেলেন বলে অনেকে যে-অভিযোগ করেন, কৃষ্ণভাবিনী তাও অস্বীকার করেন। 'তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের সে সংস্কার একান্ত ভ্রমাত্মক। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষায় অত উন্নতি হইলেও, সেখানকার রমণীরা, সংসারের কাজে অমনোযোগী বা সন্তানপালনে অজ্ঞ নয়। বরং তাহারা অধিকতর নিয়মপূর্বক ও সুশৃঙ্খল গৃহকর্ম ও শিশুপালন করিয়া সংসারের সুখ বাড়ায় ও দেশের উন্নতি করে। ... স্ত্রীজাতি উচ্চশিক্ষা বলে নারীসুলভ সমস্ত কোমল গুণ না হারাইয়া, বরং তাহারা স্ত্রীজীবনের সমস্ত কাজ অধিকতর বুদ্ধি, চতুরতা ও শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারে। ... এ জগতের রক্ষণশীল লোকেরা এতদূর ক্ষুদ্রমনা যে, এইসব নানা সদুদাহরণ দেখিয়াও তাঁহাদের চোখ খুলে না...।'[৩৪]

কৃষ্ণভাবিনীর প্রবন্ধটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এমন কি, রবীন্দ্রনাথেরও। তাতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তিনি এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে যে-বক্তব্য রাখেন, তার রক্ষণশীলতা বিস্ময়ের কারণ হতে পারে। মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮৮৪ সালে একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব বোঝা যায় একটি প্রবন্ধ থেকে। এতে তিনি লেখেন,

> আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল একজামিন পাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ... মেয়েরা যে শিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি—কিন্তু মেয়েরা কেন পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না।... আয়ুক্ষয়কর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরব লাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোখে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করান ভাল বোধ হয় না।[৩৫]

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, ছ বছর পরে কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা পড়ে তা-ই নতুন করে প্রকাশ পায়। তিনি কৃষ্ণভাবিনীর প্রবন্ধটির সমালোচনা করেন *সাধনা* পত্রিকার

অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উপার্জন সম্পর্কে এ লেখায় তাঁর মনোভাব আরও স্পষ্ট এবং কঠোর। তিনি এতে সরাসরি লেখেন, 'পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে।' প্রকৃতিই নারীদের গৃহবাসিনী করে সৃষ্টি করেছে—রবীন্দ্রনাথ এরূপ ইঙ্গিত করেছিলেন।

কৃষ্ণভাবিনী রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পাল্টা উত্তর দেন সাহিত্যের মাঘ সংখ্যায় (১২৯৮)। তিনি লেখেন যে, প্রকৃতি নারীদের গৃহবাসিনী করলেও, পিঞ্জরবাসিনীর প্রবৃত্তি দেননি অথবা চিরকারারুদ্ধা করেও সৃষ্টি করেননি।

> স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষার কথা উঠিবা মাত্র ঐ সামান্য অক্ষমতা অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত তর্ক করিতে থাকেন, তখন নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন—ইহা দেখিতেও অধিক বুদ্ধির আবশ্যক হয় না।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণভাবিনী রক্ষণশীলতায় একমত সে হলো : শিক্ষালাভ করে মেয়েদের উপার্জন করা উচিত কিনা। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোমোহিনী হুইলার ১৮৬০-এর দশক থেকে শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে কাজ করে আসছিলেন। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকতার কাজেও বেশ কয়েকজন নারী যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করে চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী বসু, কামিনী সেন, ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র, বিধুমুখী বসু, যামিনী সেন প্রমুখ চাকরি করছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সরলা দেবী চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন হায়দারাবাদে। রবীন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণভাবিনী—উভয়েই এই সত্যটাকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, মেয়েদের পক্ষে উপার্জন করা শ্রেয় নয়। কৃষ্ণভাবিনী লেখেন,

> নারীদের উচ্চশিক্ষা দিলেই, তাহারা যে সকলে কানে কলম গুঁজিয়া আফিসে আফিসে কাজের উমেদারী করিয়া বেড়াইবে ও দু-চার টাকা পারিশ্রমিকের জন্য দু'এক ঘণ্টা খাটিবে—ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন? তবে যাহাদের ভরণপোষণ করিবার কেহ নাই ও সহায়-সম্পত্তির অভাব, তাহারা যদি আত্মীয়দের কাছে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে নিজে উপার্জ্জন করিয়া, পরিবার পালন করিতে পারে, তাহা হইলে উহা নারীদিগকে অপমানের পরিবর্ত্তে আত্মমর্য্যাদা ও মহত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকে।[৩৭]

কৃষ্ণভাবিনী যা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কেন, কারও তাতে বিশেষ আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু উপার্জন সম্পর্কে হোক, অথবা পুরো প্রবন্ধ সম্পর্কে হোক, রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তিনি পরের মাসের *সাধনায়* পাল্টা কৃষ্ণভাবিনীর 'উত্তরের' আবার জবাব দেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা তখনো বঙ্গদেশে সামান্যই প্রচলিত হয়েছিলো। বিদ্যাসাগরের মতো বহুগুণান্বিত এবং শ্রদ্ধেয় মানুষকে তাঁর প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের জন্যে সমাজে বেঁচে থাকতে হয়েছিলো নানা রকমের আপোশ করে। আদর্শ নারীর যে ভাবমূর্তি তখন গড়ে উঠেছিলো, তাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই ছিলো সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক। এমন কি, কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লোকও নারীর আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সেবা ইত্যাদি গুণেরই প্রশংসা করেন। এ প্রশংসার

পেছনে পুরুষদের স্বার্থপরতা এবং নারীদের নিজেদের কাজে লাগানোর মনোভাব আসলে মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও সমাজের মূল্যবোধ এড়াতে পারেননি। সেকালে সবাই প্রত্যাশা করতেন, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যাই হোন না কেন, মহিলারা স্বাধীন চিন্তা না-করে বরং নীরবে স্বামীর পদাঙ্কই অনুসরণ করবেন। কারণ স্বামী, সন্তান এবং সংসারের জন্যেই তাঁদের জীবন নিবেদিত। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাসী কৃষ্ণভাবিনী এ ধারণা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, মেয়েদের জীবন পুরুষদের জন্যেই নিবেদিত—এ অসভ্য সমাজের চিন্তা। তাঁর মতে, সভ্য এবং অসভ্যতার পার্থক্যই এখানে। তিনি লেখেন,

> স্ত্রীজাতি এ জগতে কেবল জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিম্বা পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্তও গঠিত নহে। পরোপকার ও অন্যের জন্য জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।[৩৮]

এই 'নিজের নিমিত্ত বাঁচার' ধারণার সঙ্গে পুরুষ স্বার্থের যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্ত করেন। মেয়েরা নিজের জন্যে বাঁচতে গেলে পুরুষদের স্বার্থহানি ঘটে এবং তখনই তাঁরা অত্যাচারের মাধ্যমে মেয়েদের কারারুদ্ধ করার প্রয়াস পান। তাঁর প্রবন্ধে পুরুষ সমাজের স্বার্থ এবং ভণ্ডামি সম্পর্কে তিনি যে-বক্তব্য রাখেন, তাঁর আগে অন্য কোনো বাঙালি নারীর রচনায় তেমনটা লক্ষ করিনে। যদিও কৃষ্ণভাবিনীর তিরিশ বছর আগে কৈলাসবাসিনী দেবী অস্ফুট স্বরে অনুরূপ অভিযোগ করেছিলেন। তবে তাঁর ভাষায় কৃষ্ণভাবিনীর স্পষ্টতা আদৌ ছিলো না। এমন কি, কৃষ্ণভাবিনী অত্যাচারের যে বিশ্লেষণ দেন, কৈলাসবাসিনীতে তাও অনুপস্থিত। তাঁদের পটভূমি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য বিচার করলে, থাকা প্রত্যাশিতও নয়। পরের অধ্যায়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখবো যে, তিনি এই অত্যাচার এবং ভণ্ডামির স্বরূপকে আরও বিস্তারিত এবং ধারালোভাবে উন্মোচন করেছিলেন।

মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষিত নন এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব দুর্বল—এই যুক্তি দেখিয়ে পুরুষরা মহিলাদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখেন। এবং অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখার ফলে তাঁদের শিক্ষিত হবার এবং ব্যক্তিত্ব গঠিত হবার সম্ভাবনা আরও কমে যায়। সে জন্যে কৃষ্ণভাবিনী পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মানুষ একদিনে চলিতে শিখে না, পাখিরা একবারে উড়িতে পারে না।' 'হিন্দু মহিলাদের সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিন দেখিবেন, তাঁহারা আর পড়িয়া যাইবেন না।' ব্রাহ্মরা যে মহিলাদের সীমিত পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তিনি দাবি করেন, তার সুফল তাঁরা অবশ্যই পাবেন। অপর পক্ষে, মেয়েদের অবরুদ্ধ করে রাখলে, গোটা জাতিই দুর্বল হতে বাধ্য।

জাতির উন্নতির জন্যে পুরুষ এবং নারীর সমবেত প্রয়াস অত্যাবশ্যক—বহু জায়গায়ই তিনি এ কথা বলেছেন। ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের মহিলারা যে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেন, এ তাঁর মতে বিশেষ প্রশংসনীয়। অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করেন বলে পার্সি, ভুটিয়া এবং পাহাড়ি

মহিলাদের কোনো কোনো গুণ বাঙালি নারীদের তুলনায় বেশি বিকশিত হয় এবং এ জন্যে তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন।

পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই যে-সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিলো, সে সমাজের একজন হয়েও কৃষ্ণভাবিনী সমাজ-পরিবর্তনের সপক্ষে মত দিয়েছেন। মুসলমান আমলে নানা পরিবর্তন এবং আপোশের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ অগ্রসর হয়েছিলো। অতএব, তাঁর মতে, ইংরেজ রাজত্বে আরেক দফা পরিবর্তন এবং সংস্কারের মাধ্যমে সামনের পথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। না-হলে বর্ধনশীল শিশুকে ছোটো দোলনায় আটকে রাখার মতো তা হবে মারাত্মক।

তাঁর এ ধরনের মতামতের দরুন কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর মতানৈক্য হয়নি, সেকালের তথাকথিত প্রগতিশীলদের চোখে তা অনৈতিহাসিক বলে বিবেচিত হয়। *ভারতী ও বালক* পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' (ফাল্গুন ১২৯৬) প্রকাশিত হওয়ার দু মাস পরেই 'শ্রী যোঃ' স্বাক্ষরিত 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' নামে আর-একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১২৯৭)। 'শ্রী যোঃ' কৃষ্ণভাবিনীর বক্তব্যের সমালোচনা করেন। বস্তুত, তাঁর প্রগতিশীল মনোভাবের দরুন ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা *ভারতী ও বালকের* সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দুর্বল হয়। এবং তারপর *সাধনায়* রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিবাদ' প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি *ভারতী ও বালকের* সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী দেড় বছরে এ পত্রিকায় তাঁর আটটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। *সাহিত্য* পত্রিকায় কিঞ্চিদধিক এক বছরে তাঁর চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু *সাধনায়* 'প্রতিবাদ' প্রকাশিত হবার পর 'সংসারে শিশু' নামে আর-একটি প্রবন্ধ ছাড়া তাঁর আর কোনো রচনা *সাহিত্যে* স্থান পায়নি।

বস্তুত, এর পর কোনো পত্রিকায়ই তিনি পরবর্তী পাঁচ বছর কোনো রচনা প্রকাশ করেননি। যিনি দু বছরে আঠারোটি প্রবন্ধ লিখলেন, তিনি পরবর্তী পাঁচ বছরে আর কোনো লেখা প্রকাশ করলেন না কেন, তা কৌতূহলের বিষয়। অসম্ভব নয় যে, তিনি রক্ষণশীল সমালোচক এবং সম্পাদকদের বক্তব্যে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাঁচ বছর বিরতির পরে তিনি *প্রদীপ, সখা* এবং *বামাবোধিনী পত্রিকায়* আরও কয়েকটি লেখা প্রকাশ করেন। *প্রবাসী* পত্রিকার সঙ্গেও বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো।

পাঁচ

কৃষ্ণভাবিনী গত শতাব্দীর শেষ দিকে নারীপ্রগতি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন, তা তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে প্রগতিশীল ছিলো, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। মহিলাদের যথার্থ কাজ কী—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি গতানুগতিক। 'স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য' প্রবন্ধে (১৮৯১) তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত না হলেও, এই প্রবন্ধ থেকে

এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব পরিষ্কার লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে, প্রফুল্ল থাকা মহিলাদের প্রধান গুণ, পরিচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয় এবং রন্ধন তৃতীয়। তিনি বলেন, স্ত্রীজাতির প্রধান কর্মক্ষেত্র গৃহ, আর প্রধান কর্ম ঘরের কাজ। যিনি মহিলাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে অতো প্রগতিশীল, মহিলাদের কর্মভূমিকা সম্পর্কে তিনি আবার অতোই রক্ষণশীল। হয়তো সে যুগের ধর্মই ছিলো এমন।

চতুর্থ অধ্যায়েই দেখেছি, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও যথেষ্ট পাশ্চাত্য প্রভাবিত ছিলেন। এবং আমরা তাঁকে আখ্যায়িত করেছি সেকালের প্রথম আধুনিকা হিশেবে। কিন্তু তিনিও গৃহকর্ম, রান্নাবান্না, সেবাশুশ্রূষা এবং ঘর পরিচ্ছন্ন রাখাকে মহিলাদের প্রধান কাজ বলে বর্ণনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করার পরেই কামিনী সেন অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন। কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেন, তারও আগে। কিন্তু বিয়ের পর তিনি অধ্যাপনা এবং কাব্য রচনা উভয়ই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার বদলে বিশেষ করে মনোযোগ দিয়েছিলেন ঘরের কাজ, সন্তান লালনপালন, স্বামীসেবা ইত্যাদিতে। ঘরের বাইরে মানকুমারী বসুরও কোনো জীবন ছিলো না। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ছিলেন খুব ভালো ছাত্রী। এমবি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরবর্তীতে চিকিৎসক হিশেবেও সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে বিয়ে হবার পরে তিনি চিকিৎসা করা ছেড়ে দেন। তার বদলে আত্মনিয়োগ করেন গৃহকর্মে। সরলা দেবী বড়ো চাকরি নিয়ে হায়দারাবাদে গেলেও বেশি দিন সে চাকরি করেননি। বিয়ের পর চাকরি করার কথা ভাবেনওনি। তাঁর মামাতো বোন ইন্দিরা দেবী ভালো ফলাফল করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু চাকরি করার কথা কল্পনাও করেননি। তার অর্থ ভদ্রলোক সমাজ শিক্ষাকে সেকালে নারীদের একটা অলঙ্কার হিশেবে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছিলো, কিন্তু শিক্ষিত নারীরা স্বাধীন উপার্জনের কথা ভাবেননি; অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে উপার্জনের প্রয়োজন থাকতে পারে, তাও বিবেচনা করতে পারেননি। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা পলনের মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণতা ও আত্মতৃপ্তি লাভের কথা তাঁরা তখনো ভাবেননি।

এ থেকে মনে হয়, সমাজ অত্যন্ত অনগ্রসর থাকায়, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা, স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার ধারণা তত্ত্বগতভাবে গ্রহণ করলেও, সেকালের মহিলাদের পক্ষে পরম্পরানির্দিষ্ট ভূমিকাসমূহ অবহেলা করা সম্ভব ছিলো না। হয়তো সে জন্যেই কৃষ্ণভাবিনীও মহিলাদের চিরাচরিত কর্ম-ভূমিকারই সমর্থক ছিলেন। বস্তুত, তিনি এমন কথাও লিখেছিলেন যে, মহিলারা লেখাপড়া শিখবেন, যাতে তাঁরা ভালো মা হয়ে উঠতে পারেন। মহিলাদের ভালো করে নিজেদের জন্যে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এ কথা সাধারণত সেকালের পুরুষরা অনেকেই বলতেন। যাঁরা মুখে অতো জোরালো করে বলতেন না, তাঁরাও মনে মনে এটা বিশ্বাস করতেন।

মহিলাদের কর্মক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করলেও, চাকরি এবং অর্থ উপার্জনের যৌক্তিকতা কৃষ্ণভাবিনী মেনে নিতে পারেননি—বিশেষ করে বেশি বয়সে।

অ্যামেরিকা এবং ইংল্যান্ডে শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতি ও অন্যান্য চাকরি করে এবং লিখে জীবিকা উপার্জন করেন—এটা তিনি লিখেছিলেন প্রায় গর্ব করে। কিন্তু বিধবা এবং আত্মীয়-সহায়হীন মহিলা ছাড়া, অন্য কোনো বাঙালি মহিলা চাকরি করবেন, এটা তিনি অনুমোদন করতে পারেননি। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন : এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবেন যে, শিক্ষিত মহিলারা চাকুরির খোঁজে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে ঘুরে বেড়াবেন অথবা সামান্য কিছু টাকার জন্যে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্যে অফিসে কাজ করবেন? বস্তুত, বাঙালি মহিলাদের জন্যে এটাকে তিনি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেননি।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়া মহিলাদের সত্যিকার স্বাধীনতা আসতে পারে না—এ ধারণা সে যুগে বিরল হলেও, একেবারে অজ্ঞাত ছিলো না। কৃষ্ণভাবিনী কলম ধরার আগে ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে একাধিক বাঙালি চিন্তক *জ্ঞানাঙ্কুর* এবং *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এ ধরনের কথা বলেছিলেন। কৃষ্ণভাবিনীর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার আগে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরি করতেও আরম্ভ করেছিলেন। কোনো কোনো মহিলা ক্ষীণ স্বরে হলেও মহিলাদের চাকরি করার প্রশ্নটি সমর্থন করেন। পরের অধ্যায়েই দেখতে পাবো, কৃষ্ণভাবিনীর কনিষ্ঠ সমসাময়িক রোকেয়া এ দাবিতে রীতিমতো সোচ্চার ছিলেন। তিনি প্রায় এমন যুক্তি দিয়েছিলেন যে, মহিলারা আর্থিক দিক দিয়ে পুরুষ-আত্মীয়দের কাছে কতোটা কম নির্ভরশীল, তার ওপরই তাঁদের স্বাধীনতার মাত্রা নির্ভরশীল।

আরও একটি ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবিনীর দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা চোখে পড়ে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা জনপ্রিয় না হোক, অপরিচিত ছিলো না। বিশেষ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা কম হয়নি। কলকাতায় সম্মিলিত আন্দোলনও হয়েছিলো। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর হিন্দু পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। ভারতের দুর্দশার জন্যে তিনি যে কেবল যবনদের দায়ী করেন, তাই নয়; খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ—এ রকমের নির্ভেজাল সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মন্তব্য তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন ১৮৯৮ সালে। ব্রাহ্মদের তিনি প্রশংসা করেন, বিশেষ করে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে। কিন্তু ব্রাহ্মদের সঙ্গে তিনি নিজেকে মোটেই শনাক্ত করতে পারেননি।

জীবনের শেষ দিকে তিনি নারী সংক্রান্ত প্রশ্নেও খানিকটা রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে তাঁর স্বামী এবং একমাত্র পুত্র আকস্মিকভাবে অল্প ক দিনের ব্যবধানে মারা যান। অসম্ভব নয় যে, এই শোকই হয়তো তাঁকে রক্ষণশীল করে তোলে। অতঃপর তিনি বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনা এবং ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের অধীনে সেবামূলক কাজ বেছে নেন। রক্ষণশীল মহিলাদের লেখাপড়ার দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে তিনি অনেক পরিশ্রম করেন। তবে শেষ জীবনে তিনি নারীদের আধুনিক করে তোলার আন্দোলন থেকেই নিজেকে বিযুক্ত করে

নিয়েছিলেন। মারা যাবার তিন বছর আগে, ১৯১৬ সালে তিনি একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করেন। জীবনের শেষ ক বছর তিনি *প্রবাসী*তে যে-কটি রচনা প্রকাশ করেন, তার কোনোটিই সমগ্র নারীসমাজের প্রতি নিয়োজিত নয়। যৌবনে যিনি ছিলেন অতো আধুনিক এবং স্বাধীনতা-পিয়াসী, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে তিনিই ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোশ করেন, এর কারণ কি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেই, নাকি তা এ দেশের মাটিতেই প্রোথিত ছিলো?

---

১ কৃষ্ণভাবিনীর পিতার নাম জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী। *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃ. ৪৪১।

২ *কুমুদিনী-চরিত* নামে একটি পুস্তিকা থেকে কুমুদিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৩ সালে এবং সাত বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সঙ্গে। তাঁর স্বামী ছোটো বোন এবং ভাইকে লেখাপড়া শেখাতেন (পৃ. ২-৩)। কিন্তু সেকালের লোকাচার অনুযায়ী স্ত্রীর সঙ্গে দিনের বেলা দেখা হতো না বলে কুমুদিনীকে লেখাপড়া শেখাতে পারতেন না (পৃ. ৫)। কুমুদিনী নিজেই শুনে শুনে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন। লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর স্বামী গ্রামের একটি ছেলেকে নিযুক্ত করেন (পৃ. ৫-৬)। আর নিজে তাঁকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেন কুমুদিনীর বয়স চোদ্দো বছর হওয়ার পর (পৃ. ১০)। লেখাপড়ায় তাঁর উন্নতি দেখে গ্রামের অন্য কোনো কোনো মেয়েও উৎসাহিত হন এবং প্রকাশ্যে লেখাপড়া শুরু করেন (পৃ. ৮-৯)। তাঁর স্বামী ছিলেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। তাঁরা পুজো এবং কোনো কোনো লোকাচার ত্যাগ করায় পরিবার এবং সমাজের দিক থেকে দারুণ প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয় (পৃ. ১৬-১৭)। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা কলকাতায় গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন (পৃ. ৫১)। ১৮৬৪ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি মারা যান। *কুমুদিনী-চরিত* পুস্তিকাটির যে-কপিটি আমি ব্যবহার করি, তার মলাট এবং নামপত্র ছেঁড়া থাকায় এর প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারলাম না।

৩ কৃষ্ণভাবিনী দাস, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, কলিকাতা : সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ১৮৮৫।

৪ ঐ, পৃ. ২।

৫ ঐ, পৃ. ১৯।

৬ ঐ, পৃ. ২০-২১।

৭ ঐ, পৃ. ৮৬-৯০।

৮ ঐ, পৃ. ৯০-৯৬।

৯ ঐ, পৃ. ১৩৯-৪০।

১০ ঐ, পৃ. ১৪২।

১১ ঐ, পৃ. ১৫২।

১২ ঐ, পৃ. ১৮২।

১৩ ঐ, পৃ. ১৪০।

১৪ ঐ, পৃ. ১৪৫-৪৯।

১৫ ঐ, পৃ. ২৫৩–৫৪।

১৬ ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন নারীদের পরীক্ষায় অংশ নেবার অধিকার দেয় ১৮৭৮ সালে – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছর পরে। অপর পক্ষে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এ অধিকার দেয় ১৯২০ সালে এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দেয় ১৯২৩ সালে।

১৭ ঐ, পৃ. ১৫৩–৫৪।

১৮ দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ সমালোচনার নোট হারিয়ে ফেলেছি। সুতরাং পত্রিকার সংখ্যা অথবা পৃষ্ঠা সংখ্যা দিতে পারলাম না।

১৯ *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা,* পৃ. ১৪২।

২০ ঐ, পৃ. ১৫৭–৬০।

২১ ঐ, পৃ. ১৮২।

২২ ঐ, পৃ. ১৮৩।

২৩ ঐ, পৃ. ১৭৪, ১৭৬।

২৪ ঐ, পৃ. ১৮৩।

২৫ ঐ, পৃ. ১৮৩–৮৪।

২৬ ঐ, পৃ. ১৪৫–৪৯।

২৭ ঐ, পৃ. ৩০০–০৯।

২৮ ঐ, পৃ. ৩০০–০১।

২৯ 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ) ১৮৭৮, পৃ. ১৫৪–৫৬।

৩০ বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আমার রচিত *সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৬–৩৭।

৩১ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা* (কলিকাতা : এলগিন প্রেস, ১৯০০)।

৩২ রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতে আরম্ভ করেন ১৮৯০ সালের নভেম্বর মাস থেকে। এই সময়ে তাঁর কন্যা এবং পুত্রদের লেখাপড়ার সূচনা। তিনি নিজে এঁদের লেখাপড়ার দিকে লক্ষ রাখতেন। তা ছাড়া, লরেন্স নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছাড়াও অন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। মেয়েদের তিনি স্কুল–কলেজে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাননি, কিন্তু তাই বলে তাঁদের তিনি অশিক্ষিত রাখেননি। তবে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে লেখাপড়া শেখায় বিঘ্ন ঘটেছিলো বলে মনে করলে অসঙ্গত হবে না।

৩৩ 'শিক্ষিতা নারী', *সাহিত্য,* আশ্বিন ১২৯৮, পৃ. ২৮৮–৯০।

৩৪ ঐ, পৃ. ২৯০।

৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লাঠির উপর লাঠি', বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, পৃ. ৬২–৬৩।

৩৬ 'শিক্ষিতা নারীর প্রতিবাদের উত্তর', *সাহিত্য* , মাঘ ১২৯৮, পৃ. ৪৭৪–৭৫।

৩৭ ঐ, পৃ. ৪৭৫।

৩৮ ঐ, পৃ. ৪৭৭।

৬
বিলেতে বাঙালি মহিলা

আগের অধ্যায়গুলো থেকে আমরা লক্ষ করেছি যে, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ মনে করতো : নারীরা লেখাপড়া শিখলে পরিবারের অকল্যাণ হবে এবং তারা বিধবা হবে। তা ছাড়া, তখন পর্দাপ্রথাও কঠোরভাবে পালিত হতো। রাসসুন্দরীর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ লক্ষ করেছি যে, এই পর্দাপ্রথা এতো কঠোর ছিলো যে, অন্য পুরুষদের তো কথাই নেই – দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গেও স্ত্রীর দেখা করা নিষিদ্ধ ছিলো। এসব ছাড়া, নারীদের পোশাকও ছিলো পর্দাপ্রথার একান্ত অনুকূল। কারণ, সেকালের বাঙালি নারীরা পরতেন ব্লাউজ– এবং পেটিকোট–বিহীন একটি মাত্র শাড়ি। এ পোশাককে ১৮৬০–এর দশকে একজন সমাজসংস্কারক দশ হাত শাড়ি পরেও স্ত্রীলোক ন্যাংটো বলে বর্ণনা করেছেন।[১] সর্বোপরি, সেকালের লোকাচার অনুযায়ী পুরুষদের পক্ষেও কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিলো। কেউ এটা অমান্য করলে তাঁকে সমাজচ্যুত হতে হতো।[২] এই পরিস্থিতিতে নারীদের পক্ষে বিলেত যাওয়া কতো কঠিন ছিলো, সে কেবল অনুমান করা যায়।

বস্তুত, কঠিন নয়, বলা উচিত, সাধারণভাবে কোনো বাঙালি নারী অথবা পুরুষই বিলেত যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না। তা সত্ত্বেও ১৭৭২–৭৩ সালে ঘনশ্যাম দাস, ১৮৩০ সালে রামমোহন রায়, ১৮৩০–এর দশকের দ্বিতীয় ভাগে আনন্দচন্দ্র মজুমদার এবং ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকজন পুরুষ সাগর পাড়ি দিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র মজুমদারের পক্ষেই কাজটা সবচেয়ে সহজ ছিলো। কারণ বিলেত যাওয়ার কয়েক বছর আগে – সম্ভবত ১৮৩৩ সালে – তিনি অ্যালেক্সাণ্ডার ডাফের কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ডাফ যাঁদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে তৃতীয়। সুতরাং তাঁর পরিবার তাঁকে ত্যাজ্য করলেও, হিন্দু সমাজ তাঁকে সরাসরি একঘরে করতে পারতো না। এ ছাড়া, রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ছিলেন সেকালের কলকাতার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন। তাঁরা সমাজকে থোড়াই পরোয়া করতেন। মন–মানসিকতার

দিক দিয়েও তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী – লোকাচারের প্রতি তাঁদের সামান্যই আনুগত্য ছিলো।

যাঁরা হিন্দু হয়েও সমাজের নিষেধ অমান্য করে বিলেত যাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন তিনজন ছাত্র – সূর্য (গুডেব) চক্রবর্তী, ভোলানাথ বসু এবং গোপাল শীল। তাঁরা দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার সময়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে তাঁর সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের সঙ্গে আরও একজন ছাত্র চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম দ্বারকানাথ বসু। কিন্তু তিনি হিন্দু ছিলেন না। বিলেত যাত্রা করার চার বছর আগে তিনি ডাফের কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মোট কথা, নারীরা বিলেত যাবেন – এ কথা সেকালে কেউ কল্পনাও করেননি। কারণ, তাঁদের পক্ষে বিলেত যাওয়া পুরুষদের তুলনায় ঢের শক্ত ছিলো। পুরুষরা টাকাপয়সা জোগাড় করে সাহস করে লোকাচার অমান্য করার সাহস দেখালে কালাপানি পাড়ি দিতে পারতেন। কিন্তু নারীদের জন্যে পর্দা ভাঙা, জুতো–সহ বাইরে যাওয়ার উপযোগী পোশাক পরা এবং শিক্ষা – এই তিনটা বাড়তি বাধা ছিলো। সেই বিরাট সামাজিক বাধা অতিক্রম করে বাঙালি নারীদের মধ্যে যিনি সবার আগে – ১৮৫৯ সালে – বিলেত গিয়েছিলেন, তিনি কমলমণি – জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি কী করে এতোগুলো বাধা অগ্রাহ্য করে বিলেতে গেলেন। তার সবচেয়ে সোজা উত্তর হলো – তিনি ছিলেন খ্রিস্টান পিতার কন্যা এবং খ্রিস্টান স্বামীর স্ত্রী। সুতরাং হিন্দু সমাজের তরফ থেকে যেসব বাধা আসতো, তিনি সেগুলো অমান্য করতে ভয় পাননি। তাঁর পিতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ১৯২০–এর দশকের শেষ দিক থেকে হিন্দু কলেজের যে–ছাত্ররা ইয়ং বেঙ্গল নামে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত হয়েছিলেন, সেই ইয়ং বেঙ্গলদের অন্যতম প্রধান নেতা। হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ভঙ্গ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে–স্বল্পসংখ্যক তরুণ খ্রিস্টান হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি ১৮৩২ সালে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি ধর্মযাজক এবং খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান – বিশপস কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে এবং লিখিতভাবে বহুবার হিন্দু সমাজের রীতিনীতির প্রতিবাদ করেছিলেন। অনেকগুলো পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেও তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কন্যা কমলমণি। জন্মেছিলেন ১৮৩৭ সালে।

কমলমণির স্বামী ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। সেকালের কলকাতায় ব্যবসায়ী ছাড়া, শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে ধনী হয়েছিলেন, তাঁদের একজন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি বিশেষ করে পরিচিত ছিলেন ইংরেজি–জানা দেশীয় উকিল হিশেবে। এ ছাড়া, একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এমন কি, নাটকের অভিনয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। মোট কথা, তিনি যথেষ্ট প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই একমাত্র পুত্র ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তিনি ছিলেন হিন্দু

কলেজে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসুর সহপাঠী। মাইকেল কবি হিশেবে খ্যাতিমান হলেও জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর থেকে মেধাবী ছাত্র ছিলেন – এমন কি, ইংরেজিতেও।

সেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন অল্পবয়সে তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর কমলমণিকে বিয়ে করতে চান। রূপে–গুণে–অর্থে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাঞ্ছিত পাত্র ছিলেন। কমলমণি বাড়িতে খানিকটা লেখাপড়া শিখলেও, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের থেকে ভালো পাত্র কৃষ্ণমোহন পেতে পারতেন না। তাঁকে জামাতা হিশেবে গ্রহণ করতে কৃষ্ণমোহন রাজিও ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি শর্ত দিয়েছিলেন – বিয়ে করতে হলে জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খ্রিস্টান হতে হবে। কৃষ্ণমোহন তখন জানতেন যে, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুত্রের ওপর রাগ করবেন। কিন্তু ধর্মান্তরের ফলে তাঁর পিতা যে তাঁকে তাঁর বিপুল সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত করবেন, এ তিনি জানতেন না। জানলে কমলমণিকে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছে বিয়ে দিতেন কিনা বলা যাচ্ছে না। ওদিকে, কমলমণিকে বিয়ে করার জন্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন এতোটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি ১৮৫১ সালের ১০ জুলাই তারিখে ভাবী শ্বশুর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন এবং পরের বছর ১৫ এপ্রিল তারিখে পনেরো বছর বয়স্ক কমলমণির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

বিয়ের কয়েক বছর পরে সেই কমলমণি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভবত এতোটাই অসুস্থ যে, তাঁকে নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৫৯ সালে তিনি দুই কন্যা এবং এক শিশুপুত্রকে নিয়ে লন্ডনে যান। সেখানে কমলমণির চিকিৎসা চলতে থাকে। কিন্তু অনেকটা ভালো হয়ে উঠলেও, তিনি কখনোই পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি। ওদিকে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিঙ্কন্স ইনে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ভর্তি হন এবং ১৮৬২ সালের ১১ জুন তারিখে ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়া, ১৮৬০ সাল থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলা এবং হিন্দু আইনের অধ্যাপক হিশেবে নিযুক্ত হন – সম্ভবত অবৈতনিক শিক্ষক হিশেবে। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

১৮৬৮ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মারা যান। তার কিছু কাল আগে – ১৮৬৫ সালের শেষ দিকে – জ্ঞানেন্দ্রমোহন পরিবার নিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুত্রকে ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি উইল করে তাঁর বিশাল সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দেন। বিশেষ করে সম্পত্তির প্রধান অংশই দিয়ে যান ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই উইলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন। সে মামলায় হেরে গিয়ে আপিল করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেননি। এই সময়ে – ১৮৬৯ সালে – কলকাতাতেই মারা যান কমলমণি। তারপর জ্ঞানেন্দ্রমোহন আবার তাঁদের দু কন্যাকে নিয়ে বিলেতে ফিরে যান।

বছর দশেক লন্ডনে বাস করলেও, কমলমণি বাঙালি নারীদের ইতিহাসে আর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তিনি তাঁর বিদেশ বাস সম্পর্কে কিছু লিখে গেছেন কিনা, জানা যায় না। লিখলে, বিলেতে প্রথম বাঙালি নারী হিশেবে তাঁর অভিজ্ঞতা মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো।

কমলমণির চার বছর পরে দ্বিতীয় যে-নারী কলকাতা থেকে সন্তানদের নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন তিনি অ্যামিলিয়া হেনরিয়েটা সফাইয়া ডাট - মাইকেল মধুসূদনের জীবনসঙ্গিনী। তিনি বিলেতে গিয়ে পৌঁছান ১৮৬৩ সালের দোসরা মে তারিখে। একজন বাঙালি কবির স্ত্রী হলেও তিনি কোনোক্রমেই বাঙালি ছিলেন না। সুতরাং বাঙালি নারীদের বিলেত যাত্রার ইতিহাসে তাঁর নাম প্রায় অবান্তর।

দ্বিতীয় যে-বাঙালি নারী বিলেতে যান তাঁর স্বামী এবং দুই কন্যাকে নিয়ে তিনি গোবিন্দচন্দ্র দত্তের স্ত্রী এবং কবি তরু ও অরু দত্তের মা। তাঁর নাম ছিলো ক্ষেত্রমোহিনী। তাঁর পরিচয় ঐ টুকুনই। তার বেশি নয়। এই পরিবার ইউরোপে যান ১৮৬৯ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। গোবিন্দ দত্তও হিন্দু কলেজে মাইকেল এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সহপাঠী ছিলেন। ইংরেজিতে ছিলেন তুখোড় ছাত্র। ইংরেজিতে লেখা তাঁর কবিতার বই Cherry Stones সে সময়ে প্রশংসিত হয়েছিলো। এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো বিলেতের Blackwood Magazine-এ। তাঁর পিতাও নাম-করা লোক ছিলেন - রসময় দত্ত। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য এবং কলকাতার প্রভাবশালী লোকেদের একজন। খ্রিস্টিয়ানি এবং হিন্দুধর্মবিরোধী শিক্ষা দিচ্ছেন বলে হিন্দু কলেজের যে-পরিচালকরা কলেজ থেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক ডিরোজিওকে বিতাড়িত করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের নেতা। কিন্তু তাঁর এমনই কপাল যে, ১৮৫৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে গোবিন্দ-সহ তাঁর তিন পুত্রই ১৮৬২ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কেবল খ্রিস্টধর্ম নয়, তাঁরা রীতিমতো পশ্চিমা জীবনধারা বেছে নেন।

গোবিন্দ দত্ত এবং তাঁর পরিবার যে ইংল্যান্ডে আসতে পারলেন, তার কারণ, তাঁরা খ্রিস্টান ছিলেন। তাঁরা অবশ্য প্রথমেই ইংল্যান্ডে আসেননি। তাঁরা প্রথমে আসেন ফ্রান্সের মার্সেই শহরে। সেখানে তাঁরা কয়েক মাস ছিলেন এবং উৎসাহের সঙ্গে ফরাসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। সেখানই অরু এবং তরু দুই বোন প্রথমবারের মতো স্কুলে যান। মার্সেইর পরে তাঁরা যান ইতালির নীসে। তাঁরা সেখান থেকে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। সেখানেও তাঁদের লেখাপড়া অব্যাহত থাকে। পরের বছরের দ্বিতীয় ভাগে তাঁরা ইংল্যান্ডে আসেন। সেখানে তাঁরা প্রথমে বাস করেন লন্ডনে এবং তারপর কেমব্রিজে। এ সময়ে প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড লরেন্স, প্রাক্তন ছোটো লাট বার্টল ফ্রায়ার, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান প্রমুখ সমাজের উপর তলার লোকেদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় - কলকাতার অভিজাত পরিবারের সদস্য হিশেবে তাঁদের পরিচয় ছিলো ভারতবর্ষে থাকার সময় থেকেই। তা ছাড়া, লেখক থ্যাকারের কন্যাদের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় হয়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মেয়েদের পক্ষে কোনো পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ অনুমোদিত ছিলো না। কিন্তু তাঁরা সেখানকার লেকচারে উপস্থিত থাকতেন। ফলে তাঁরা রীতিমতো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের পিতামাতা ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, তাঁদের যে রকমের শিক্ষা দেওয়া দরকার, তার ব্যবস্থা তখনকার কলকাতায় ছিলো না। তাঁরা মেয়েদের উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই ইউরোপে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছিলো। অরু এবং তরুর আগে বাঙালি নারীদের মধ্যে কেউই লেখাপড়া শেখার জন্যে বিলেতের মাটিতে পা রাখেননি।

অরু এবং তরু দু বোনই অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন – বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে। তাঁরা বাংলা তো জানতেনই, তার ওপরে শিখেছিলেন ফরাসি, ইংরেজি এবং সংস্কৃত। ভাষা শিক্ষা ছাড়া, তাঁরা দুজনেই পিতার কবিত্ব প্রতিভা লাভ করেছিলেন। ইংরেজি এবং ফরাসি – উভয় ভাষায় তরু কবিতা ও উপন্যাস লেখেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছিলো। তরু দত্তের আগে কোনো ভারতবর্ষীয় নারী ইংরেজিতে কবিতা অথবা উপন্যাস লেখেননি। ফরাসি ভাষায় উপন্যাসও লিখেছিলেন প্রথম ভারতীয় হিশেবে। সত্যি বলতে কি, সেকালের একজন প্রধান কবি হিশেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

তরুর মৃত্যুর পরে পাণ্ডুলিপির আকারে তাঁর বেশির ভাগ লেখা তাঁর পিতা আবিষ্কার করেন। তিনি ধীরে ধীরে এই লেখাগুলো প্রকাশ করেন। তরুর মৃত্যুর আগেই তাঁর A Sheaf Gleaned in French Fields ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। তারপরই এটি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৭৮ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮০ সালে এর লন্ডন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত চাইলেও তিনি তাঁর Captive Ladie লন্ডন থেকে প্রকাশ করতে পারেননি। অবশ্য স্বীকার করতে হবে গোবিন্দ দত্তের মতো অর্থসম্পত্তি অথবা প্রতিপত্তি তাঁর ছিলো না। সে যাই হোক, তরু দত্তের Ancient Ballads and Legends মত Hindustan প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তা ছাড়া, তাঁর ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় লেখা দুই উপন্যাসই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিলো।

বিলেতে না-এলেও পিতার মতো বাংলাদেশে বসেই তরু এবং অরু হয়তো কবিতা লিখতেন। কিন্তু তাঁরা যে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় লিখেছিলেন, তার পেছনে তাঁদের ইউরোপভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। যে-ভারতীয়রা ইংরেজিতে কবিতা লিখে নাম করেছিলেন, তরু দত্তের নাম সে কবিদের তালিকায় উপরের দিকেই ছিলো বলে অনেকে মনে করেন।

পিতামাতার সঙ্গে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁরা দু বোন ১৮৭৩ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে আসার অল্পকাল পরে প্রথমে অরু এবং তারপর তরু ১৮৭৭ সালের ৩০ অগস্ট তারিখে যক্ষ্মারোগে মারা যান যখন তাঁদের বয়স মাত্র কুড়ি/একুশ। দুই বোনের মধ্যে তরু বিশেষ প্রতিভার পরিচয় রেখে যান। এবং এখনো ইংরেজিতে

লেখা বাঙালি কবিদের যেসব সংকলন প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে অরুর কবিতা সব সময়ে না–থাকলেও তরুর কবিতা সাধারণত থাকে।



তরু ও অরু

কোনো খ্রিস্টান সংশ্রব ছিলো না, এমন যে–বাঙালি নারী প্রথম বিলেতে যান, তিনি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মনেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রাজকুমারী। তবে তিনি যে হিন্দু সমাজের চোখ রাঙানি অগ্রাহ্য করে যেতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণ তাঁরা ব্রাহ্ম হয়ে আগেই হিন্দু সমাজের সঙ্গে কার্যত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। মেরী কার্পেন্টার যখন ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসেন তখন শশিপদ এবং রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তখনই তিনি তাঁদের ইংল্যান্ডে যাবার নিমন্ত্রণ করে যান। সেই সূত্র ধরে গর্ভবতী রাজকুমারীকে নিয়ে ১৮৭১ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে শশিপদ ইংল্যান্ডের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। সেখানে কিছু দিন তাঁরা

মেরী কার্পেন্টারের অতিথি ছিলেন। এবং তাঁর বাড়িতে থাকার সময়েই ১০ অক্টোবর তারিখে রাজকুমারীর পুত্র অ্যালবিয়নের জন্ম হয়। পরের বছরের প্রথম দিকে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। রাজকুমারী বিলেতে থাকার সময়ে মেরী কার্পেন্টার তাঁকে লেখাপড়া শিখতে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। এমন কি, তাঁকে খানিকটা ইংরেজিও শিখিয়েছিলেন। অ্যালবিয়ন বড়ো হয়ে আইসিএস হয়েছিলেন এবং এক সময়ে স্যর উপাধি লাভ করেন। তা ছাড়া, তিনি পিতার একটি জীবনী লেখেন।[৩]



রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেসের নেতা এবং ব্যারিস্টার ডাবলিউ সি ব্যানার্জি - উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীও বিলেতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন বললে পুরোটা বলা হয় না। কারণ, তিনি সেখানে বহু বছর বাস করেন এবং সেখানেই মারা যান। লেখাপড়া শিখতে তাঁর স্বামী বিলেতে গেলেও, ১৮৭৪ সালে তিনি যান স্বামীর আদেশে তাঁদের তিন সন্তানকে নিয়ে। উমেশচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের মতোই দারুণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও মাইকেলের মতোই সন্তানদের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। পার্থক্য এই যে, মাইকেল ব্যারিস্টারিতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর সাধ পূরণ করতে পারেননি, কিন্তু উমেশচন্দ্র ব্যারিস্টারিতে সফল হয়ে বিলেতে রেখে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পেরেছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে তাঁর পুত্রদের মতো ব্যারিস্টার হয়েছিলেন অনেকেই, কিন্তু তাঁর কন্যাদের মতো উচ্চশিক্ষা বাঙালি নারীরা নিতে পারেননি দীর্ঘদিনের মধ্যে।

স্ত্রীকেও তিনি পোশাকে-আশাকে এবং চালচলনে বিলেতী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করেন, তখন হেমাঙ্গিনী নিরক্ষর ছিলেন। ১৮৬৮ সালে উমেশচন্দ্র দেশে ফিরে এসে তাঁকে কনভেন্টে রেখে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। জীবনযাত্রায়ও তোলেন ইউরোপীয় করে। তিনি তাঁকে শাড়ি পরতে দিতেন না। সেটা এতোই কড়াকড়ির সঙ্গে পালন করতেন যে, হেমাঙ্গিনী শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে গেলে পথে গাড়িতে গাউন খুলে শাড়ি পরে নিতেন,

আবার ফেরার পথে শাড়ি খুলে গাউন পরতেন। তাঁদের বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি গরুর মাংস রান্না করতেন। প্রথম দিকে সে মাংস খেতে অস্বস্তি বোধ করলেও, তাঁর কন্যা জানকী মজুমদারের মতে, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এই মানসিক বাধা কাটিয়ে ওঠেন।[৪] হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর সংস্কারও চলে যায়। বিলেতে থাকার সময়ে তিনি তাই ১৮৮৮ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

হেমাঙ্গিনী ১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে যখন বিলেতে যান তখন গিয়েছিলেন স্বামীকে ছাড়াই। তাঁর আগে যে-কজন বাঙালি নারী গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন। সে দিক দিয়ে তিনি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তখনকার দিনে কোনো পুরুষ সহযাত্রী ছাড়া বিলেতে যাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। কারণ, বিলেতে যেতে তখন সময় লাগতো ছ সপ্তাহ। যাবার সময়ে হেমাঙ্গিনী নিজে ছিলেন গর্ভবতী। তার ওপর তাঁর ছেলে কমলকৃষ্ণের বয়স ছিলো চার বছর, বড়ো মেয়ে নলিনীর বয়স তিন এবং ছোটো মেয়ে সুশীলার বয়স দু বছর। লন্ডনে যাওয়ার কয়েক মাস পরে গরমের সময়ে হেমাঙ্গিনীর চতুর্থ সন্তান কালীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা লন্ডনের যে-বাড়িতে টাকা দিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো কলকাতা থেকে ফিরে আসা কর্নেল ও মিসেস উডের। তাঁদের খুশি করার জন্যে হেমাঙ্গিনী পুত্রের দ্বিতীয় নাম দিয়েছিলেন উড — কালীকৃষ্ণ উড ব্যানার্জি। কিন্তু মিসেস উড এই সন্তানদের ভালো দৃষ্টিতে দেখতেন না, বরং তাদের ওপর নানা নিগ্রহ করতেন।

১৮৭৫ সালে পুজোর ছুটিতে বিলেতে গিয়ে হেমাঙ্গিনী ছোটো তিন সন্তানকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। লন্ডনে থেকে যান বড়ো ছেলে এবং বড়ো মেয়ে। এর পর তাঁরা বছরে বছরে কলকাতা এবং লন্ডনের মধ্যে আসা যাওয়া করতে থাকেন। ১৮৭৮ সালে মেজ মেয়ে সুশীলা এবং ১৮৮২ সালে মেজ পুত্র কালীকৃষ্ণ লেখাপড়ার জন্যে লন্ডনেই থেকে যান। ১৮৮৮ সাল থেকে হেমাঙ্গিনী পুত্র এবং কন্যাদের নিয়ে স্থায়িভাবে লন্ডনেই বাস করতে আরম্ভ করেন। আর তাঁদের সঙ্গে উমেশচন্দ্র এসে যোগ দেন ১৯০২ সালে। তাঁদের তিন পুত্রই অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি করে তারপর লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হন। আর কন্যারা সেকালে নারীদের পক্ষে যতোটা উচ্চ শিক্ষা করার ব্যবস্থা ছিলো, তা করেছিলেন। বড়ো মেয়ে নলিনী কেমব্রিজের গার্টন কলেজ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস করে সেকালের নিয়ম অনুসারে ডিগ্রির বদলে স্যার্টিফিকেট লাভ করেন। তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবি পাশ করেন। দ্বিতীয় কন্যা সুশীলা কেমব্রিজের নিউয়েনহ্যাম কলেজ থেকে ট্রাইপস করে লন্ডন থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। তৃতীয় কন্যা মিলি ঐ একই কলেজ থেকে ধ্রুপদী বিদ্যায় অনার্স পাশ করেন। এবং চতুর্থ কন্যা জানকীও ঐ কলেজ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস করেন।

উমেশচন্দ্রের মতো তাঁর ব্যারিস্টার বন্ধু মনোমোহন ঘোষও দারুণ পাশ্চাত্য প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতাও হেমাঙ্গিনীর মতোই লেখাপড়া জানতেন না।

কিন্তু ১৮৬৬ সালে দেশে ফিরে আসার পর মনোমোহন তাঁকে কনভেন্টে রেখে লেখাপড়া শেখান। তিনিও জীবনযাত্রায় হেমাঙ্গিনীর মতো আধুনিকা হয়ে উঠেছিলেন। তিনিও শাড়ি ছেড়ে গাউন পরা আরম্ভ করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি একাধিকবার বিলেত ভ্রমণে যান। কিন্তু ঠিক কখন যান, তা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি। প্রথম দিকের আইসিএস কর্মকর্তাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ সবাই ফার্লোর লম্বা ছুটিতে ইউরোপ ঘুরতে যেতেন। সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁদের স্ত্রীদের। তাঁরা কয়েক মাস থেকে বিলেতভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসতেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টান্তগুলো অন্য নারীদের বিলেত যেতে উৎসাহিত করেছিলো।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, আইসিএস প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ১৮৬৩ সালে লন্ডনে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর বালিকাবধূ জ্ঞানানন্দিনীকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে বিলেতে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে পিতাকে পত্র লিখেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, পিতা তাঁকে বিলেতে পাঠাননি। কিন্তু স্ত্রীকে বিলেতে পাঠিয়ে আধুনিকা এবং শিক্ষিতা করে তোলার যে-প্রবল বাসনা সত্যেন্দ্রনাথের ছিলো, তাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পান তিনি পরের দশকে। ১৮৭৭ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি তিন সন্তানসহ গর্ভবতী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলেতে যাওয়ার জাহাজে তুলে দেন। হেমাঙ্গিনীর মতো তিনিও প্রায় অসহায়ভাবে বিলেতে গিয়ে পৌঁছান। এর পর তিনি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে আড়াই বছর কাটিয়ে স্বামী এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।


স্বর্ণলতা ঘোষ

সন্তানদের ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে অন্তত আরও একজন স্ত্রী ও সন্তানদের বিলেতে রেখে এসেছিলেন – তাঁর নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতার স্বামী। কৃষ্ণধন নিজে স্কটল্যান্ড থেকে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন এবং পাশ্চাত্যের ভাবধারা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেশে এসে তিনি ভাগলপুর, রংপুর, খুলনা ইত্যাদি জায়গায় স্যর্জন এবং পরে সিভিল স্যর্জন হিশেবে কাজ করেন।

১৮৭৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি তাঁর তিন পুত্র, এক কন্যা এবং স্ত্রী স্বর্ণলতাকে নিয়ে বিলেতযাত্রা করেন। তখন বড়ো পুত্র – বিনয়েন্দ্রের বয়স প্রায় বারো বছর।

দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহনের বয়স দশ আর তৃতীয় পুত্র অরবিন্দের বয়স সাত বছরের কয়েক মাস কম। এই অরবিন্দই পরে ঋষি অরবিন্দ নামে খ্যাত হন। বিলেতে যাওয়ার কয়েক মাস পরে স্বর্ণলতার আর-একটি সন্তান জন্মে – বারীন্দ্র ঘোষ। এর পর স্ত্রী এবং সন্তানদের লন্ডনের একটি বাড়িতে রেখে কৃষ্ণধন দেশে ফিরে আসেন অগস্ট মাসে।

পরের বছর মার্চ মাসে আবার বিলেতে গিয়ে তিনি স্ত্রী, পুত্র বারীন্দ্র এবং কন্যা সরোজিনীকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। স্বর্ণলতা নিতান্তই পারিবারিক কারণে বিলেতে গিয়েছিলেন। তিনি বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেননি। দেশে ফেরার আগে স্বর্ণলতা প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তবে নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, তাঁর তিন সন্তানই সুশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মধ্যম পুত্র মনোমোহন কবি হয়েছিলেন আর তৃতীয় পুত্র অরবিন্দ ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি নেননি। পরে তিনি ভারতে ফিরে দার্শনিক এবং রাজনীতিক হিশেবে পরিচিত হন। কনিষ্ঠ সন্তান বারীন্দ্রও সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের বড়ো নেতা হিশেবে পরিচিত হন।

আইসিএস কর্মকর্তা, ব্যারিস্টার বা বিলেতফেরত ডাক্তারের স্ত্রী ছাড়া, অথবা খ্রিস্টান অথবা ব্রাহ্ম না-হয়েও যিনি প্রথম বিলেতে যান, তিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস। কমলমণি থেকে আরম্ভ করে সুনীতি দেবী পর্যন্ত যে-বাঙালি নারীরা বিলেতে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাঁদের যাবার কথা জানা গেলেও, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা নিজেরা লেখেননি। সুতরাং জানা যায় না, তাঁরা বিলেত-বাসের ফলে কতোটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী দাস। তাঁর এই অভিজ্ঞতা এবং তা তাঁকে কিভাবে ও কতোটা প্রভাবিত করেছিলো, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি পঞ্চম অধ্যায়ে।

এ পর্যন্ত যে-বাঙালি মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরা কেবল বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বিলেতে যাননি। কিন্তু যতো সময় যেতে থাকলো ইউরোপ ভ্রমণে যাওয়া ততই সহজ হতে থাকলো। তখন আইসিএস কর্মকর্তা এবং ব্যারিস্টারদের স্ত্রীদের ইউরোপ ভ্রমণে যাওয়া ধীরে ধীরে রীতিমতো ফ্যাশনে পরিণত হলো। তাঁরা ছুটি কাটাতে বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন।

এই মহিলারা ছাড়া যাঁরা প্রথম দিকে বিলেত ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহারানি সুনীতি দেবী। তাঁর দুই পরিচয় – একদিকে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব সেনের কন্যা, অন্যদিকে তিনি ছিলেন কুচবিহারের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের স্ত্রী। কুচবিহারের রানি সুবাদেই তিনি মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জুবিলিতে নিমন্ত্রিত হয়ে ১৮৮৭ সালে লন্ডনে যান। রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং কেশব সেন-সহ অনেক ভারতীয় পুরুষেরই দেখা হয়েছিলো। কিন্তু ভারতীয় নারীদের মধ্যে সুনীতি দেবীই প্রথম রানি ভিক্টোরিয়ার দর্শন লাভ করতে সমর্থ হন। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ ছিলো একটি বিরল সম্মান।

আমরা এর আগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের দুই কন্যার কথা উল্লেখ করেছি। এঁদের নাম ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা। রানি ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রাসাদে অন্যদের সঙ্গে এঁদেরও নিমন্ত্রণ করেছিলেন ১৮৮০ সালের প্রথম দিকে। তাঁরা শাড়ি পরে সে সভায় উপস্থিত হন এবং রানি ভিক্টোরিয়া তাঁদের দেখে খুশি হন।[৫] তাঁরা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবার আগে রানিকে দেখার সুযোগ পেলেও তাঁদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁদের একেবারে বাল্যকাল থেকেই তাঁরা লন্ডনে স্থায়িভাবে বাস করতেন। দেশ থেকে গিয়ে তাঁরা রানির সাক্ষাৎ লাভ করেননি। অপর পক্ষে, বঙ্গদেশ থেকে যে-নারী নিমন্ত্রিত হয়ে লন্ডনে গিয়ে রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে সবার আগে দেখা করেন, তিনি সুনীতি দেবীই।



সুনীতি দেবী

রানি ভিক্টোরিয়া সুনীতি দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁকে একটি সম্মানসূচক উপাধিও প্রদান করেন। আর, সুনীতি দেবী বিলেতে গিয়ে এতোই আনন্দ লাভ করেছিলেন যে, এবারের সফরের পরেও তিনি একাধিকবার বিলেতভ্রমণে গিয়েছিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত যে-বিলেতফেরত নারীদের লক্ষ করেছি, তরু আর অরু দত্ত ছাড়া তাঁদের অন্যরা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতের পথে পা বাড়াননি। তার সূচনা লক্ষ করি শতাব্দীর শেষ দশকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সম্ভবত কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। কেবল এই দৃষ্টান্ত স্থাপন নয়, অন্য একাধিক বিষয়ে তিনি নজির রেখেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম গ্রহণের পর ১৮৭৮ সালে কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসুই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীদের মধ্যে সবার আগে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৩ সালে তাঁরা আর-একটি নতুন মাইল-ফলক স্থাপন করলেন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আইনত প্রথম গ্রাজুয়েট হয়ে।

গ্রাজুয়েট হবার ফলেই কাদম্বিনী অতঃপর কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু মেয়েদের চিকিৎসা বিদ্যায় ভর্তি হবার বিরোধিতা করেছিলেন কলেজের একাধিক অধ্যাপক। তাঁদের যুক্তি ছিলো : চিকিৎসা বিদ্যা এমন একটি বিষয় যে, মেয়েদের উপস্থিতিতে তাঁরা সবকিছু খোলাখুলি পড়াতে স্বস্তি বোধ করবেন না। এই অধ্যাপকদের একজন ছিলেন কাদম্বিনীর পরীক্ষক। অন্য সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হলেও, এই পরীক্ষক তাঁকে এক মার্ক কম দিয়ে উত্তীর্ণ হতে দেননি। ফলে আইনত কাদম্বিনী এমবি পাশ করতে পারেননি। অধ্যাপকরা তাঁকে গ্রাজুয়েট মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল - জিএমসিবি - উপাধি দেওয়ার সুপারিশ করেন।

এর পর তিনি চিকিৎসাজীবী হিশেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্র্যাক্টিসও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী নারীদের প্রতি রক্ষণশীল পুরুষসমাজের বিরোধিতা এবং বিদ্বেষ থেকে তিনি রক্ষা পাননি। তিনি যে এমবি পাশ করেননি এবং তিনি যে নারী - এই উভয় দিক নিয়েই তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা চলতে থাকে। ১৮৯১ সালে বঙ্গবাসী পত্রিকাগোষ্ঠীর সাপ্তাহিক পত্রিকা বঙ্গনিবাসী কাদম্বিনীর চরিত্র খারাপ বলে কুৎসা প্রচার করে। কাদম্বিনীর স্বামী দ্বারকানাথ এতে মানহানির মামলা করেন। মামলায় পত্রিকার সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের শাস্তি হয় এক শো টাকা জরিমানা এবং ছ মাসের কারাদণ্ড।

পত্রিকা-সম্পাদকের শাস্তি হওয়ায় কাদম্বিনী চরিত্রহানির অপবাদ থেকে রক্ষা পান। কিন্তু তিনি যে যথার্থই যোগ্য এবং পরীক্ষায় পাশ করে ডাক্তার হয়েছেন - এটা প্রমাণ করার দরকার ছিলো। তিনি চাইলেন, বিলেতে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যার উপাধি নিয়ে তিনি প্রমাণ করবেন যে, তিনি কারও দয়ায় চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হননি এবং তিনি কারও থেকে ছোটোও নন। কিন্তু বিলেত যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ ছিলো না। ১৮৯৩ সালে তাঁর পাঁচটি সন্তান ছিলো। তাদের দেখাশোনা করা একটা

বিরাট সমস্যা ছিলো। তদুপরি, বিলেতে যাওয়ার জন্যে যে টাকাপয়সা দরকার ছিলো, তাও তাঁর অথবা তাঁর স্বামীর ছিলো না। ফলে তিনি এক ভদ্রমহিলার সহকারী হিশেবে জাহাজে উঠলেন। তা ছাড়া, শিকাগোতে অনুষ্ঠিতব্য একটি প্রদর্শনীতে বঙ্গরমণীদের হাতের কাজ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে তিনি কিছু অর্থ পান।


কাদম্বিনী গাঙ্গুলি

বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি জাহাজে চড়েন ১৮৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তিনি সেখানে পৌঁছান ২৩শে মার্চ। পরীক্ষা দেওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিলেন। এতে তাঁকে মনোমোহন ঘোষ–সহ আরও কয়েকজন বাঙালি সাহায্য করেছিলেন। তখনকার স্কটল্যান্ডের নিয়ম অনুসারে তিনি একত্রে তিনটি ডিপ্লোমা লাভের জন্যে পরীক্ষা দেন। ফলে জুলাই মাসে তিনি এডিনবরা, গ্লাসগো এবং ডাবলিন থেকে মেডিসিন এবং সার্জারিতে লাইসেনশিয়েট ডিপ্লোমা লাভ করেন। এর পর যামিনী সেন–সহ আরও বঙ্গমহিলা বিলেতে গিয়েছিলেন ডাক্তারিতে উচ্চতর পদবি নেওয়ার জন্যে। কিন্তু কাদম্বিনীই পথ দেখিয়েছিলেন।

বাঙালি মহিলাদের মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী সবার আগে ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন ইংল্যান্ড দেখে। তারপর গত সওয়া শো বছরে হাজার হাজার বাঙালি নারী ইংল্যান্ড ভ্রমণে এসেছেন। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লেখেননি বলতে গেলে কেউই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে জগৎমোহিনী চৌধুরী যে তাঁর বিলেতভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা গ্রন্থাকারে লিখেছিলেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণে এসেছিলেন কৃষ্ণভাবিনীর পরের দশকে – ১৮৯৪ সালে। তাঁর এই ভ্রমণের কথা তিনি বেশ বিস্তারিতভাবে লিখেছেন তাঁর *ইংলণ্ডে সাত মাস* গ্রন্থে।[৬]

তিনি ইংল্যান্ডের উদ্দেশে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন ১৮৯৪ সালে ১৩ মার্চ তারিখে, আর লন্ডনে পৌঁছান পরের মাসের ১৪ তারিখ। তিনি ছিলেন দেশীয়

খ্রিস্টান। মুগ্ধতা নিয়েই তিনি যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। প্রথমেই খ্রিস্টধর্মের প্রশংসা করে লিখেছেন, 'ইংলণ্ডের উন্নতির মূল খ্রীস্টীয় ধর্ম্ম। ... খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ও বাইবেল শাস্ত্র এ দেশে প্রচারিত হওয়া অবধি অনেক চিন্তাশীল বঙ্গবাসী তাহা গ্রহণ করিয়া চিত্তের বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিয়াছেন।' বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই যে, তিনি লন্ডন নগরী দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। 'ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরকে একটি ছোটখাট জগৎ বলিলে কোনক্রমে অত্যুক্তি হয় না। তাহার সীমা পরিসীমার ইয়ত্তা করা যায় না।' তিনি যখন লন্ডন শহরে গিয়েছিলেন, তখনও মোটরগাড়ি ছিলো না। তা সত্ত্বেও তিনি নাকি কোনোদিন একা রাস্তা পার হতে পারেননি, যদিও সময়ে সময়ে প্রাণ হাতে লইয়া দৌড় দিতেন।

ইংরেজ নারীদের দেখে তিনি তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁরা যে অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত তারও প্রশংসা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেয়েরা যে পোস্ট অফিসে কাজ করেন, জগৎমোহিনী তার উল্লেখ করেছেন। সেখানকার নারীরা যে শিক্ষিত, তা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। লিখেছেন যে, নারীরা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। দেশীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ইংরেজ নারীদের তুলনা করে লিখেছেন যে, ইংরেজ নারীরা স্বাবলম্বী। অপর পক্ষে, দেশের বহু শিক্ষিত নারীও অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকেন, তবু স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করেন না।

লন্ডন নগরীর সৌন্দর্য, নানা পার্ক এবং দ্রষ্টব্য স্থান সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। খাওয়াদাওয়ার কথাও বাদ দেননি। বই শেষ করেছেন শুরুর মতোই – খ্রিস্টধর্মের প্রশংসায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

> 'বিদেশী ইংরেজরা আমাদিগকে ঘৃণা ও তুচ্ছ করেঃ এ ভাবটী বাঙ্গালীর মনে প্রবল, এবং তাহা প্রবল হইবার কারণও বিস্তর আছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন হওয়া অবধি ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের আচার ব্যবহার, কাজকর্ম্মে বাঙ্গালীদের মনে এই ভাবটী অঙ্কিত করিয়াছে। .... বাঙ্গালীকে নেটিভ বলিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা যীশুর শিষ্যের ভাব নয়, এবং সেই ৭ মাসের মধ্যে কোথাও আমি এ ভাবের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।'

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বিলেতগামী বাঙালি নারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তা এর আগেকার অসাধারণত্ব অনেকটা হারিয়ে ফেলে। এর পর নারীরা কেবল পর্যটনের উদ্দেশ্যেই ইউরোপ ভ্রমণে যাননি। লেখাপড়ার জন্যেও অনেকে যেতে আরম্ভ করেন। শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাসসুন্দরীর মধ্যে যে-পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীকে দেখতে পাই, শতাব্দীর শেষে সেই বিহঙ্গীর দিগন্ত ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাই। বস্তুত, বাঙালি নারীরা এক শতাব্দীর মধ্যে প্রগতির পথে হাজার হাজার মাইল অগ্রসর হয়েছিলেন। লোকাচার অগ্রাহ্য করে লেখাপড়া শেখা, অবরোধ ভাঙা, গাড়ি ও ঘোড়ায় চড়া, মঞ্চে অভিনয় করা, বেতন নিয়ে চাকরি করা, ডাক্তারি করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ সামগ্রিকভাবে বাঙালি নারীদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সোপানের মতো ভূমিকা পালন করেছিলো। যে-নারীরা সাহস করে

এসব লোকাচার ভঙ্গ করেননি, তাঁরাও এসব দৃষ্টান্ত দেখে বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন। বাঙালি নারীদের বিলেত ভ্রমণও এমনি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিশেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

---

১ রামকুমার চন্দ্র, *দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম* (কলিকাতা : লেখক, ১৮৬৩)।

২ বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য আমার *কালাপানির হাতছানি : বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* (ঢাকা : অবসর, ২০০৮).

৩ Sir A. R. Bonerji. *An Indian Pathfinder: Memoirs of Sevabrata Sasipada Bonerji* (2nd ed.; Calcutta: Sadharan Brahmo Samaj. 1973).

৪ Janaki Agnes Penelope Majumdar (nee Bonnerjee). *Family History* (Delhi: Oxford University Press, 2003).

৫ 'বঙ্গবালার মহারানি ভিক্টোরিয়া দর্শন', বামাবোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১২৮৭।

৬ জগৎমোহিনী চৌধুরী, *ইংলণ্ডে সাত মাস* (কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯০২)।

৭

পথিকৃৎ অভিনেত্রী

সুকুমারী থেকে সুচিত্রা

১৮১৯ সালে রামমোহন লিখেছিলেন যে, মহিলাদের মেধা বা বুদ্ধি আছে কিনা, পুরুষরা তার কোনো পরীক্ষা নেননি। তা সত্ত্বেও মহিলাদের তাঁরা নির্বোধ বলে সাব্যস্ত করেন এবং মনে করেন যে, তাঁদের লেখাপড়া শেখার মতো ক্ষমতা নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার এই প্রবণতা অবাঞ্ছিত হলেও অপ্রত্যাশিত ছিলো না – বিশেষ করে যে–সমাজে নিন্দার্থে 'স্ত্রীবুদ্ধি' বলে একটা কথা চালু ছিলো (এখনো আছে প্রচ্ছন্নভাবে)। লেখাপড়া শেখার মতো ক্ষমতা যার নেই, তার পক্ষে অভিনয় করা আরও শক্ত হবে – এটা স্বাভাবিক। সে জন্যে উনিশ শতকের প্রথম দিকের লোকেরা ভাবতেই পারতেন না যে, মেয়েরা অভিনয় করতে পারেন অথবা পারবেন।

এ ধারণা যে কেবল উনিশ শতকের, তা নয়। এর বেশ কয়েক শতাব্দী আগে চৈতন্যদেবের সময়কার কথা ধরলেও, পুরুষ সমাজের একই ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, চৈতন্যদেব নিজে মেয়েদের কিছু অধিকার এবং সম্মান দিয়েছিলেন। তাঁর অনেক মহিলা শিষ্যও ছিলেন। কিন্তু তবু 'নাটক' অভিনয়ের সময়ে তিনি নিজে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, মেয়েদের অভিনয় করতে ডাকেননি।

নারীদের প্রতি এই অবজ্ঞার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিলো এর প্রায় তিন শতাব্দী পরে। তখন এক রুশ পণ্ডিত কলকাতায় ছিলেন। নাম গেরেশিম লেবেদেফ। তাঁর পেশা যা–ই হোক না কেন, নেশা ছিলো নাটকের। তিনি বাংলা ভাষা শিখে ইংরেজি থেকে একাধিক নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তারই একটি নাটক – কাল্পনিক সংবদল – তিনি কলকাতায় একাধিক বার মঞ্চস্থও করেছিলেন ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ সালে। এই নাটকে একাধিক স্ত্রীচরিত্র ছিলো। এই চরিত্রে অভিনয় করানো নিশ্চয়ই একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু এর সমাধান করেছিলেন তাঁর বাংলার শিক্ষক গোলোকনাথ দাস। তিনি স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করার জন্যে একাধিক অভিনেত্রী জোগাড় করে দিয়েছিলেন।

এই নাটক প্রথমবার অভিনীত হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে আর দ্বিতীয় বার অভিনীত হয় চার মাস পরে ২১শে মার্চ তারিখে। খবরের কাগজ থেকে জানা যায় যে, দুবারই তাঁর থিয়েটার দর্শকে ভরে গিয়েছিলো। তার অর্থ : এই নাটকের অভিনয় বেশ সফল হয়েছিলো। মহিলারাও হয়তো ভালো অভিনয়ই করেছিলেন। এতে যে–মহিলারা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বাইজি অথবা ঐ শ্রেণীর মহিলা। তথাকথিত ভদ্রমহিলা নন।

আঠারো শতকের শেষ দিকে কলকাতায় থিয়েটার আদৌ অপরিচিত ছিলো না, কারণ ১৭৫০–এর দশকেই কলকাতায় থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিলো। তার পর ১৮০০ সালের আগেই সেখানে একাধিক ইংরেজি থিয়েটার চালু হয়েছিলো। সেই থিয়েটারে অভিনয় করার জন্যে বিলেত থেকে ছোটো–খাটো অভিনেতা–অভিনেত্রীও এসেছিলেন। এই পরিবেশে লেবেদেফ যে–উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিলো ভোর রাতে যে–পাখি ডাকে, তার মতো। এই পথিকৃৎ তাঁর ভূমিকা পালন করার পর বহু বছর তাঁর মতো কোনো বিদেশী অথবা দেশী বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয় করানোর উদ্যোগ নেননি। কলকাতায় থিয়েটারে বাঙালি দর্শক যেতেন – সে খবর জানা গেলেও, কোনো বাঙালি পৃষ্ঠপোষক বাংলা ভাষায় নাটক লিখিয়ে অথবা কোনো যাত্রার পালাকে নাটকের রূপ দিয়ে, তা অভিনয় করানোর চেষ্টা করেননি। তাই বলে বাঙালি সমাজ এ বিষয়ে চিরকাল ঘুমিয়ে থাকতে পারেনি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অভিনয় করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে। তবে তখন নারীচরিত্রে কোনো মহিলা অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায় না।

অপর পক্ষে, এর চার বছর পরে – ১৮৩৫ সালের অক্টোবর মাসে – নবীনচন্দ্র বসু নামে একজন ধনীর উদ্যোগে শ্যামবাজারে বিদ্যাসুন্দরের যে–অভিনয় হয়েছিলো, তাতে একাধিক মহিলা অভিনয় করেছিলেন। এঁই অভিনেত্রীদের মধ্যে দুজনের নামও জানা গেছে – রাধামণি আর জয়দুর্গা। রাধামণি অভিনয় করেছিলেন বিদ্যার ভূমিকায়। ষোলো–সতেরো বছর বয়সী এই মেয়েটি অভিনয় এবং গানে এতো পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁর খুব প্রশংসা করা হয়েছিলো। তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে একটি পত্রিকায় এও লেখা হয়েছিলো যে, তাঁর অভিনয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা যথেষ্ট মেধার অধিকারী।

১৮২০ এবং ৩০–এর দশক পর্যন্ত যৌনকর্মীদের প্রতি সমাজের মনোভাব আদৌ কঠোর ছিলো না। বিশেষ করে ধনীদের পক্ষে বাগানবাড়িতে রক্ষিতা রাখা নিন্দার বিষয় তো নয়ই, বরং রীতিমতো সমাজস্বীকৃত বিষয় ছিলো। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন যে, রক্ষিতা নিয়ে অনেকে বড়াই এবং অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। এ সময়ে অন্য কেউ এ রকমের নারীদের নিয়ে অভিনয় করতে চাইলে, সমাজে তাই নিয়ে সমালোচনা হতো বলে মনে হয় না। কিন্তু ১৮৩৫ সালের পর বাইশ–তেইশ বছরের মধ্যে কোনো বাংলা নাটক অথবা যাত্রা অভিনীত হয়েছিলো বলে জানা যায় না। তাই মহিলারা অভিনয় করতে পারেন কিনা, সে পরীক্ষার সুযোগ ঘটেনি।

বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয় ১৮৫০-এর দশকে। এর একটা বড়ো কারণ : ১৮৫২ সাল থেকে বাংলা নাটক প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু ততো দিনে রক্ষিতা এবং যৌনকর্মীদের প্রতি সমাজের মনোভাব কঠোর হতে আরম্ভ করেছিলো। সে জন্যেই রাধামণির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও অভিনয় করার জন্যে নারীদের আর ডাক পড়েনি। ১৮৫৭ সাল থেকে কুলীনকুলসর্বস্ব, বিধবাবিবাহ, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী ইত্যাদি নাটকের নারীচরিত্রে অভিনয় করেছেন পুরুষরা। এমন কি, 'সাহেব' মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ১৮৫৮ সালে নাটক লিখতে শুরু করলেন, তখনো তিনি নারীদের নিয়ে আসতে পারলেন না। আশ্চর্য নয়, বাংলা নাটককে তিনি অলীক কুনাট্য বলে নিন্দা করেছিলেন।

নারীচরিত্রে অভিনয়ের জন্যে যৌনকর্মী-বাইজি ছাড়া, অন্য মহিলাদের পাওয়া যেতো না। আর তাঁদের সম্পর্কে সমাজের মনোভাব ছিলো কঠোর। সে জন্যে নাট্যকারদের এমনভাবে নাটক লিখতে হতো, যাতে নারীচরিত্র কম থাকে। কৃষ্ণকুমারী লেখার সময়ে মাইকেল নানা রকম যোগবিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত চারটি নারীচরিত্র রেখেছিলেন। কারণ তিনি চারজন পুরুষকে চিনতেন, যাঁরা এই চরিত্রে অভিনয় করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি অভিনেত্রী জোগাড় করতে সক্ষম হননি, অথবা বাংলা রঙ্গমঞ্চে নারীচরিত্রে মহিলাদের অভিনয় করতেও দেখেননি। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর ঠিক আগে সামান্য টাকার জন্যে তিনি যখন বেঙ্গল থিয়েটারের ফরমায়শে মায়াকানন নাটকের ডিকটেশান দেন, তখনো শরৎচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন যে, অভিনেত্রী ছাড়া নাটকের সফল অভিনয় হতে পারে না, অথবা অভিনয়ের উন্নতিও নয়। অনেকটা তাঁর উৎসাহে শরৎচন্দ্র অভিনেত্রী নিয়ে এসেছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে। কিন্তু তাঁর মাস দেড়েক আগেই – ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন – মাইকেল শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

আসলে, বাঙালি সমাজে কেবল নারীপুরুষ বিচারে দ্বৈত মান দেখা যায় না; নারীদেরও দু ভাগে ভাগ করে দেখেছে এ সমাজ। ঘরের নারী আর বাইরের নারী। পুরুষরা আশা করতেন ঘরের নারীরা হবেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো, বন্দী থাকবেন অন্তঃপুরে। তাঁরা থাকবেন অকলঙ্কিত সতী-সাধ্বী। তাঁরা সন্তান জন্ম দেবেন, তাদের লালনপালন করবেন। ঘরের কাজ করবেন। আর, রাতের বেলা স্বামী যদি বাগানবাড়িতে না-থেকে নিজের বাড়িতে থাকেন, তা হলে মুখ বুজে তাঁকে শারীরিক সুখ দেবেন। শীৎকার কথাটা প্রযোজ্য ছিলো বেশ্যাদের জন্যে, ভদ্রমহিলাদের জন্যে নয়। তাঁরা লাজনম্র হবেন। যৌনসুখও নীরবে উপভোগ করবেন। তাঁরা প্রিয়া নন, তাঁরা সন্তানের জননী।

অপর পক্ষে, বিনোদন এবং নিজেদের উপভোগের জন্যে পুরুষরা যেতেন বাইরের নারীদের কাছে। তাঁরা আশা করতেন এই নারীরা নাচ-গান জানবেন, এবং সম্ভব হলে, খানিকটা লেখাপড়াও জানবেন। সেই সঙ্গে তাঁরা হবেন চালাক-চতুর; বেশভূষায় স্মার্ট; যৌনকর্মে নানা সূক্ষ্ম কৌশলের অধিকারী। সবচেয়ে বড়ো কথা, এঁরা

কর্তার মনোরঞ্জন করবেন। এই নারীদের মধ্যে অনেকেই প্রচলিত অর্থে যৌনকর্মী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন রক্ষিতা। বাবুরা রক্ষিতা রাখতেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হতো না বলে সে সম্পর্ক তৈরি করতেন এই রক্ষিতাদের সঙ্গে। রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় সবচেয়ে নাম-করা বাইজি ছিলেন নিকি। সাহেব-মেম সাহেবরাও তাঁর সৌন্দর্য এবং গুণের প্রশংসা করেছেন। সেকালের এক লাখ টাকা দিয়ে এক বাবু তাঁকে রক্ষিতা রেখেছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম হতো না, তাঁদের প্রত্যাশিত ভূমিকা ছিলো কেবল পুত্র জন্ম দেওয়া (কন্যাও হতো, কিন্তু তাতে স্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হওয়া ছাড়া কর্তারা আর-কিছুই হতেন না)। বস্তুত, যৌনতার ব্যাপারে এই আশ্চর্য রকমের দ্বৈতমান এবং ভণ্ডামি ছিলো পুরুষ সমাজের। তাঁরা স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের উপভোগ করলে, 'অসৎ' বলে তাঁদের অখ্যাতি হতো না, কিন্তু মেয়েরা অন্যের ছায়া মাড়ালেও অসতী বলে কলঙ্কিত হতেন। সে জন্যেই, অভিনয়ের জন্যে যখন নারীদের প্রয়োজন হলো তখন ঘরের মেয়েরা নন, বাইরের মেয়েদের, 'খারাপ মেয়েমানুষ'দের ডাক পড়লো সে কাজে।

১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার মহিলাদের মঞ্চে নিয়ে এসে বাংলা নাটক বিকাশ লাভের পথ প্রশস্ত করেছিলো। কিন্তু তখন মহিলাদের অভিনয়ে মস্ত দুটি বাধা ছিলো। একদিকে, অভিনয় করতে জানতেন, এমন মহিলা ছিলেন না – কারণ তাঁরা কোনো কালে অভিনয় করেননি। তা ছাড়া, দর্শকরা মঞ্চে মহিলাদের দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অনেকে দেখতে চাইতেনও না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কেবল সমাজসংস্কারক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নারীদরদী এবং মহিলাদের উন্নতি চাইতেন আন্তরিকভাবে। দুজনই অভিনয় দেখতেও ভালোবাসতেন। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার অভিনেত্রীদের নিয়ে আসার পর এঁরা আর কোনোদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যাননি। সে যুগের বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনও ছিলেন এঁদের মতো। তিনিও মহিলাদের উন্নতি চাইতেন। মেয়েদের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো তাঁর। এমন কি, নিজে নাটকে অভিনয়ও করেছেন। কিন্তু ১৮৭৯ সালে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মহিলাদের নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন তাঁর সুলভ সমাচার পত্রিকায়। বলা বাহুল্য, এই সমাজ-সংস্কারকদের মতো অন্য অনেক দর্শকেরও মহিলাদের অভিনয়ের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব ছিলো।

দুই

নারীদের দিয়ে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করানোর উদ্যোগ নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার রীতিমতো অভিনয়ের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলো। গোড়াতে এই থিয়েটার যে-চারজন অভিনেত্রী জোগাড় করতে পেরেছিলো, তাঁরা হলেন জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী এবং শ্যামা। অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলো

না এঁদের। এমন কি, লেখাপড়াও জানতেন কিনা, সন্দেহ হয়। কিন্তু কমবেশি নাচ–গান জানতেন সবাই। জীবিকার প্রয়োজনেই এঁরা ছেলেবেলা (অথবা মেয়েবেলা) থেকে নাচ–গান শিখতেন, কারণ এঁরা ছিলেন রূপোপজীবিনী। একে মহিলাদের মঞ্চে নিয়ে আসা, তদুপরি সেই মহিলারা আবার রূপোপজীবিনী – এই দুই কারণে পুরুষ–পরিচালিত অনেক পত্রপত্রিকাই বেঙ্গল থিয়েটারের তীব্র সমালোচনা করেছিলো।

একটি পত্রিকা বেঙ্গল থিয়েটারের সমালোচনা করে বলেছিলো যে, এঁরা 'বেশ্যা'দের মঞ্চে এনে নাটককে যাত্রার স্তরে নামিয়েছেন। তার মানে তখন নাটক এবং যাত্রারও বড়ো রকমের পার্থক্য ছিলো। নাটক ছিলো শিক্ষিত ভদ্রলোকদের, ধনী বাবুদের। আর, নাচগান–ভরা যাত্রা ছিলো সাধারণ মানুষদের। আশা করা হতো পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকের রুচি হবে যাত্রার চেয়ে উন্নত মানের। ভদ্রলোকদের মঞ্চে তাই প্রথম পনেরো–ষোলো বছর অভিনেত্রীদের ডাক পড়েনি। কিন্তু অভিনেত্রীরা যাত্রায় অংশ নিতেন। সমাজের এই মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে অভিনেত্রীদের মঞ্চে নিয়ে এসে বেঙ্গল থিয়েটারের অধিকারী শরৎচন্দ্র ঘোষ যে–ভূমিকা পালন করেছিলেন তা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে তিনি যে–সৎসাহস দেখিয়েছিলেন, তা কতো অসাধারণ, তা বোঝা যায় আরও ৪০ বছর পরের একটি ঘটনা থেকে। ১৯১৩ সালে যখন দাদাসাহেব ফালকে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তখনো নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে নিতে হয়েছিলো রেস্টুরেন্টের এক পুরুষ রাঁধুনিকে। আর, ঢাকায় পূর্ববঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালেও বেদের মেয়ে নাটক করার অনুমতি দিয়েছিলো এই শর্তে যে, তাতে কোনো মহিলা অভিনয় করতে পারবেন না। এ দিক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্র ঘোষ রীতিমতো বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তবে স্বীকার না–করে উপায় নেই যে, ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পর নারীচরিত্রে মহিলাদের অভিনয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। অভিনেত্রীদের প্রতি প্রথম দিকে সমাজের মনোভাব যেমনই হোক না কেন, নারীদের বাদ দিয়ে থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হতো। আগে হোক পরে হোক, মহিলারা আসতেনই! বেঙ্গল থিয়েটারের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এই থিয়েটার যে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো তার অন্যতম কারণ অভিনেত্রীদের নিয়োগ।

পুরুষদের দিয়ে নারীচরিত্রের অভিনয় অস্বাভাবিক এবং অনাকর্ষণীয়। সে জন্যে, পেশাদার থিয়েটারের বাইরেও ধীরে ধীরে নারীরা অভিনয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন, অথবা তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছিলো। ১৮৮০–এর দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের উদ্যোগে তাঁদের বাড়ির নিজস্ব মঞ্চে যেসব অভিনয় হয়, তাতেও পরিবারের মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন, যদিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'ভদ্রমহিলাদের' অভিনয় অর্থাৎ অপেশাদার অভিনেত্রীদের আগমন পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেও হয়নি।

তিন

মহিলারা অভিনয় করার শিক্ষা না–পেলেও, তাঁদের যে অভিনয় করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিলো, তা অচিরেই প্রমাণিত হয়েছিলো। বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বিতীয় অভিনয়ে – ২৩শে অগস্ট ১৮৭৩ তারিখে – যোগ দিয়েছিলেন গোলাপসুন্দরী। তিনি ভালো গান জানতেন, বিশেষ করে কীর্তন গান। অল্পকালের মধ্যেই তিনি অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। নানা ধরনের ভূমিকায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বেঙ্গল থিয়েটারে তখন কাজ করতেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। তিনি গোলাপসুন্দরীকে অভিনয় শিখিয়ে ভালো অভিনেত্রীতে পরিণত করেন। গোলাপসুন্দরী আগাগোড়া বেঙ্গল থিয়েটারে কাজ করেননি, তিনি পরে অন্য একাধিক থিয়েটারেও অভিনয় করেছিলেন।

তিনি যেসব নাটকে অংশ নেন, তার মধ্যে একটি ছিলো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ–সরোজিনী। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে অভিনীত এই নাটকে তিনি সুকুমারী নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এতো সুন্দর হয়েছিলো যে, দর্শকরা তাঁর নামই দেন সুকুমারী। অতঃপর এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত হয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ দাস তখন এই থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে এক তরুণ। গোলাপসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। তারপর থেকে গোলাপসুন্দরীর নাম হয় সুকুমারী দত্ত। ভদ্রলোকের ছেলে বিয়ে করেছেন এক প্রাক্তন রূপোপজীবিনীকে – এই ঘটনাকে ঘিরে সমাজে গোষ্ঠবিহারীর এতো সমালোচনা হয়েছিলো যে, তিনি সুকুমারীকে ফেলে রেখে কেবল কলকাতা থেকে নয়, দেশ থেকেই পালিয়ে যান। জাহাজের খালাশি হয়ে তিনি চলে যান বিলেতে। ওদিকে, সুকুমারী এই থিয়েটারে তাঁর অভিনয় করার কাজ বহাল রাখেন। আর্থিক কারণেই তিনি দীর্ঘদিন অভিনয় চালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

স্বামী পালিয়ে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যে (অগস্ট ১৮৭৫) অপূর্ব সতী নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয় এবং তার পর–পরই তা সফলভাবে অভিনীত হয়। দর্শকরা প্রচুর প্রশংসাও করেছিলেন এ নাটকের। এই নাটকের রচয়িতা হিশেবে নাম আছে দুটি – আশুতোষ দাস এবং সুকুমারী দত্ত। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে, এ নাটক সুকুমারীর নিজের রচনা নয়। এ বই–এর নামপত্রে আশুতোষ দাসের যে নামটি আছে, সুকুমার সেনের মতে, সেটিও ছদ্মনাম। এই নাটকের আসল লেখক উপেন্দ্রনাথ দাস। এ নাটকের ভাষা এতো আড়ষ্ট এবং সংস্কৃত–প্রভাবিত যে, এটি অশিক্ষিতা অথবা সামান্য শিক্ষিতা অভিনেত্রীর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিলো বলে তিনি মনে করেন না।

তবে এ নাটকের কাহিনীর সঙ্গে সুকুমারীর নিজের প্রথম জীবনের অনেকটাই মিল ছিলো। এ নাটকের নায়িকা নলিনী তাঁরই মতো সামান্য লেখাপড়া জানে, এবং

তার মা বারবনিতা। সেও সুকুমারীর মতো প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু মুখোমুখি হয় প্রবল বাধার। এর ফলে নায়িকা নলিনী আত্মহত্যা করে প্রাণ জুড়ায়। নাটকের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য এই যে, সুকুমারী স্বামীপরিত্যক্ত হয়ে আত্মহত্যা করেননি, বরং প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকেন।

অভিনয় করতে করতে ১৮৮৩ সালে সুকুমারী শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে হিন্দু ফিমেল থিয়েটার নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সেখানে শুম্ভসংহার নামে একটি নাটক অভিনয় করান। ১৮৯৮ সালেও তিনি বেঙ্গল এবং মিনার্ভা থিয়েটারে একাধিক নাটকে অভিনয় করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পুরুবিক্রমে রানি ঐলবালা; সরোজিনীতে সরোজিনী; অশ্রুমতীতে মলিনা; উপেন্দ্রনাথের সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে বিরাজমোহিনী; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা; মৃণালিনীতে গিরিজায়া এবং বিষবৃক্ষে সূর্যমুখী চরিত্রে তাঁর অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছিলো।

চার

গোলাপসুন্দরী বেশ খ্যাতি লাভ করলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন বিনোদিনী। তিনি গোলাপসুন্দরীর প্রায় দেড় বছর পরে – ১৮৭৪ সালের শেষে – ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মতে, তাঁর বয়স তখন মাত্র দশ বছর। কিন্তু আসলে তাঁর বয়স তখন এগারো, এমন কি, বারো অথবা তেরো/চোদ্দো হওয়া সম্ভব। কারণ, উপেন্দ্রনাথ অন্যত্র লিখেছেন, বিনোদিনী জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৮৬৩ সালে। তিনি যখন এই থিয়েটারে যোগদান করেন, তখন তিনি অভিনয়ের কথা জানতেন না। তিনি নিজেই লিখেছেন যে, অভিনয় সম্পর্কে তখন তাঁর বিন্দুবিসর্গ জ্ঞান ছিলো না। এমন কি, তিনি কোনো দিন অভিনয় দেখেনওনি। তারপর সেই অজ্ঞ বালিকা কী করে কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম মঞ্চে আবির্ভূত হলেন এবং অল্পকালের মধ্যে অভিনয়কলায় উৎকর্ষ লাভ করেন – তা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার থেকেও বিস্ময়ের বিষয় : তিনি মঞ্চ থেকে সরে যাওয়ার পর সওয়া শো বছর চলে গেছে, কিন্তু অভিনেত্রী হিশেবে তাঁর খ্যাতি আজও উজ্জ্বলভাবে টিকে আছে। অভিনয় জগতে তাঁর উত্থান চড়াই–উৎরাইতে পরিপূর্ণ এবং অতিনাটকীয়। আসলে তিনি ছিলেন সহজাত প্রতিভার অধিকারী। সেই কারণেই, তিনি যা হয়েছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছিলো।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁকে দেখেছিলেন; তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবরও নিয়েছিলেন। তিনি বিনোদিনীর একটা আনুমানিক জন্মসময় দিয়েছেন, যা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর মতে, বিনোদিনীর বংশপরিচয় সঠিকভাবে জানা যায় না। বিনোদিনী নিজেও তাঁর পিতৃপরিচয় দিতে পারেননি। পাঁচ বছর বয়সে যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো, তার নাম অথবা পরিচয়ও দিতে পারেননি। তবে তিনি সাধারণ

গৃহস্থ পরিবারের সন্তান ছিলেন না। তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। তাঁদের বাড়ির খোলাঘরে যেসব ভাড়াটে ছিলেন, তাঁদের ভাড়া দিয়েই সংসার চলতো। এই ভাড়াটেরা স্বামীস্ত্রীর মতো বসবাস করলেও বিবাহিত ছিলেন না – বিনোদিনী নিজেই আত্মজীবনীতে এ কথা লিখেছেন। বিনোদিনীর পরিবারও হয়তো সে ধরনের পরিবারই ছিলো। তিনি নিজেও সবিনয়ে অনেকবারই নিজেকে বারনারী ও বারাঙ্গনা বলেছেন।


বিনোদিনী

তিনি লিখেছেন যে, ছেলেবেলায় তিনি অবৈতনিক স্কুলে কিছুকাল লেখাপড়া শিখেছিলেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এক সময়ে তিনি সামান্য ইংরেজিও শিখেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে বিনোদিনী ইংরেজি শব্দ এবং উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার বিষয়টি অতো গুরুত্বপূর্ণ নয়, লেখাপড়া দিয়ে তিনি খ্যাতিও অর্জন করেননি। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর অভিনয় আর গানের জন্যে। কিভাবে তিনি এই দুই বিদ্যালাভ করেন, বরং সে দিকে খানিকটা দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

তাঁর বয়স যখন প্রায় দশ, তখন তাঁদের বাড়িতে ভাড়াটে হিশেবে আসেন গঙ্গামণি নামে এক বাইজি। পরে তিনি অভিনেত্রী হিশেবেও নাম করেছিলেন। সুন্দর গান জানতেন তিনি। তাঁকে গান শেখাতেও আসতেন একজন ভদ্রলোক। সেই গঙ্গামণির কাছ থেকেই বিনোদিনী গান শেখেন। বেশি কাল শিখেছিলেন বলে মনে হয় না অথবা কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শিখেছিলেন, তারও উল্লেখ নেই। আসলে তাঁর গলা ছিলো অসাধারণ সুরেলা, এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ – তাঁর ছিলো সত্যিকার সঙ্গীতের প্রতিভা। অনুমান করি, কেবল গঙ্গামণি নন, অভিনয়জীবনে তিনি নানাজনের কাছ থেকেই গান শিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর পরিবার ছিলো বৈষ্ণব পরিবার। হয়তো সে কারণেই নানা রকমের গানের মধ্যে কীর্তন গানেই তিনি নিজের জগৎটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

গঙ্গামণির কাছ থেকে গানে হাতে-খড়ি হয়েছিলো, কিন্তু অভিনয়ে হাতে-খড়ি হয় গ্রেট ন্যাশনালে। এই থিয়েটারে ৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মঞ্চস্থ হয়েছিলো বিনোদিনীর মতে বেণীসংহার নাটক; কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, শত্রুসংহার – যা রচিত হয়েছিলো বেণীসংহারের ওপর ভিত্তি করে। বিনোদিনীকে এই নাটকে

একটি ছোটো ভূমিকা দেওয়া হয় দ্রৌপদীর পরিচারিকার। নিতান্ত বালিকা, তার ওপর জীবনে নাটক দেখেওনি, অভিনয় সম্পর্কে কোনো ধারণাও নেই। সুতরাং তাঁকে তাঁর ভূমিকাটি শেখানো খুব সহজ ছিলো না। তার ওপর ছিলো মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার জড়তা এবং ভীতি। কিন্তু বিনোদিনীকে যেমন–যেমন করতে বলা হয়েছিলো, তেমন করেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দর্শকরা তারিফ করে তালি দিয়েছিলেন। বিনোদিনী অবশ্য তালির অর্থ জানতেন না। তিনি লিখেছেন যে, এর পর তিনি অনেক রানি এবং ভদ্রমহিলার ভূমিকায় অনেক অভিনয় করেছেন, কিন্তু এই ছোট্টো চরিত্রে অভিনয় করার কথা কখনোই ভুলতে পারেননি।

এই থিয়েটারে কয়েক মাস পরে বিনোদিনী অভিনয় করেন হেমলতা নাটকে। এবারে আর অপ্রধান ভূমিকা নয়, একেবারে নায়িকা হেমলতার চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে হয়। গ্রেট ন্যাশনালে কাজ শুরু করার কয়েক মাস পরেই এই থিয়েটারের সঙ্গে তিনি উত্তর ভারতের বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন। এর মধ্যে লাহোর, দিল্লি, আগ্রা এবং লাখনৌতে তাঁরা অভিনয় করেন। ফিরে এসে কলকাতায় নিয়মিত অভিনয়ে অংশ নেন। এভাবে তিনি কেবল অভিনয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাই নয়, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অভিনয়–কলা শিখতে থাকেন। ফলে অচিরেই অভিনেত্রী হিশেবে তাঁর নাম হতে থাকে।

এই থিয়েটারের সঙ্গে প্রায় দু বছর কাজ করার পরে তিনি ন মাসের জন্যে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর গিরিশ ঘোষের আমন্ত্রণে তিনি ১৮৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে বেঙ্গল ছেড়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে ফিরে আসেন। গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ তাঁর নিজের জন্যে খুবই কাজে লেগেছিলো, কারণ গিরিশই তাঁকে উন্নত মানের অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে গুরু এবং দেবতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্যে আসার ফলে বিনোদিনী অভিনয়–কলায় সত্যিকার দক্ষতা অর্জন করেন।

এই থিয়েটারে যোগ দেবার পর প্রথমেই তিনি যে–নাটকে অংশগ্রহণ করেন তা হলো আগমনী – অক্টোবর মাসে। তারপর এই থিয়েটারের নাম হয় ন্যাশনাল থিয়েটার এবং এর অধীনে পয়লা ডিসেম্বর থেকে অভিনয় হতে থাকে ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এ সময়ে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী; উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ–সরোজিনী ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন। এরপর প্রায় দু বছর ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ থাকে।

বছর দুয়েক পরে ১৮৮১ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতাপচাঁদ জহুরির মালিকানায় নতুন করে চলতে আরম্ভ করে। প্রতাপচন্দ্র জহুরী অবশ্য নাট্যামোদী ছিলেন না। থিয়েটার চালাতেন তিনি আর্থিক লাভের জন্যে। দু বছর এক মাস অর্থাৎ ৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তাঁর এই থিয়েটার চালু ছিলো। এখানে থাকার সময়ে বিনোদিনী যেসব নাটকে অভিনয় করেন, তার মধ্যে

ছিলো নীলদর্পণ, কৃষ্ণকুমারী, সরোজিনী এবং আনন্দরহো। এই থিয়েটারে থাকার সময়েই তিনি অভিনেত্রী হিশেবে সর্বোত্তম বলে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু মুশকিল বাধে প্রতাপচাঁদের আদেশমতো কাজ করা নিয়ে। বিনোদিনী–সহ অনেক অভিনেতা–অভিনেত্রীই তাঁর নির্দেশমতো কাজ করতে পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ততার দিকে এগিয়ে যায়। তখন গিরিশ ঘোষ একটি স্বতন্ত্র থিয়েটার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এ উদ্যোগে বিশেষ করে যাঁরা সহায়তা করেন, তাঁদের মধ্যে বিনোদিনীর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

ওদিকে, ব্যক্তিগত জীবনে বিনোদিনী এর অল্প আগে থেকে এক জমিদারের সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁর রক্ষিতা হিশেবে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করেন। আত্মজীবনীতে বিনোদিনী যা লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, এই যুবক তাঁকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতেন এবং বিনোদিনীও তাঁর প্রণয়ে মুগ্ধ ছিলেন।

ঠিক এই সময়েই গিরিশচন্দ্র যে থিয়েটার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার তোড়জোড় চলছিলো। কিন্তু থিয়েটার গড়ে তোলার জন্যে যে–টাকাপয়সার দরকার ছিলো, তা তিনি জোগাড় করতে পারেননি। সেই পরিস্থিতিতে বিশ–একুশ বছরের এক অবাঙালি ব্যবসায়ী যুবক – গুর্মুখ রায় (গুরুমুখ রায়) – থিয়েটার গঠনে সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন। তিনিও আদৌ নাট্যামোদী ছিলেন না। থিয়েটারের দিকে তাঁর আকর্ষণও ছিলো না। তাঁর একমাত্র আকর্ষণ ছিলো বিনোদিনীকে পাওয়ার।

এতে প্রধান সমস্যা ছিলো বিনোদিনীকে এই প্রস্তাবে সম্মত করানোর। তাঁর সম্মতির ওপরই নির্ভর করছিলো থিয়েটার গড়ে তোলার উদ্যোগ সফল হবে কিনা। থিয়েটার গড়ে উঠুক – এতে বিনোদিনীর উৎসাহ ছিলো ষোলো আনা; কিন্তু তিনি তখন রীতিমতো প্রণয়পাশে আবদ্ধ। সেই প্রেমের সম্পর্ক কোনো কারণ ছাড়াই ভঙ্গ করতে তাঁর হৃদয় এবং বিবেক উভয়েরই বাধা ছিলো। সঙ্গীরা তাঁর কাছে এ প্রস্তাব করায় তিনি এক কথায় তা উড়িয়ে দেন। কিন্তু এ সময়েই তাঁর প্রেমিক দেশের বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিয়ে করেন এবং তারপর বিনোদিনীর প্রতি খানিকটা অবহেলা দেখান। বিনোদিনী এতে ব্যথিত হন; অভিমানে ক্ষুব্ধও হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রণয় অক্ষুণ্ন থাকে। এই অবস্থায় একদিকে সহকর্মীদের প্রতিদিনের অনুরোধ ও অনুনয়, অন্যদিকে প্রণয়ীর অবহেলা – দুই দিকের চাপে শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী গুর্মুখ রায়ের প্রস্তাবে রাজি হন। গুর্মুখ রায় থিয়েটার গঠনে অর্থ সাহায্য করতে রাজি হলেও, ব্যক্তিগতভাবে বিনোদিনীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে তাঁকে থিয়েটার গঠনের উদ্যোগ ছেড়ে দেওয়ার জন্যেও অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু থিয়েটার ছিলো বিনোদিনীর প্রাণ। একমাত্র থিয়েটার গঠনের শর্তেই তিনি নিজের প্রেমিককে ত্যাগ করে গুর্মুখ রায়কে গ্রহণ করতে রাজি হন।

এসব ঘটনার কথা শুনে বিনোদিনীর প্রেমিক নতুন থিয়েটার ভেঙে ফেলার জন্যে দেশ থেকে লাঠিয়াল নিয়ে আসা–সহ ব্যক্তিগতভাবে বিনোদিনীকে অনুরোধ করেন এ পথ থেকে ফিরে আসার জন্যে। বিনোদিনী ততোদিনে গুর্মুখ রায়ের প্রস্তাবে সম্মতি

দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে ফিরে আসাও আর সম্ভব ছিলো না। ওদিকে, অনুরোধে কাজ না-হওয়ায় তাঁর প্রণয়ী তাঁকে খুন করতে চেষ্টা করেন। একদিন রাতের বেলায় এই যুবক তলোয়ার হাতে বিনোদিনীর শোবার ঘরে ঢুকে পড়েন। তিনি বিনোদিনীকে তখনই বিশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং তাঁর কাছে ফিরে আসার অনুরোধ করেন। তাতে যখন কাজ হলো না, তখন তিনি বিনোদিনীকে তলোয়ার দিয়ে দুবার কোপ দেন। দুবারই নাটকীয়ভাবে বিনোদিনী রক্ষা পান। তারপর তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, তাঁকে হত্যা করে এই যুবকের ক্ষতি হওয়া ছাড়া কোনো লাভ হবে না। ভদ্রলোক তখন হতাশ এবং বিষাদগ্রস্ত হয়ে বিদায় নেন।

প্রায় বছর খানেক লেগেছিলো গিরিশচন্দ্র এবং বিনোদিনীর এই থিয়েটারের ভবন নির্মাণ করতে। এতে স্বয়ং গিরিশ ঘোষকে সঙ্গ-অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। এমন কি, বিনোদিনী নিজে ঝুড়িতে করে মাটি বয়ে নিয়ে ভরাট করার কাজ করেছিলেন। শ্রমিকদের উৎসাহিত করার জন্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বকশিশও দিতেন। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এই নতুন থিয়েটারের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৮৮২ সালের মাঝামাঝি সময়ে আর শেষ হয় পরের বছর মাঝামাঝি সময়ে। কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় গিরিশ ঘোষ এবং বিনোদিনী প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্মচারী ছিলেন। পরের বছর নির্মাণের কাজ শেষ হবার পর জুলাই মাসে নাটক মঞ্চায়ন আরম্ভ হয়। এর নাম দেওয়া হয় স্টার থিয়েটার। গোড়াতে কথা ছিলো যে, নতুন থিয়েটারের নাম দেওয়া হবে বিনোদিনীর নাম অনুসারে - বি থিয়েটার। কিন্তু থিয়েটারের নাম নিবন্ধীকরণের সময়ে এর নাম দেওয়া হয় স্টার। শুনে বিনোদিনী আন্তরিকভাবে হতাশ এবং ব্যথিত হন। এভাবে থিয়েটারের একেবারে সূচনা থেকেই তিনি যাত্রা শুরু করেন ব্যক্তিগত অসন্তোষ নিয়ে।

ব্যক্তিগতভাবে হতাশ হলেও, শিল্পী হিশেবে স্টারের আমলই ছিলো তাঁর সর্বোচ্চ সৃজনশীলতা ও সবচেয়ে সাফল্যের কাল। অপর পক্ষে, নাট্যকার হিশেবে এটা ছিলো গিরিশ ঘোষেরও সবচেয়ে সৃষ্টিশীল কাল। এই থিয়েটারের জন্যে তিনি একের পর এক নাটক লিখতে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গীরা মিলে পরম উৎসাহের সঙ্গে তা অভিনয় করেন।

এই থিয়েটার গঠন করার ব্যাপারে বিনোদিনী যে-আত্মত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তা অতি অসাধারণ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, এই বিরাট আত্মত্যাগ সত্ত্বেও কারো কারো বিরোধিতার কারণে স্টার থিয়েটারে তিনি সাড়ে তিন বছরের বেশি কাজ করতে পারেননি। গুর্মুখ রায়ও তাঁকে সমর্থন দিতে পারেননি। কারণ থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার পর তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র বছরখানেক। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় স্টার থিয়েটার থেকে বিনোদিনীকে যাঁরা সরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষও ছিলেন, যাঁকে তিনি আজীবন বিবেচনা করেছেন তাঁর গুরু এবং দেবতা বলে। স্টার থিয়েটার গড়তে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কিছু পাননি। পেয়েছিলেন

স্টারে অভিনয়ের সূত্রে প্রচুর খ্যাতি, এমন কি, যশ। একশো বছর পরেও তাঁর নাম যে টিকে আছে, তার কারণ স্টারের আমলে তিনি গিরিশ ঘোষের কতোগুলো উৎকৃষ্ট নাটকে গিরিশ ঘোষেরই পরিচালনায় অভিনয় করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

১৮৮৭ সালের পয়লা জানুয়ারি তিনি মাত্র বছর পঁচিশেক বয়সের সময়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন। এর পর তিনি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি বেঁচেছিলেন। কিন্তু আর কোনোদিন মঞ্চে ওঠেননি। স্বভাবতই, এ কথা মনে হয় যে, তিনি যখন অবসর নিতে বাধ্য হন, তখনো হয়তো তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ হয়নি। তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয় ১৮৭৪ সালের শেষে আর শেষ হয় ১৮৮৭ সালের পয়লা জানুয়ারি অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক মাত্র বারো বছরের। এর মধ্যে আবার ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ৮০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত থিয়েটার করেননি। তার অর্থ তাঁর অভিনয়-জীবনের দৈর্ঘ্য মাত্র দশ বছর। এই দশ বছরের মধ্যে প্রায় আশিটি নাটকে শতাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন।

স্টার থিয়েটারের আমলে গিরিশ ঘোষ পুরোদমে নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি পৌরাণিক এবং ধর্মীয় নাটকসহ বিভিন্ন ধরনের নাটকই লিখেছিলেন। এমন কি, শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকের অনুবাদও করেছিলেন। এই থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার পর বছর দুই পরে তাঁর লেখা চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় নেমেছিলেন বিনোদিনী। ১৮৮৫ সালের এই অক্টোবর সেই নাটকের অভিনয় দেখতে থিয়েটারে আসেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি বিনোদিনীর ভাববিহ্বল অসাধারণ অভিনয় দেখে এতো মুগ্ধ হন যে, অভিনয় শেষ হবার পর তাঁকে আশীর্বাদ করে যান। যে-কালে বিদ্যাসাগর এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো সমাজ-সংস্কারকরা রঙ্গমঞ্চে নারীদের আগমনে অভিনয় দেখাই বন্ধ করেছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণের মতো একজন প্রভাবশালী ধর্মগুরু তাঁর অভিনয় দেখায় এবং তাঁকে আশীর্বাদ করায় মঞ্চে মেয়েদের অভিনয় হিন্দু সমাজের এক ধরনের স্বীকৃতি লাভ করেছিলো। এর পরেও রামকৃষ্ণ দুবার স্টারে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত তখনো স্বামী বিবেকানন্দ হননি। তিনিও একাধিকবার স্টারে অভিনয় দেখতে আসেন। আর আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিজের লেখা উপন্যাস মৃণালিনীর নাট্যরূপের অভিনয় তিনি দেখেছিলেন ১৮৮৫ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে। সেই নাটকের মনোরমার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। এই অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মনোরমার চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন কাগজে-কলমে। কিন্তু সেই মনোরমাকে তিনি যে নিজের চোখের সামনে দেখতে পাবেন এটা আশা করেননি। বিনোদিনী আসলে মনোরমাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

আগেই বলেছি, ৮০টিরও বেশি নাটকে শতাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। তার মধ্যে পৌরাণিক এবং ধর্মীয় নাটকে তাঁর অভিনয় ছিলো বিশেষ করে স্মরণীয়। এসব অভিনয় রক্ষণশীল হিন্দুরা কেবল দেখেননি, বরং তাঁরা উপভোগও করেছিলেন। এভাবে বিনোদিনী মহিলাদের অভিনয়কে বাঙালি দর্শকদের কাছে

গ্রহণযোগ্য করার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। অভিনয় ছাড়া গানেও তাঁর অবদান কম নয়। বিশ শতকের গোড়ায় যখন বঙ্গদেশে গ্রামোফোন চালু হয়, তখন তিনি এগিয়ে আসেন গান গাইবার জন্যে। তাঁর রেকর্ড করা অনেকগুলো গানের মধ্যে ১৯০৭ সালে রেকর্ড করা একটি গান রক্ষা পেয়েছে – 'প্রাণ আর বাঁচে কেমনে'। এ গান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কতো উঁচুমানের গায়িকা ছিলেন। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২০ সালে প্রকাশিত বিনোদিনী নামাঙ্কিত গানের শেষে ভণিতা শুনে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ইনি হয়তো অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী নন।

বিনোদিনী কতোটা আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শিখেছিলেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, তাঁর অভিনয় এবং রচনাসমূহ প্রমাণ করে যে, তিনি রীতিমতো শিক্ষিতা ছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর আত্মজীবনী, তাঁর অভিনেত্রী জীবন সম্পর্কিত দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং কবিতাসমূহ থেকে মনে হয় যে, তাঁর যথেষ্ট সাহিত্যিক গুণও ছিলো। বাঙালি মহিলারা সেকালে মাত্র কয়েকটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। এই আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে সবার আগে লিখেছিলেন রাসসুন্দরী দেবী – আমরা তা আগেই লক্ষ করেছি। কেবল নারীদের মধ্যে নয়, পুরুষরাও কেউ তাঁর আগে আত্মজীবনী প্রকাশ করেননি। নারী-রচিত আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে বিনোদিনীর আমার কথা সত্যকথন, স্পষ্টবাদিতা এবং ভাষার সরলতার জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র বিশ্লেষণেও।

আগেই বলেছি, ব্যক্তি বিনোদিনীর নামে মাত্র বিয়ে হয়েছিলো তাঁর বয়স যখন বছর পাঁচেক। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিলো না। পরে তিনি একে-একে তিনজন ধনীর রক্ষিতা হন। এর মধ্যে শেষজনের সঙ্গে তাঁর কেটেছে একত্রিশ বছর। তিনি বিনোদিনীর জন্যে বাড়িসহ কিছু সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। সেই দিয়েই জীবনের শেষ ২৯ বছর বেঁচে ছিলেন। নয়তো তাঁর অবস্থা হতে পারতো সুকুমারীর মতো নিঃস্ব, রিক্ত। শেষ জীবনে সুকুমারী কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন, কেউ তার খোঁজ রাখে না। কিন্তু বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত সচ্ছল অবস্থায় থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন ১৯৪১ সালে।

পাঁচ

বিনোদিনীর বছর পাঁচেকের ছোটো ছিলেন কিরণবালা। তিনিও জন্মেছিলেন কলকাতায় নিষিদ্ধ পাড়ায় এক বারবনিতার ঘরে। তাঁরও পিতৃপরিচয় জানা যায় না। কখন থেকে তিনি অভিনয় শুরু করেন, তাও নয়। তবে বিনোদিনীর সঙ্গে স্টার থিয়েটারে অভিনয় করার সময় থেকে তিনি পরিচিতি লাভ করতে থাকেন। গিরিশ ঘোষই তাঁকে অভিনয় করতে শিখিয়েছিলেন। যতোদিন বিনোদিনী স্টারে ছিলেন, ততোদিন নিজের যোগ্যতার কারণেই তিনি সব সময়ে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিনোদিনী যখন সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে

স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে রক্ষিতার ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন, তখন তাঁর জায়গা দখল করেন কিরণবালা। বিনোদিনী যেসব ভূমিকায় অভিনয় করতেন, সেসব ভূমিকাতেই দেখা যায় কিরণবালাকে। এসব চরিত্রের অভিনয়ে বিনোদিনী যে–আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন, কিরণবালা তা যোগ্যতার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এ দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, অত্যন্ত উঁচু দরের অভিনয় ক্ষমতা ছিলো তাঁর। তা সত্ত্বেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি যে খুব বড়ো নায়িকা হিশেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে পারেননি, তার কারণ তাঁর অকালমৃত্যু। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি বসন্ত রোগে মারা যান।

বিনোদিনীর পরে সে যুগের সবচেয়ে নাম–করা অভিনেত্রী ছিলেন তিনকড়ি দাসী। তাঁরও মা ছিলেন যৌনকর্মী/বাইজি। অভিনয় জগতের দিকে তিনকড়ি এসেছিলেন টাকার অভাবে। এবং তিনি তাঁর অভিনয়–জীবন আরম্ভ করেছিলেন, অত্যন্ত নগণ্য ভূমিকা দিয়ে। পরবর্তী কালে যিনি এতো বড়ো অভিনেত্রী হয়েছিলেন, ১৮৮৬ সালের জুন মাসে তিনি যখন গিরিশ ঘোষের বিল্বমঙ্গল নাটকে অভিনয় আরম্ভ করেন, তখন তাঁর ভূমিকা ছিলো নির্বাক সখীর। অভিনেত্রী হিশেবে তিনি প্রথম পরিচিতি লাভ করেন মীরাবাঈ নাটকে, নায়িকা মীরাবাঈয়ের ভূমিকায়।

বিনোদিনীর মতো তিনিও ভালো অভিনয় শিখেছিলেন গিরিশ ঘোষের কাছে। ১৮৯৩ সালে তাঁরই নাটক ম্যাকবেথে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনকড়ি সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়ান। গিরিশ ঘোষের আরও কয়েকটি নাটকে তিনি প্রধান ভূমিকায় নেমেছিলেন। তাঁর অভিনয় পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন যে, বাংলার রঙ্গমঞ্চে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। আসলে অভিনয়ে তাঁর আকর্ষণ এতো আন্তরিক ছিলো যে, তিনি এর জন্যে অন্য লোভ ত্যাগ করেছিলেন। যেমন, প্রথম দিকে তাঁকে মাসে দু শো টাকা দিয়ে একজন ধনী রক্ষিতা রাখতে চাইলেও তিনি চল্লিশ টাকা বেতনের অভিনেত্রীর কাজ ছাড়তে রাজি হননি। দু শো টাকা তখন অনেক টাকা। স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করায় তাঁর মা তাঁকে বাঁশের বাখারি দিয়ে প্রহার করেছিলেন। ফলে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং তিনদিন জ্বরে ভোগেন। তিনি বলেছেন যে, এ ঘটনার



তিনকড়ি

পর তাঁর মা তাঁকে বকাবকি করলেও, আর মারেননি। টাকার প্রতি তাঁর মমতা বস্তুত কমই ছিলো। তাই ১৯১৭ সালে মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর দুটি বাড়ি হাসপাতালের জন্যে দান করে গিয়েছিলেন।

থিয়েটারে কাজ শুরু করার পর একাধিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক হয়েছিলো। এমন কি, স্বয়ং গিরিশ ঘোষের সঙ্গেও তাঁর প্রণয় ছিলো বলে অনেকে বলতো। তবে জীবনের শেষ দিকের বছর বিশেক তিনি এক বাবুর রক্ষিতা ছিলেন। নিজের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই বাবু তাঁকে যত্নের সঙ্গেই রেখেছিলেন বলে মনে হয়। এই বাবুর আত্মীয়স্বজনরাও তিনকড়িকে বাবুর প্রণয়িনী হিশেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে এই বাবু তাঁকে তিনটি বাড়ি দান করে যান, তার মধ্যে তৃতীয় বাড়িটি তিনকড়ি দান করে গিয়েছিলেন এই বাবুর পুত্রকে।

তিনকড়ির কয়েক বছরের ছোটো ছিলেন কুসুমকুমারী (১৮৭৬?–১৯৪৮)। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি প্রবেশ করেছিলেন অভিনয় নয়, বরং নাচের পথ ধরে। তারপর গ্র্যান্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর, স্টার ইত্যাদি অনেক থিয়েটারেই তিনি যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এ সময়ে তিনি যে–ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, সেটি হলো : আলিবাবা নাটকে মর্জিনার ভূমিকা। তিনিই প্রথম অভিনেত্রী যিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের নাচ শেখাতেন। ভালো গানও জানতেন তিনি।

কুসুমকুমারীর মোটামুটি একই বয়সী ছিলেন নরীসুন্দরী। তিনিও তাঁর আগেকার অভিনেত্রীদের মতো বারবনিতার সন্তান ছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সংগীতশিল্পী হিশেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অন্য অভিনেত্রীদের তুলনায় একটু বেশি বয়সে – প্রায় ষোলো–সতেরো বছর বয়সে – ১৮৯২ সালে তিনি স্টার থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে তিনি কোনো পার্শ্বচরিত্রে নয়, একেবারে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন ঋষ্যশৃঙ্গ নাটকে। এ ভূমিকায় তাঁর অভিনয় কেমন হয়েছিলো, তা জানা যায় না। কিন্তু এর বছর দুয়েক পরে চন্দ্রশেখর নাটকে তিনি দলনীর ভূমিকায় সত্যিকার খ্যাতি লাভ করেন। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি নানা চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্থায়ী নাম রেখে গেছেন। ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি একটানা স্টারের অভিনেত্রী ছিলেন। তারপর কখনো মিনার্ভা, কখনো স্টার, কখনো অন্য কোনো থিয়েটারে কাজ করে শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সালে মঞ্চ থেকে সরে যান। তিনি মারা যান ১৯৩৯ সালে।

নরীসুন্দরীর সমবয়সী ছিলেন তারাসুন্দরী। তিনিও সেকালের অন্যান্য অভিনেত্রীর মতো এক রূপোপজীবিনীর সন্তান ছিলেন। ১৮৮৪ সালে মাত্র বছর সাতেক বয়সে তিনি বিনোদিনীর সাহায্যে স্টার থিয়েটারের মঞ্চে প্রবেশ করেন। আগেই বলেছি, গিরিশ ঘোষের চৈতন্যলীলা নাটকে বিনোদিনী নিমাই–এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তারাসুন্দরী সেই নাটকেই একটি ছেলের ভূমিকায় নামেন। তিনি গিরিশ ঘোষের আরও কয়েকটি নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। তবে তিনি প্রথম বালিকা চরিত্রে

অভিনয় করেন হারানিধি নাটকে। তাঁর শিক্ষানবিশী পর্যায় কেটে যাওয়ার পর, ১৮৯১ সাল থেকে তিনি অভিনয় করতেন নায়িকার ভূমিকায়। তবে তাঁর খ্যাতি আসে ১৮৯৪ সালে চন্দ্রশেখর নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এর পর অভিনয়ে তিনি এতো পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন যে, এক সময়ে সবাই তাঁকে বলতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী।



তারাসুন্দরী

তাঁর শিল্পীজীবন সূচনা হয়েছিলো স্টার থিয়েটারে। সেখানে প্রায় ১৩/১৪ বছর কাজ করার পর, ১৮৯৭ সালে তিনি যোগদান করেন ক্লাসিক থিয়েটারে। এখানেই তিনি অভিনয় শেখার ব্যাপারেও যোগ্য গুরুর নাগাল পেয়েছিলেন। স্টারে থাকার সময়ে তিনি অমৃতলাল মিত্রের কাছে অভিনয় শিখেছিলেন। কিন্তু তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটারে এসে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহচর্যে অভিনয়-কলায় রীতিমতো দক্ষতা অর্জন করেন। তা ছাড়া, এখানেই তিনি সত্যিকার খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং অনেকগুলো নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে অভিনেত্রী হিশেবে তাঁর আসন পাকাপোক্ত করেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি থিয়েটারের জগতে নিয়মিত কাজ করেছেন। তারপর অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পরও শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন জনা এবং রিজিয়ার ভূমিকায়। তাঁর সে অভিনয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। অভিনয় ছাড়া তারাসুন্দরী গল্প-কবিতাও লিখতেন বিনোদিনীর মতো।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী অভিনেত্রীদের মতো একাধিক 'বাবু'র রক্ষিতা ছিলেন। যিনি নাটকের জগতে ছিলেন অমন সম্মানের পাত্রী, ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই সম্মান, সম্ভ্রম অথবা স্বীকৃতি পাননি, অথবা বলা যেতে পারে, সামান্যই পেয়েছিলেন। যে-পুরুষসমাজ ভেঙে পড়তো তাঁর অভিনয় দেখতে, সেই পুরুষসমাজই ব্যক্তি তারাসুন্দরীকে শ্রদ্ধা দূরে থাক, সামান্যতম সম্মান দিতেও তৈরি ছিলো না।

তিনকড়ি, নরীসুন্দরী, তারাসুন্দরীদের যুগের আরও একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী ছিলেন নীরদাসুন্দরী। তাঁরও জন্ম বস্তিতে, মা কাজ করতেন ঝিয়ের। নীহারবালা, প্রভা দেবী, রমা বসু ইত্যাদি সবারই পরিচয় ছিলো কমবেশি একই রকমের।

ছয়

মোট কথা, বাংলা থিয়েটারের আদি যুগের নাম-করা অভিনেত্রীরা সবাই এসেছিলেন বারবনিতাদের ঘর থেকে, অথবা সমাজের একেবারে নিচের তলা থেকে। কেউ কেউ অভিনেত্রী হয়ে নিজেরা বারনারী হয়েছিলেন। এঁরা সবাই কমবেশি গান জানতেন। নাচও জানতেন বেশির ভাগই। এমন কি, অল্পবিস্তর লেখাপড়াও তাঁরা শিখেছিলেন। প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে তাঁরা অভিনয়ে এসেছিলেন। কেউ কেউ এসেছিলেন পতিতাবৃত্তি থেকে রক্ষা পেতে, অথবা আর-একটু সম্মানজনক কাজের জন্যে। সুকুমারী, বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী প্রমুখ অভিনেত্রী তা পেয়েওছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, একবার রূপোপজীবিনীর ভূমিকা ত্যাগ করার পর তাঁরা বৃহত্তর সমাজে গৃহীত হয়েছিলেন অথবা বিয়ে-থা করে সংসার করেছিলেন। বরং দেখতে পাই, তাঁরা অভিনয় থেকে অর্থকড়ি উপার্জন করলেও সমাজে টিকে থাকার জন্যেই কারো না কারো রক্ষিতায় পরিণত হয়েছিলেন। নিজেরা গ্লানির মধ্যে থেকেও অন্যদের আনন্দ দিয়েছেন। দেহ এবং রূপ দিয়ে উপার্জন করার পাপবোধ থেকে শেষ বয়সে এই 'খারাপ মেয়েমানুষরা' ধর্মের দিকেও একটু বেশি করেই ঝুঁকে পড়তেন। কেউ কেউ দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে ভিক্ষা করেও জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছেন।

আমরা পরের আলোচনা থেকে দেখতে পাবো যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদি পর্ব শেষ হবার অনেক কাল পরেও অভিনেত্রীরা আসতেন সমাজের নিচের তলা থেকে। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ – যাঁরা অভিনয় করতেন সমাজ তাঁদের গণ্য করতো দেহজীবী বলে। তাঁদের অভিনয় এবং রূপের প্রশংসা হতো পত্রপত্রিকায় এবং বাড়িতে বাড়িতে, কিন্তু ব্যক্তি হিশেবে তাঁরা বিবেচিত হতেন কুলটা নারী বলে। এই অভিনেত্রীদের সমাজের অভিজাতরা কতোটা ঘৃণা করতেন, তা বোঝা যায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের একটি গল্প থেকে। তাঁকে নাকি এক পথচারী থিয়েটারের পথ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি সে পথ চেনেন না। কিন্তু একটু পরে তাঁর যখন মনে হলো যে, পথ চিনেও চেনেন না বলায় সেটা মিথ্যে বলা হলো, তখন তিনি ফিরে গিয়ে সেই পথচারীকে বললেন যে, তিনি পথ চেনেন, কিন্তু বলবেন না। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তাঁর রুচিও ছিলো ষোলো আনা ব্রাহ্ম – অথবা পিউরিটান-রুচি। কেবল হেরম্ব মৈত্রের মতো কয়েকজন মানুষের মধ্যে নয়, এই মনোভাব বিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্যাপকভাবে সমাজে বিদ্যমান ছিলো। অনেকে থিয়েটারকে অপবিত্র জায়গা বলে বিবেচনা করতেন, অভিনেত্রীদের কারণে।

সাত

বাইরের নারীদের নিয়ে ফুর্তি করলেও ঘরের নারীদের সে যুগের পুরুষরা মঞ্চে নিয়ে আসা দূরে থাক, মঞ্চে আনার কথা ভাবেনওনি। সমাজকে চটিয়ে দিয়ে এ রকম

পদক্ষেপ নেওয়ার সাহসই ছিলো না। বস্তুত, আমরা আগেই লক্ষ করেছি, অভিনেত্রীদের রক্ষিতা রাখলে সমাজ তা মেনে নিতো; কিন্তু অভিনেত্রীদের বিয়ে করলে সমাজ–সংসার তা স্বীকার করে নিতো না।

সমাজের এই তীব্র নিষেধ অমান্য করে বাড়ির বউ অথবা কন্যাদের অভিনয়ে আসার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। ১৮৮১ সালে এই পরিবার এ রকমের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলো প্রধানত একাধিক কারণে। এ পরিবারের সামাজিক অবস্থান এতো উঁচুতে ছিলো যে, তাঁরা সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকেও এঁরা ছিলেন মূলধারা হিন্দুদের থেকে আলাদা এবং তাঁদের তুলনায় অনেক প্রগতিশীল। সর্বোপরি, যে–মঞ্চে এই মহিলারা অভিনয় করেছিলেন, তা ছিলো তাঁদের বাড়ির নিজস্ব মঞ্চ। সে মঞ্চ সাধারণ মানুষের জন্যে খোলাও ছিলো না। সুতরাং তাঁরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অভিনয় করবেন কিনা, সে স্বাধীনতা তাঁদের যথেষ্টই ছিলো।

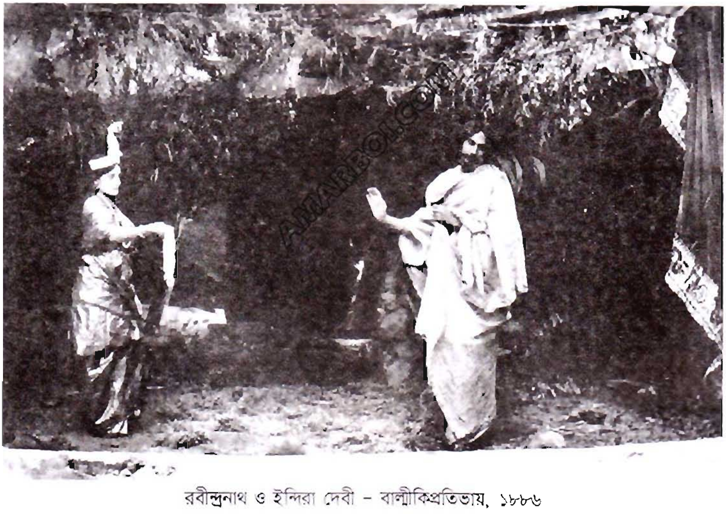
এসব অভিনয়ে নিমন্ত্রিতদের ছাড়া, জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলো না ঠিকই, তা সত্ত্বেও ঠাকুর পরিবার নিজেদের বাড়ির মহিলাদের মঞ্চে উঠিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। প্রথমত, এটা পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত হিশেবে কাজ করেছিলো। অতঃপর এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে সিকি শতাব্দী পরে ভদ্রলোক পরিবারের মহিলারা মঞ্চে অবতীর্ণ হবার সাহস পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঠাকুরবাড়ির মহিলারা যাত্রার মতো অতিনাটকীয় এবং অস্বাভাবিক অভিনয়ের বদলে স্বাভাবিক অভিনয়রীতি প্রচলন করেছিলেন। তাও পরবর্তীদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিলো। থিয়েটারের অভিনেতারা (হয়তো অভিনেত্রীরাও) গোপনে ঠাকুরবাড়ির অভিনয় দেখে গিয়ে সে রকম অভিনয় করেছিলেন বলে সমসাময়িক লেখা থেকে জানা যায়। এমন কি, তাঁরা নাকি ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের মতো অঙ্গভঙ্গিও শিখেছিলেন।

নাটকের ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির আগ্রহের একটি কারণ ছিলো এই যে, সে বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ – দুজনই অনেকগুলো নাটক লিখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক নাটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক ১৮৭০–এর দশকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিলো। এ রকমের একটি অভিনয় দেখার জন্যে মহিলাদের নিয়ে ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা বেঙ্গল থিয়েটারে গিয়েছিলেন। সেখানে বাইরের দর্শকদের সেদিন আসতে দেওয়া হয়নি। আর, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গীতিনাট্য দিয়ে শুরু করলেও ১৮৮০–এর দশক থেকে আরম্ভ করে পরে অনেকগুলো উৎকৃষ্ট নাটক লিখেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব মঞ্চে প্রথম অভিনয় শুরু হয় বাল্মীকিপ্রতিভা দিয়ে, ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাতে রবীন্দ্রনাথ নিজে সেজেছিলেন বাল্মীকি, আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সেজেছিলেন সরস্বতী। লক্ষ্মী সেজেছিলেন শরৎকুমারী দেবীর কন্যা সুশীলা। তারপর গোটা ১৮৮০–এর দশক ধরে আরও কয়েকবার এই গীতিনাট্যের

অভিনয় হয়েছিলো। প্রতিবারেই তাতে ঠাকুর পরিবারের অথবা তাঁদের আত্মীয় পরিবারের মেয়েরা অংশ নিয়েছিলেন। একবার প্রতিভার ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী – যেমনটা দেখা যাচ্ছে নিচের ছবি থেকে।

বাল্মীকিপ্রতিভা ছাড়া, ১৮৮২ সালে কালমৃগয়ার অভিনয়ে ইন্দিরা দেবীসহ আরও কয়েকটি মেয়ে অংশ গ্রহণ করেন। আর, ১৮৮৮ সালে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের উদ্যোগে বেথুন কলেজে মায়ার খেলা অভিনীত হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন শুধু মেয়েরাই। তাঁদের মধ্যে ঠাকুর বাড়ির বাইরেরও দু–একজন মেয়ে ছিলেন। ১৮৯০ সালের অক্টোবরে রাজা ও রানির যে–অভিনয় হয়, তাতে কেবল কমবয়সী মেয়েরা নন, জ্ঞানদা দেবী এবং মৃণালিনী দেবীও অংশ নিয়েছিলেন। মোট কথা, অন্য বহু বিষয়ের মতো ভদ্রঘরের মেয়েদের অভিনয়ে যোগ দেওয়ার ব্যাপারেও ঠাকুরবাড়ি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলো। এঁদের দৃষ্টান্ত দেখে তখনই ভদ্রঘরের মেয়েরা নাটক করতে এগিয়ে আসেননি। কিন্তু আগেই বলেছি, সিকি–শতাব্দীর মধ্যে অন্য ভদ্রমহিলারা মঞ্চে উঠেছিলেন।



রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী – বাল্মীকিপ্রতিভায়, ১৮৮৬

ভদ্রঘরের মেয়েদের অভিনয়ে আনার বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির পরে যাঁর ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় – সিনেমার জগতে সংক্ষেপে যিনি ডিজি নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো। তাঁর মেজভাই নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা। তা ছাড়া, ধীরেন্দ্রনাথ নিজেও ঠাকুর পরিবারের এক আত্মীয়াকে বিয়ে করেছিলেন। এঁর নাম প্রেমিকা দেবী।

নির্বাক ছবি বিলেত ফেরতের জন্যে ধীরেন্দ্রনাথ অ্যাডভোকেট বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুশীলাকে নিয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া এনেছিলেন শ্রীরামপুরের গোসাঁই পরিবারের একটি মেয়েকে। ভদ্রপরিবারের মেয়েদের জন্যে অভিনয় করা তখনো এতো নিষিদ্ধ ছিলো যে, গোসাঁই পরিবারের এই মেয়েটি প্রমীলা ছদ্মনামে অভিনয় করতে রাজি হন। ধীরেন্দ্রনাথ এর থেকেও সাহসী যে-পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা হলো : তিনি নিজের স্ত্রী প্রেমিকা দেবীকেও সিনেমায় অভিনয় করাতে রাজি করান। ১৯২১ সালে বিয়ের পর থেকে ১৯৩০ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রেমিকা দেবী বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম ছবির নাম ছিলো ফ্লেইমস অব ফ্লেশ। আসল নাম প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয় নাম হয়েছিলো প্রেমলতিকা।

প্রেমিকা দেবী মারা যাওয়ার পর ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই কন্যা পারুল এবং মণিকাকেও পর্দায় নিয়ে এসেছিলেন। মণিকার স্বামী পি গুহঠাকুরতা ছিলেন রীতিমতো গণ্যমান্য লোক। তিনিও তাঁকে অভিনয় করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের আর-এক কৃতিত্ব তিনি কয়েকজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণীকে অভিনয় করতে রাজি করিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই বাঙলা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছিলেন সবিতা। বাঙলায় কবিতা লিখতেন তিনি এবং বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতেন।

ভদ্রঘরের তরুণীদের অভিনয়ের জগতে আনার ভূমিকা বিশ শতকের প্রখ্যাত অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীও পালন করেছিলেন। তিনি যাঁদের রাজি করিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দুই বোন – কঙ্কাবতী এবং চন্দ্রাবতী। তাঁরা ছিলেন এক ব্রাহ্ম জমিদার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা এবং দু জনেই জন্মেছিলেন মুজাফ্ফরপুরে। এই পারিবারিক পরিচয় ছাড়া, আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় ছিলো কঙ্কাবতীর। তিনি বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। অভিনয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের কাছে। ১৯২৮ সালে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি শিশির ভাদুড়ীর আমন্ত্রণে মঞ্চে প্রবেশ করেন। পরে তাঁর সঙ্গে নিউ ইয়র্কে গিয়ে তিনি অভিনয় করেছিলেন। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। চন্দ্রাবতী ছিলেন কঙ্কাবতীর চেয়ে ছ বছরের ছোটো। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং দীনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছিলেন। ১৯২৯ সালে নির্বাক চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। পরে তিনি বহু নাম-করা ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৪০-এর দশকে তিনি তিনবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিশেবে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের জন্মও চন্দ্রাবতীর মতো ১৯০৯ সালে। তিনিও ছিলেন ভদ্রঘরের কন্যা এবং বধূ। সেকালে আইএ পাশ করেছিলেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরিচালক মধু বসুর পরিচয় ছিলো। সেই সূত্র ধরে এবং স্বামীর উৎসাহে তিনি অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করেন। মধু বসুর স্ত্রী সাধনা বসুও বাঙালি অভিনেত্রীদের

ইতিহাসে একাধিক কারণে নাম–করা। তাঁর পিতা সরল সেন ছিলেন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র এবং ব্যারিস্টার। ষোলো বছর বয়সে – ১৯৩০ সালে – তিনি এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের দালিয়া কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বিশেষ নাম করে চার বছর পরেন আলিবাবা নাটকে মর্জিনার ভূমিকায়। এই নাটকে আলিবাবা চরিত্রে অভিনয় করতেন পরবর্তী কালে সিনেমা পরিচালক হিশেবে যিনি অতো নাম করেন, সেই মধু বসু। ১৯৩৭ সালে তিনি যখন এই নাটকটিকে সিনেমায় পরিণত করেন, তখনও সাধনা বসুকে তিনি মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি করান। মর্জিনার ভূমিকায় অভিনয় করে সাধনা বসু রীতিমতো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনয় সত্যিকার অর্থে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলো। নাচ এবং গান উভয় বিষয়ে তিনি নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন। মঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব অভিনেত্রী হিশেবে নয়, বরং নৃত্যশিল্পী হিশেবে – ১৯২৮ সালে। নৃত্য ছাড়া, সঙ্গীতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি গান শিখেছিলেন কেবল পেশাদার ওস্তাদদের কাছে নয়, বাংলা গানও তিনি শিখেছিলেন শচীন দেববর্মণ এবং হিমাংশু দত্তের কাছে।

পরিচালক অথবা অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে আরও কয়েকজন মহিলা অভিনয় করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। জ্যোৎস্না গুপ্ত যেমন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা হীরালাল সেনের ছাত্র এবং আত্মীয়। আর–একজন অভিনেত্রী – প্রতিমা দাশগুপ্তের পিতা ছিলেন পদস্থ কর্মকর্তা এবং এনজিনিয়ার। সেকালে এ রকম অভিজাত ঘরের মেয়ের অভিনয় করার কথা নয়। কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

এ পর্যন্ত যেসব অভিনেত্রীর কথা উল্লেখ করেছি, তাঁদের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারি যে, পারিবারিক পটভূমি এবং পরিবারের সদস্যদের উৎসাহ অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের অভিনয়ে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেবিকা রানির (জন্ম ১৯০৮) পিতা কর্নেল চৌধুরী ছিলেন মাদ্রাসের সার্জন জেনারেল। আর দেবিকা নিজে লেখাপড়া আর অভিনয় শিখেছিলেন ইংল্যান্ডে। স্কুল জীবনেই তিনি তাঁর অভিনয়ের জন্যে রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব ড্র্যামাটিক আর্টসের বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। স্কুল জীবনের পরে তিনি অ্যাপ্লাইড আর্টসে লেখাপড়া শেখেন। এ সময়ে হিমাংশু রায়ও লন্ডনে ছিলেন এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯২৮ সালে পরিচালক হিমাংশু রায়ের আহ্বানে তিনি ভারতে ফিরে এসে নির্বাক ছায়াছবিতে অংশ নেন। পরের বছর – ১৯২৯ সালে – তিনি হিমাংশু রায়কে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি জার্মেনিতে গিয়ে চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেখাপড়া শেখেন। তা ছাড়া, ১৯৪০ সালে স্বামী মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মিলে অনেকগুলো ছায়াছবিতে কাজ করেন। এসবের মধ্যে ১৯৩৩ সালে ইংরেজি ছায়াছবি কর্ম বিশেষ খাতি অর্জন করে এবং ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের নানা দেশে দেখানো হয়। স্বামী

মারা যাওয়ার পর তিনি নিজেই চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা পরিচালক। ১৯৪৬ সালে তিনি এক রুশ ভদ্রলোককে বিয়ে করেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলে নানা রকমের কৃষি উৎপাদনের পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। সমাজসেবাতেও অংশ গ্রহণ করেন। তিনি চলচ্চিত্র জগতের একাধিক পুরস্কার পান। তা ছাড়া, ভারত সরকারের পদ্মশ্রী খেতাব লাভ করেন।

তরু ও অরু দত্তের বংশের মেয়ে দেবযানী দত্ত বিএ বিটি পাশ করেছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন আইসিএস কর্মকর্তা। একে নিজের খ্রিস্টান পটভূমি, তার ওপর স্বামীর উৎসাহে তিনি অভিনয়ে এসেছিলেন। প্রতিমা দাশগুপ্তও অভিনয় জগতে ঢুকেছিলেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। পরে কেবল অভিনয় নয়, তিনি চিত্র পরিচালনাও করেছিলেন। শোভা সেনগুপ্ত জন্মেছিলেন ১৯২৩ সালে আর তৃপ্তি মিত্র ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে। দুজনই উচ্চবংশের মেয়ে। শোভা সেনগুপ্তের পিতা ছিলেন ডাক্তার। তিনি নিজে বেথুন থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। কলেজে অভিনয় করে খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন আর স্বামীর উৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন আইপিটিএর সঙ্গে।

১৯৪৩ সালে তৃপ্তি মিত্রও যোগ দিয়েছিলেন আইপিটিএ–র সঙ্গে। তাঁর পিতা আশুতোষ ভাদুড়ী ছিলেন উকিল আর মা বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে তিনি দিনাজপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই কলেজ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর সম্পর্কীয় ভাই বিজন ভট্টাচার্যের লেখা আগুন নাটকে অংশ নেন। ঐ একই বছর আইপিটিএর উদ্যোগে মঞ্চস্থ বিজন ভট্টাচার্যের নাম–করা নাটক নবান্নেও অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অভিনয় দেখে খাজা আহমদ আব্বাস তাঁকে বোম্বেতে নিয়ে যান ৪৩–এর মন্বন্তর নিয়ে ধরতি কে লাল ছায়াছবিতে অভিনয় করার জন্যে। পরে ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি তক্কো আর গপ্পো ছবিতেও তিনি অভিনয় করেন।

সিনেমায় অংশ নিলেও, তৃপ্তি মিত্রের প্রধান খ্যাতি মঞ্চশিল্পী হিশেবে। ১৯৪৫ সালে শম্ভু মিত্রকে বিয়ে করার তিন বছর পরে তাঁরা দুজন মিলে কলকাতার বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এই গোষ্ঠী বাংলা নাটকের অভিনয়ে যুগান্তর এনেছিলো এবং আধুনিতার পথ দেখিয়েছিলো। এঁরা একদিকে বিদেশী ধ্রুপদী নাটক অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেন; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের রচিত অনেকগুলো নাটক একেবারে নতুন আঙ্গিক ও ঢংয়ে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের জন্যে তিনি ১৯৬২ সালে ভারতের সংগীত নাটক আকাদেমির সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। আর ১৯৭১ সালে লাভ করেন ভারত সরকারের পদ্মশ্রী খেতাব। ১৯৮৯ সালে তিনি মারা যান।

অভিনয়ের জগতে নারীদের আবির্ভাব হয়েছিলো কিছু দেরি করে এবং তাতে প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন সমাজে যাঁদের সুনাম ছিলো না, এমন নারীরা। এঁরা সবাই

ছিলেন নামে মাত্র হিন্দু। কিন্তু ১৮৮০-এর দশক থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের নারীরাও এতে যোগ দান করেন। আগেই লক্ষ করেছি, খ্রিস্টানরাও এসেছিলেন। কিন্তু মুসলমান নারী-পুরুষ কেউই সহজে অভিনয়ের পথে আসেননি। প্রথম যে মুসলমান সিনেমা অভিনেত্রীর কথা জানা যায়, তিনি বনানী চৌধুরী (জন্ম ১৯২৪)। তাঁর পক্ষেও অভিনয়ে অংশ নেওয়া সম্ভব হয়েছিলো স্বামীর উৎসাহে। তাঁর জন্যে এ পথ ছিলো দ্বিগুণ কঠিন। ইসলাম ধর্মে অভিনয় নিষিদ্ধ এবং পর্দাপ্রথাও কঠোর। তখনকার দর্শকরাও মুসলমানদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন না। সে জন্যে তাঁর মূল নাম আনোয়ারা গোপন রেখে বনানী নাম নিয়ে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছিলো।



তৃপ্তি মিত্র

বনানী চৌধুরী যে-পথ দেখান সেই পথ ধরেই দেশবিভাগের পরে, বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমান নারীরা অভিনয়-জগতের দিকে এগিয়ে যান। তাঁদের সামনেও ছিলো এক শো বছরের অভিনেত্রীদের দৃষ্টান্ত। সেই পথ ধরেই ঢাকার সিনেমায় ববিতা, শাবানা, চম্পা, ডলি জহুর, জয়া আহসান প্রমুখ এবং ঢাকার মঞ্চে ফেরদৌসী মজুমদার এবং সুবর্ণা মোস্তফার মতো অভিনেত্রী আত্মপ্রকাশ করেন। এঁদের অভিনয়-ক্ষমতা যে অফুরন্ত সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় অশনি সংকেত চলচ্চিত্রে ববিতা তা বলিষ্ঠতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ভদ্রঘরের অন্য মহিলারাও কেউ কেউ সত্যিকার নাম গোপন রেখে অভিনয়ে নেমেছিলেন। ভদ্রঘরের কোনো কোনো মহিলা অভাবে পড়েও অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন, সুনন্দা দেবী (জন্ম ১৯২১), সরযূবালা দেবী (জন্ম ১৯১২) এবং মলিনা দেবী (জন্ম ১৯১৪)। প্রভা দেবী, শিশুবালা এবং রমা বসুও – দারিদ্র্যের কারণে অভিনয় করেছিলেন। ভদ্রঘরের মহিলাদের মধ্যে মলিনা দেবী অথবা আঙুরবালার মতো কেউ কেউ মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন নৃত্যশিল্পী

হিশেবে – গোড়াতে তাঁরা অভিনয় করতেন না। পরে অভিনেত্রী হন। ইন্দুবালার মতো কেউ কেউ এসেছিলেন গায়িকা হিশেবে। মোট কথা, বিশ শতকের প্রথম ৩০ বছর বিশেষ বিশেষ কারণেই ভদ্রঘরের স্বল্পসংখ্যক মহিলা অভিনয়–জগতে এসেছিলেন। নয়তো তখনো বেশির ভাগ অভিনেত্রী আসতেন যাঁদের কুলশীলের পরিচয় নেই, এমনসব পরিবার থেকে।

কানন দেবীও হাওড়ার এমনি এক পরিবারে মেয়ে, জন্ম ১৯১৬ সালের দিকে। তাঁর মা তাঁর বাবার বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না। যতোদিন বাবা জীবিত ছিলেন, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ততোদিন খুব খারাপ ছিলো না। তাঁর বাবা ছিলেন একটি সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি। তা ছাড়া, ছোটো একটি দোকানও ছিলো তাঁর। কিন্তু কাননের বয়স যখন সম্ভবত বছর নয়েক তখন তিনি মারা যান। তার ফলে তাঁর মা দুই কন্যাকে নিয়ে খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন। দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মা এবং কানন দুজনই রাঁধুনী এবং ঝিয়ের কাজ করতে থাকেন। কিন্তু অপমান এবং লাঞ্ছনার মধ্যে তাঁরা সেখানে বেশি দিন থাকতে পারেননি। তারপর অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁরা একটি ক্ষুদ্র ভাড়ার বাড়িতে বাস করতে থাকেন। তখনো কিভাবে তাঁদের সংসার চলতো, কানন নিজে তা লেখেননি। হয়তো তখনো মায়েঝিয়ে মিলে ঝিয়ের কাজই করতেন। তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, তখন দু বেলা ভাত জুটতো না তাঁদের।

ভাত না–থাকলেও, কাননবালার একটা জিনিশ প্রচুর পরিমাণে ছিলো – রূপ। সেই রূপের ভরসাতেই সেখান থেকে একজন ভদ্রলোকের দয়ায় ১৯২৬ সালে একদিন তিনি ম্যাডানের স্টুডিওতে হাজির হন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী তাঁর বয়স তখন দশ। সেটাকে বারো/তেরো ধরলেও তিনি তখন বালিকাই ছিলেন। এমন কি, একদিন পরিচালকের থাপ্পড়ও খেয়েছিলেন। সেই বালিকা বয়সেই তিনি নির্বাক ছায়াছবি জয়দেবে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরের বছর আরও একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তার পরবর্তী তিন বছরের তিনি কোনো বিবরণ দেননি। হয়তো নিতান্ত গ্লানির মধ্যে কেটেছিলো বলে।

তাঁর সত্যিকারের অভিনয়–জীবন আরম্ভ হয় ১৯৩০ সালে। ততোদিনে চলচ্চিত্র নির্বাক থেকে সবাকে পরিণত হয়েছিলো। তাঁর এ পর্বের প্রথম ছবি জোর বরাত। এ ছবি মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৩১ সালে। কিন্তু তাতে বিশেষ নাম করতে পারেননি। এমন কি, পরবর্তী চার বছরও না। তবে সিনেমার–জগতে তিনি নিজের আসন পাকা করেন ১৯৩৫ সালে, মানময়ী গার্লস স্কুল চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ততোদিনে তিনি ভরা যৌবনে পৌঁছেছিলেন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসকার রবি বসু লিখেছেন যে, এ সময়ে কাননবালাকে দেখে যুবক এবং প্রৌঢ় অনেকেরই হৃৎস্পন্দন বেড়ে যেতো। রূপবাণী সিনেমায় এই ছবির একটি রোম্যান্টিক দৃশ্যে কাননের অভিনয় দেখে একদিন এক উদ্ভ্রান্ত যুবক নাকি পর্দার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন একবার কাননবালাকে একটু স্পর্শ করার জন্যে। কলকাতার রাস্তায় চট বিছিয়ে কাননের আলোকচিত্র বিক্রি হতো এ

সময়ে। সৌন্দর্যে এবং ফ্যাশনে তিনি এ সময়ে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। ভদ্রমহিলারাও এ সময়ে তাঁর ফ্যাশনের শাড়ি-ব্লাউজ পরতে আরম্ভ করেন। তাঁর ফ্যাশনের অলঙ্কার তৈরি করিয়ে নেন।

তাঁকে প্রথম জীবনে সবচেয়ে খ্যাতি এনে দিয়েছিলো মুক্তি (১৯৩৭)। পরের বছর বিদ্যাপতি এবং সাথীও জনপ্রিয় হয়েছিলো। ৪০-এর দশকের গোড়ায় তিনি পরিচয় এবং শেষ উত্তর ছবির জন্যে পর-পর দুবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। বস্তুত, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ - এই সময়টাই নায়িকা হিশেবে তাঁর সবচেয়ে খ্যাতির



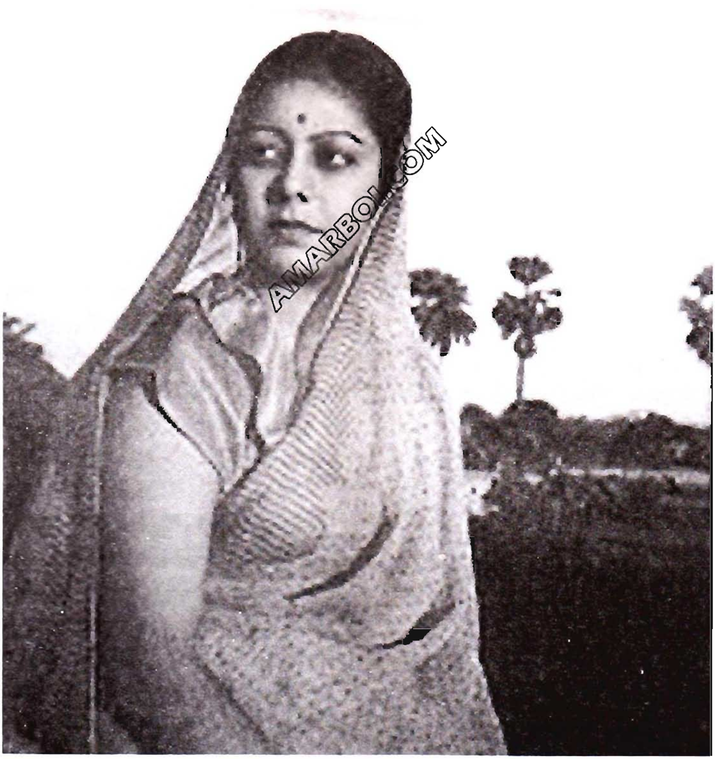
কানন দেবী, নায়িকার ভূমিকায়

পর্ব। এ সময়ে কাননবালা থেকে তিনি সম্ভ্রান্ত কানন দেবীতে পরিণত হন। তাঁর বয়সও হয় বছর তিরিশ।

অতঃপর তিনি রোম্যান্টিক নায়িকার বদলে স্ত্রী এবং মায়ের ভূমিকায় বেশি মানানসই হন। তিনি অভিনয়ে শান্ত সৌম্য সৌন্দর্য দিয়ে মায়ের যে-আদর্শ স্থাপন করেন, তা ছিলো অসাধারণ। মুক্তি ছবিতে তাঁর রোম্যান্টিক নায়িকার অভিনয় সাত দশক পরে এখন মনকে আন্দোলিত করবে কিনা, সন্দেহ হয়। কিন্তু তাঁর মেজদিদির

অভিনয় এখনো দর্শকের কাছে আদর্শ অভিনয় বলেই গণ্য হবে। কেবল মেজদিদি নয়, আলোচ্য কালে তিনি শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি বেশ কয়েকটি ছায়াছবিতে অভিনয় করেন। পাঠকরা যেভাবে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মানস দৃষ্টিতে কল্পনা করে নিয়েছিলেন, কানন দেবীর মধ্যে তাঁরা সেই চরিত্রগুলোকে যেন বাস্তবে দেখতে পেলেন।

তিনি নিজেও তাঁর এই শক্তির কথা জানতেন। সে জন্যে ১৯৪৮ সালে তিনি যখন নিজেই শ্রীমতী পিকচার্স নামে চলচ্চিত্রের কম্পেনি গড়ে তোলেন, তখন বেশির ভাগ ছবিই করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে। সেসব ছবিতে তিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই কম্পেনিতে এসে তিনি কেবল অভিনয় এবং প্রযোজনাই করেননি, তিনি পরিচালকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।



কানন দেবী, মায়ের ভূমিকায়

কাননের আর-একটি পরিচয় তিনি অভিনয় করতে করতে বিখ্যাত গায়িকায় পরিণত হন। বাড়ির কাছের একজন সাধারণ গায়কের কাছে হাতেখড়ি হলেও, পরে তিনি ওস্তাদ আল্লারাখার কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, নজরুল ইসলাম, অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের কাছেও তিনি নানা ধরনের গান শিখেছিলেন। চলচ্চিত্রে অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের সংগীত পরিচালনায় তিনি অনেকগুলো গান গেয়ে সেগুলোকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছিলেন। কেবল আধুনিক গান নয়, বহু রবীন্দ্রসংগীতও তিনি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান – আজি সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে – গেয়ে তিনি যে কেবল রবীন্দ্রনাথকেই খুশি করেছিলেন, তাই নয়, এ গানকে তিনি ভদ্রলোকের বসার ঘর থেকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর গাওয়া 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ', 'যদি ভালো না লাগে তবে দিও না মন', 'আমি বনফুল গো', 'অনাদি কালের স্রোতে ভাসা' ইত্যাদি গান ছিলো সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান।

কানন দেবীই সম্ভবত সমাজের নিচের তলা থেকে আসা শেষ বড়ো অভিনেত্রী। ১৯৪০-এর দশক থেকে পরিবার এবং সমাজ ভদ্রঘরের মহিলাদের অভিনয় মোটামুটি গ্রহণ করে নেয়। আমরা এর আগেই প্রেমিকা দেবী, দেবিকারানি, সাধনা বসু, কঙ্কাবতী, তৃপ্তি মিত্র এবং শোভা সেনগুপ্তের মতো এই শ্রেণীর কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করেছি। শিক্ষার বিকাশ, অভিনয় থেকে খ্যাতি এবং আর্থিক লাভ ইত্যাদি অনেক মহিলা এবং পরিবারকে এ দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে থাকবে। কোনো কোনো সিনেমার পরিচালক যে তাঁদের আত্মীয়াদের সিনেমায় নামিয়েছিলেন, তাও ভদ্রমহিলাদের অভিনয়ের পথ সুগম করেছিলো। এমন কি, অভিনেত্রীরা যে-ঘর থেকেই আসুন না কেন, কোনো সিনেমা-পরিচালক এবং সমাজের ওপর তলার পুরুষরা যে তাঁদের বিয়ে করছিলেন, তাও অভিনেত্রীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলো। তবে তখনো থিয়েটারে অভিনয় যতোটা গ্রহণযোগ্য ছিলো, সিনেমায় অভিনয় অতোটা নয়। সিনেমার পর্দায় যতোটা শরীর এবং নায়ক-নায়িকার ঘনিষ্ঠতা দেখানো হয়, চোখের সামনে মঞ্চে ততোটা দেখানো হয় না। এ হয়তো এর একটা কারণ। এখনো সিনেমা এবং মঞ্চে এই পার্থক্য এবং সে সম্পর্কে সমাজের মনোভাব বজায় আছে।

কানন দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে কিশোর বয়স থেকেই তাঁকে পর্দায় নগ্নতার অভিনয় করতে হয়েছে। তা ছাড়া, পর্দার বাইরেও কখনো নায়ক, কখনো পরিচালকের লোলুপতার শিকার হতে হয়েছে। কেউ হাত ধরে টানাটানি করেছেন, কেউ পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করেছেন, কেউ হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছেন ইত্যাদি। তাঁদের বাসনার যথাযথ উত্তর না-দেওয়ায় তাঁরা পরে কিভাবে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন, সে কথাও কানন লিখেছেন। জোর বরাত (১৯৩১) ছবির একটি দৃশ্যে সংলাপের পর হঠাৎ নায়ক তাঁকে জড়িয়ে ধরে ইংরেজি কায়দায় ঠোঁটে চুমু খান। কাননের বয়স তখন বছর ষোলো। এতে তিনি এতো হকচকিয়ে যান যে,

ধাক্কা দিয়ে নায়ককে সরিয়ে দেন। পরে এ জন্যে পরিচালক আর এ দৃশ্য দেখাতে পারেননি। কানন দেবী, বলা বাহুল্য, দারুণ ব্যথিত এবং অপমানিত হয়েছিলেন। পরিচালক তাঁকে জানান যে, নায়ক যা করেছিলেন, তা তাঁরই নির্দেশে করেছিলেন। কিন্তু কাননকে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি।

অভিভাবকহীন নিচুঘরের মেয়ে হওয়ায় টাকাপয়সার লোভ দেখিয়ে অথবা অভাবের সুযোগ নিয়েও নগ্নতা প্রদর্শনের জন্যে বাধ্য করা হয়েছে। এ রকমের একটি ছবি ছিলো বাসবদত্তা (১৯৩৫)। তিনি এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। হয়তো সে জন্যেই নগ্নতা সত্ত্বেও এ ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তাঁর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রযোজকরা কিভাবে তাঁকে টাকাপয়সার ব্যাপারে ঠকিয়েছেন, তাঁর আত্মজীবনীতে সে সম্পর্কেও বর্ণনা আছে।

১৯৫০-এর দশকে সমাজের নিষেধ এতোটাই দুর্বল হয়ে এসেছিলো যে, অভিজাত ঘরের বাইশ-তেইশ বছরের একজন স্ত্রী এবং সন্তানের জননী - সুচিত্রা সেনও সিনেমায় অভিনয় করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর শ্বশুর আদিনাথ সেন এবং স্বামী দিবানাথ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। স্বামীর কাছ থেকে সুচিত্রা কেবল অনুমতি আদায় করেননি, তিনি স্বামীকে সঙ্গে নিয়েই ছবির জগৎ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। স্বামীকে তিনি বর্ম হিশেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অসম্ভব নয় যে, তাঁর স্বামী এবং শ্বশুর মনে করেছিলেন যে, কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেই সুচিত্রার শখ মিটে যাবে এবং ঘরের বৌ ঘরে ফিরে আসবেন। কিন্তু অভিনয়ের জগতে এসে সুচিত্রা খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের প্রতিভার যথার্থ জায়গা। তাঁর অভিনয়ের যদি বা সীমাবদ্ধতা থাকেও, যা অসীম পরিমাণে পেয়েছিলেন তিনি, তা হলো খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা। থিয়েটারে তাঁর চেয়ে যোগ্য অভিনেত্রী তাঁর আগে এবং পরে আরও এসেছিলেন, কিন্তু বাংলা সিনেমার জগতে তাঁর চেয়ে কোনো অভিনেত্রীই বেশি খ্যাতি লাভ করেননি। তিনি ৫৩টি বাংলা এবং অন্য ভাষায় ৭টি ছবি করেছিলেন। এর বেশির ভাগই দর্শকদের মন কেড়েছিলো।



সুচিত্রা সেন

রোম্যান্টিক নায়িকার অভিনয়ের নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সুচিত্রা। তাঁর অসামান্য সৌন্দর্য, কথা বলার ভঙ্গি, স্মার্ট পোশাক, প্রেমবিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টি, নায়কের সঙ্গে সংকোচহীন ঘনিষ্ঠতা তরুণ–তরুণীদের মনে প্রেমিক–প্রেমিকার আদর্শ তুলে ধরেছিলো। মধ্যবিত্ত পরিবারে নিজেদের জীবনে যা ছিলো না, কিন্তু মনে মনে যে–জীবন তাঁরা কল্পনা করতেন, তারই প্রতিফলন তাঁরা লক্ষ করেছিলেন সুচিত্রা–উত্তমের অভিনয়ে। এমন কি, সুচিত্রা যখন বসন্ত চৌধুরী, অশোককুমার অথবা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তখন তাও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রোম্যান্টিক ভূমিকার সঙ্গে তাঁর নাম এমন সমার্থক হয়ে গিয়েছিলো যে, যখন তিনি চল্লিশের কোঠার শেষ দিকে পৌঁছলেন, যখন আর তাঁর পক্ষে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব ছিলো না, তখন তিনি পর্দা থেকে একেবারে পুরোপুরি সরে গেলেন, কানন দেবী অথবা অন্য সবার মতো মায়ের ভূমিকায় অথবা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হলেন না। আমার ধারণা, এ থেকে একদিকে তাঁর অত্যুজ্জ্বল পেশাদারী মনোভাব এবং সেই সঙ্গে আত্মমর্যাদা প্রকাশ পায়। তিনি সিকি শতাব্দী ধরে নিজের যে–ভাবমূর্তি দর্শকদের মনে তৈরি করেছিলেন, কোনো কিছুর বিনিময়ে তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুযোগ পেলে বিনোদিনী কী করতেন, বলা শক্ত। কিন্তু কার্যকারণে তিনিও আজীবন নায়িকাই থেকে গিয়েছিলেন।

বস্তুত, সুচিত্রার জনপ্রিয়তা কেবল তাঁকে বড়ো করেনি, বাংলা সিনেমারও অসাধারণ উপকার করেছিলো। বিশেষ করে তিনি উত্তমকুমারের সঙ্গে যে–তিরিশটি ছবি করেছিলেন, তা দর্শকদের হিন্দী ছবির দিক থেকে বাংলা ছবির দিকে নিয়ে এসেছিলো। নায়ক–নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা–উত্তমের জুটি বাংলা সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি। শুধু সিনেমাকে নয়, এই জুটি তাঁদের অভিনয় দিয়ে বাংলা গানকেও শ্রোতাদের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বহু গান রেকর্ডে শ্রোতাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতো কিনা সন্দেহ আছে, কিন্তু সিনেমার পর্দায় সুচিত্রা এবং উত্তম ঐ গান গাওয়ার অভিনয় করে সেসব গানকে অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

পেশাদারী ও ব্যক্তিগত জীবনে কানন এবং সুচিত্রার সফলতা–নিষ্ফলতা থেকে আরও একবার নারী এবং অভিনয় সম্পর্কে বাঙালি সমাজের দ্বৈতমানদণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। কানন দেবী এবং সুচিত্রা দুজনেই খুব সুন্দরী ছিলেন। যতো নিম্নঘরের কন্যা হন না কেন, অভিনেত্রী কাননকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন অনেকেই। যে–হেরম্ব মৈত্র থিয়েটারের পথ কোনদিকে পথচারীকে তা বলে দেননি, সেই তাঁরই পুত্র ব্যারিস্টার অশোক মৈত্র আভিজাত্যের পঙ্ক্তি এবং জাত ভেঙে তাঁকে বিয়ে করেন। তবে যে–পারিবারিক পিউরিটান মূল্যবোধের মধ্যে অশোক বড়ো হয়েছিলেন, হয়তো সে কারণেই কাননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। কানন তাঁকে কতোটা ভালোবেসেছিলেন জানিনে, কিন্তু ১৯৪৮ সালে তিনি রাজ্যপালের একজন

উচ্চকর্মকর্তার প্রেমে পড়েন। এই প্রণয়ের গভীরতা অনুভব করা যায় তাঁর আত্মজীবনী থেকে। এই কর্মকর্তা – হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন অশোক মৈত্রের মতোই ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে কাননের বিয়ে হয় এবং বাকি জীবন তাঁরা যদ্দুর মনে হয় সুখেই বাস করেন। হরিদাস অল্পদিনের মধ্যে কাননের মতোই প্রবেশ করেন চলচ্চিত্র জগতে, তবে অভিনেতা হিশেবে নয়, পরিচালক এবং প্রযোজক হিশেবে।

সুচিত্রার বিয়েও সুখের অথবা খুব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। তিনি যখন সিনেমা-জগতে প্রবেশ করেন, তখনও তিনি তা করেছিলেন ছদ্মনামে। তাঁর আসল নাম ছিলো রমা। অসম্ভব নয় যে, এই নামের আড়ালে তিনি এবং তাঁর পরিবার তাঁর সত্যিকার পরিচয় খানিকটা ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন। তারপর একের পর এক রোম্যান্টিক নায়িকার চরিত্রে সুচিত্রার প্রাণবন্ত এবং অন্তরঙ্গ অভিনয়কে তাঁর স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের অন্য সদস্যরা সম্ভবত বাস্তব বলেই গণ্য করেছিলেন। ফলে বিয়ের পনেরো–ষোলো বছর পরে – ১৯৬৩ সালে – তাঁদের বিয়ে ভেঙে যায়। কানন বিয়ে ভেঙে যাবার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন; সুচিত্রা তা করেননি। মাত্র ৩৪–৩৫ বছর বয়স থেকে এই অসাধারণ সুন্দরী এবং গুণী মহিলা বস্তুত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। আর তাঁর স্বামী ক্ষোভে, দুঃখে, পরনিন্দার ভয়ে দেশ থেকে চলে যান অনেক দূরে – অ্যামেরিকায়। সেখানেই তিনি মারা যান ১৯৬৯ সালে।

সুচিত্রা নিজেও ১৯৭৮ সালে চলচ্চিত্র থেকে অবসর নেন। এবং নিজেকে একেবারে গুটিয়ে বন্দী করেন চার দেওয়ালের মধ্যে। সুকুমারী থেকে আরম্ভ করে অন্যসব অভিনেত্রীর মতোই গুরুর কাছে দীক্ষা নেন তিনি এবং ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনেত্রী জীবনে অন্য পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং রূপ ও দেহকে দেখিয়ে দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করা যে পাপের – এ কথা রক্ষণশীল সমাজের মতো তাঁরা নিজেরাও বিশ্বাস করেছেন। সে জন্যেই সম্ভবত সুকুমারী থেকে সুচিত্রা পর্যন্ত সবাই পাপবোধ থেকেই শেষ জীবনে ধর্মকর্মে মন দিয়েছিলেন। আর সমাজের সমালোচনা এড়ানোর জন্যেই বোধহয় অনেক অভিনেত্রী সত্যিকারের নাম গোপন করে মঞ্চে নেমেছিলেন নকল নামের আড়ালে – সুকুমারী থেকে সুচিত্রা পর্যন্ত।

বাংলা অভিনয়ের এই এক শো বছরের ইতিহাসে বহু ইতিবাচক দিকই ছিলো। প্রথমে অভিনেত্রীদের দেখে রুচিবান ভদ্রলোকেরা থিয়েটার দেখাই বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁদের কন্যা এবং স্ত্রীদের মঞ্চে উঠতে দিয়েছেন, রূপালি পর্দায় হাজির হতে উৎসাহিত করেছেন। কেউ বা অভিনেত্রীদের ঘরের বৌ করে এনেছেন। নারীদের প্রতি বাঙালি পুরুষের মনে যেটুকু শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে, তার খানিকটা কৃতিত্ব এই অভিনেত্রীদেরও প্রাপ্য। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হয়েছে অভিনেত্রীদের দেখে দর্শকরা এখন ঘৃণা করেন না, বরং তাঁদের দেখতে ভিড় জমান। তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলেও নিজেদের ধন্য মনে করেন। সর্বোপরি, বাংলা চলচ্চিত্র যে একটা সময়ে অতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, তারও কৃতিত্বের একটা বড়ো অংশই তাঁদের।

অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে অনেক ভদ্রমহিলাই এখন বর্তে যাবেন। এমন কি, তাঁদের বিয়ে করতে পারলে এখন অনেক ভদ্রলোকও নিজেদের ধন্য মনে করবেন। সবচেয়ে বেশি যা লক্ষণীয়, তা হলো : অভিনেত্রীরা নিজেরাও এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয়েছেন। একটা সামাজিক এবং জাতীয় সমস্যা নিয়ে তাঁরা যে শাবানা আজমী অথবা অপর্ণা সেনের মতো একটা প্রতিবাদী অবস্থান নিতে পারছেন, তা একদিনে সম্ভব হয়নি। তার পেছনে রয়েছে শতবর্ষের অর্জনের ইতিহাস।

বস্তুত, বাংলা থিয়েটার ও সিনেমার ইতিহাসে পরিচালক এবং প্রযোজকরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, তেমনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন বহু অভিনেতা–অভিনেত্রী। তাঁরা কেবল বাংলা থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রকে এগিয়ে দেননি, বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন, চলাফেরা, পোশাক ইত্যাদিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে এ রকম প্রভাবশালী অনেকেই ছিলেন। বিশেষ করে যাঁদের নাম মনে পড়ে, তাঁরা হলেন বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, কানন দেবী এবং সুচিত্রা সেন। তাঁরা যে–গান মঞ্চে এবং পর্দায় গেয়েছেন, সে গান জনপ্রিয় হয়েছে। যে–ভঙ্গিতে শাড়ি পরেছেন, সেই ভঙ্গি ভদ্রমহিলারা অনুকরণ করেছেন। তাঁদের ভঙ্গিতে কথা বলা রপ্ত করেছেন। খোঁপা বেঁধেছেন। এমন কি, সুচিত্রার মতো চুলও ছেঁটেছেন অনেকে। বাঙালি মহিলাদের রুচি গঠনে এবং আত্মমর্যাদা অর্জনে এই অভিনেত্রীদের ভূমিকা তাই খুবই মূল্যবান।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, *তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী* (কলকাতা : রমা প্রকাশনী, ১৯৮৫ [প্রথম ১৯১৯–২০])।

কানন দেবী, *সবারে আমি নমি* (তৃ সং; কলকাতা : এম সি সরকার, ১৯৯১)।

গোলাম মুরশিদ, *সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, *সোনার দাগ* (কলকাতা : যোগমায়া, ১৯৮২।)

দেবনারায়ণ গুপ্ত, *বাংলার নট–নটী*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮৫)।

বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৮১।

বিনোদিনী দাসী, *আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য (কলকাতা : সুবর্ণরেখা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৮৭)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সপ্তম সং ১৯৯৮)।

রবি বসু, *স্মৃতির সরণিতে বাংলা চলচ্চিত্রের অর্ধশতাব্দী*, দুই খণ্ড (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮)।

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম আনন্দ সং; কলকাতা : ১৯৯৪)।

হায়াৎ মাহমুদ, *গেরাসিম স্তেপানিচ লিয়েবেদেফ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬)।

৮

প্রথম নারীবাদী

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

সাফল্য এবং খ্যাতি সব সময়ে কর্মনির্ভর নয়। সিদ্ধি লাভ হয় ক্বচিৎ এবং অনুকূল পরিবেশে। আর খ্যাতি লাভের সম্ভাবনা তার থেকেও ক্ষীণতর। বস্তুত, কাল এবং প্রতিবেশ, এমন কি, ভাগ্যের আনুকূল্য ছাড়া ব্যাপক স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত। সমকালের তুলনায় যাঁর চিন্তা ছিলো অত্যন্ত প্রাগ্রসর, কর্মবিমুখ সমাজে বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে অষ্টপ্রহর যিনি সুকঠোর কর্তব্যরত, বাক্য এবং কর্মে যিনি অভেদ, এমন একজন অসামান্য নারী – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রসঙ্গে এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে হয়। তিনি যে যথার্থই অসাধারণ নারী ছিলেন এবং বঙ্গদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে বিশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি যে বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, এ কথা অনস্বীকার্য। ১৯০৪ সালে, মাত্র ২৬ বছর বয়সে রোকেয়া লিখেছিলেন, পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরা কেবল গায়ের জোরে মেয়েদের বঞ্চিত করেছেন সকল ন্যায্য অধিকার থেকে। প্রবল সব বাধা অগ্রাহ্য করে যখনই

> কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন–রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। .. আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্যে পুরুষগণ এই ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোনো স্ত্রী–মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। ...ধর্ম আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।[১]

সত্য কথা এমন সরল অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে সেকালের আর কোনো বাঙালি নারী বলেছিলেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর পরেও অন্য কেউ বলেছেন বলে আমার সঠিক জানা নেই। কিন্তু যা ঠিক জানি, তা হলো : একশো বছর পরে একুশ শতাব্দীতে এসে কোনো বাঙালি নারীর পক্ষে এ কথা বলা আরও শক্ত হয়েছে ধর্মীয় জাগরণের ফলে।

ভাবতে অবাক লাগে কোনো আধুনিক সেকিউলার পরিবারে রোকেয়া লালিত নন। তাঁর জন্ম রংপুরের একটি গ্রামের ঐতিহ্যিক মুসলিম পরিবারে। পিতা জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলি হায়দার সাবের যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত ছিলেন তাও নয়। এমন কি, তিনি ইংরেজি ভালো জানতেন, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণও নেই। তবে ১৮৭৩ সালে তিনি স্কুল কমিটির সদস্য ছিলেন, তা থেকে মনে হয় তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। মাজেদা সাবের তাঁর রোকেয়ার উত্তরসূরি গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, তিনি উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভালো জানতেন।[২]

স্ত্রী এবং সন্তান থাকা সত্ত্বেও সিপাহি বিপ্লবের সময়ে ইংরেজ অথবা আইরিশ এক মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। হতে পারে, বিপদগ্রস্ত ছিলেন বলেই সে মহিলা তাঁর শরণার্থী হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য কেউ দেননি। মাজেদা সাবের অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই তৃতীয়া স্ত্রী ইউরোপীয় ছিলেন না, ইরানী ছিলেন। কিন্তু বংশীয় আত্মীয় বলে তিনি হয়তো শুনেই লিখেছেন। রোকেয়ার পিতা চতুর্থ বিয়েও করেছিলেন। এই বিদেশিনীর সঙ্গে রোকেয়ার পিতার বিবাহ বেশি দিন টেকেনি।

তবে, মনে হয়, ইংরেজ মহিলা আলি সাবেরের মনে ইংরেজপ্রীতির স্থায়ী ছাপ রেখে যান। অথবা এমনিতেই তাঁর মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হওয়া সম্ভব। হতে পারে তারই ফলস্বরূপ, আলি সাবের তাঁর দুই পুত্রকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করান। তাঁর এই দুই ছেলের মধ্যে একজন ইবরাহিম সাবের সম্ভবত ১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বিএ পাশ করেন। সম্ভবত বলার কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে এঁর নাম আছে মুহাম্মদ ইবরাহিম। নামের শেষে সাবের নেই। সেকালে ইবরাহিম নামের অনেকে সেন্ট জেভিয়ার্সে লেখাপড়া করতেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, এই বিশেষ ইবরাহিমের বয়সও রোকেয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই মনে হয়। এ থেকে আমার ধারণা, ইনিই ছিলেন ইবরাহিম সাবের। এ বিষয়ে মাজেদা সাবের ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে তিনি তাঁর মতের পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। একই সেন্ট জেভিয়ার্সে একই সময়ে দুজন ইবরাহিম থাকার সম্ভাবনা আমার কাছে ক্ষীণ বলে মনে হয়।

রোকেয়ার পিতার মোট সন্তান ক'টি তা সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে রোকেয়ার মায়ের সঙ্গে আলি সাবেরের দুই পুত্র ছাড়া রোকেয়া সহ তিন কন্যা এবং পুত্ররা ছিলেন। পুত্রদের শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা করলেও, সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার রীতি না থাকায়, এবং মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব হিন্দুদের তুলনায় আরও বেশি প্রবল থাকায়, কোরান ছাড়া মেয়েদের তেমন লেখাপড়া শেখানোর কথা তিনি ভাবেননি। জ্যেষ্ঠ কন্যা করিমুন্নেসা (১৮৫৫–১৯২৬) কোরান ছাড়াও খানিকটা উর্দু এবং ফার্সিও শিখেছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বাংলা পড়তে শেখাননি। মেধাবী করিমুন্নেসা অবশ্য বাংলা শেখেন ভাইদের বাংলা পড়তে দেখে, স্বচেষ্টায়। তাঁর দৃষ্টান্ত আরও অর্ধ শতাব্দী আগেকার হিন্দু সমাজের আর–এক অসাধারণ নারী – রাসসুন্দরী

দেবীর দৃষ্টান্তকেই মনে করিয়ে দেয়। একদিন বাংলা পুঁথি পড়ার সময়ে পিতার কাছে ধরা পড়ে করিমুন্নেসা বিব্রত হন। সমাজের চাপে অল্প কালের মধ্যে মত বদল করলেও, অপ্রত্যাশিত ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তাঁর পিতা তাঁকে তখনকার মতো বাংলা শিখতে উৎসাহই দেন, বরং তাঁর শিক্ষার প্রতি স্থায়ীভাবেই উদার মনোভাব বজায় রাখেন। ওদিকে, করিমুন্নেসার বাংলাপ্রীতি এবং তাঁর দু ভাই-এর পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত উদার হৃদয় রোকেয়ার মানসিক বিকাশের সহায়ক হয়েছিলো নিঃসন্দেহে।

রোকেয়ার জন্মতারিখ কারও জানা নেই। ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জন্মেছিলেন বলে শামসুন নাহার মাহমুদ দাবি করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেননি। বস্তুত, এ দাবি কিংবদন্তিমূলক। প্রথম কন্যা হিশেবে করিমুন্নেসার জন্মতারিখ বোধহয় লেখা ছিলো। কিন্তু রোকেয়ার জন্মতারিখের কথা কেউ লিখে রেখেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে আত্মীয়দের মধ্যে অমুক অমুকের চেয়ে এতো বছরের বড়ো কি ছোটো বলে বয়স নির্ণয়ের রেওয়াজ সেকালেও ছিলো, একালেও আছে। বলা হয়ে থাকে যে, করিমুন্নেসার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল হালিম গজনভির চেয়ে রোকেয়া এক বছরের ছোটো। রোকেয়া নিজেই অবরোধবাসিনীতে লিখেছেন যে, তাঁর বয়স যখন পাঁচ, হালিমের বয়স তখন ছয়। হালিমের



রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

জন্মতারিখ ১৮৭৬ সালের ১১ নভেম্বর। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে রোকেয়া ১৮৭৭ সালের শেষ দিকে অথবা ১৮৭৮ সালের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮০ সালে নয়। আমরা ১৮৭৮ সাল ধরেই তাঁর বয়স হিশেব করবো। কিন্তু তাঁর জন্মদিন অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

১৮৭৮ সাল নাগাদ কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূরা কেবল পর্দা ভাঙেননি, অনেক ঐতিহ্যিক মূল্যবোধেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানদা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গেই লক্ষ করেছি যে, তিনি জামাজুতো পরে এবং পর্দা ভেঙে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন ১৮৬৪ সালে। গভর্নর জেনারেলের পার্টিতে গিয়েছিলেন ১৮৬৭ সালে। আর স্বামীকে ছাড়া সন্তানদের নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন ৭৭ সালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী স্বামীর পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে গড়ের মাঠে গিয়েছিলেন ৭৩/৭৪ সালের দিকে। কিন্তু আধুনিকতার ঢেউ সমাজের সর্বত্র সমান অথবা একই সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশেষ করে আলি সাবেরের মতো অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো মহিলাদের শিক্ষিত করার অথবা তাঁদের বন্দীত্ব ঘোচানোর প্রশ্নে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। বাইরে যাওয়া দূরে থাক, মুসলমানদের মধ্যে পর্দাপ্রথা কী ভয়ানক কঠোরতার সঙ্গে পালিত হতো রোকেয়ার অবরোধবাসিনী থেকে তা ভালো করে জানা যায়। সে তুলনায় রোকেয়ার পরিবার ছিলো খানিকটা উদার। সেই আনুকূল্যের মধ্যেই রোকেয়া লালিত হন।

রোকেয়ার শৈশবেই করিমুন্নেসা বিধবা হন। অতঃপর করিমুন্নেসা তাঁর দু পুত্রের সঙ্গে রোকেয়াকেও মানুষ করেন। উর্দু, ফারসি আর আরবি ছাড়াও, রোকেয়া বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন করিমুন্নেসার কাছে, আর ইংরেজি শেখার প্রেরণা পান তাঁর ভাই ইবরাহিম সাবেরের কাছ থেকে। তবে বাংলা নয়, উর্দু ছিলো রোকেয়ার বলতে গেলে মাতৃভাষা। উর্দু তিনি এতো ভালো শিখেছিলেন যে, তাতে তিনি তাঁর রচনাও প্রকাশ করেছিলেন। ফারসিও তিনি খুব ভালো শিখেছিলেন।

নিজস্ব স্টাইল না-থাকলেও, তাঁর প্রকাশিত বাংলা রচনাসমূহ প্রমাণ করে যে, এতে তাঁর বুনিয়াদ রীতিমতো মজবুত ছিলো। তাঁর Sultana's Dream এবং তাঁর ইংরেজিতে লেখা চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজিও তিনি ভালো শিখেছিলেন। Sultana's Dream বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত নয়, তিনি ইংরেজিতেই এ পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন। তাঁর আগে হাতে-গোনা কজন বাঙালি মহিলার ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁরা বাংলায় লেখেননি। আপন চিন্তাকে রোকেয়া মূর্ত করেন ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই। অরু এবং তরু – দুই বোন এবং সরোজিনীর সঙ্গে রোকেয়ার পারিবারিক এবং সামাজিক পার্থক্য ছিলো প্রায় আকাশ-পাতাল, সেটা এখানে মনে রাখা দরকার।

য়োরোপে যাওয়া এবং পিতামাতার অমন আনুকূল্য লাভ করা দূরে থাকুক, স্বদেশের কোনো বিদ্যালয়েও রোকেয়া লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। পাওয়ার কথা নয়। কারণ, ব্রাহ্ম অথবা পাশ্চাত্য প্রভাবিত হিন্দু পরিবারে দুচারটা ব্যতিক্রম

দেখা দিলেও, মুসলমান পরিবারের একটি মেয়ের পক্ষে তখন পর্দা ভেঙে বিদ্যালয়ে যাবার কল্পনাও করা যেতো না। শিক্ষিত হলেও, তাঁদের পরিবারে এই পর্দা প্রথা কতো কঠোর ছিলো, তাঁর নিজের জবানি থেকেই তা জানা যায়। বাড়িতে কোনো স্বল্প পরিচিত মহিলা বেড়াতে এলেও, পাঁচ বছরের রোকেয়াকে পর্দা করতে হতো। একবার বাইরের মহিলারা বেড়াতে এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। তখন কয়েক দিন প্রাণপণ প্রযত্নে প্রায় অনাহারে কখনো চিলেকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকেছেন তিনি। প্রায় সমবয়সী – ছ বছরের হালিম কখনো যদি তাঁকে একটু দুধ এনে দিতেন, তা হলে সেটাই হতো তাঁর একমাত্র পথ্য।

অবরোধের দারুণ যন্ত্রণা ব্যক্তিগত জীবনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। করিমুন্নেসা এবং সেকালের লক্ষ লক্ষ মহিলাও করেছিলেন। তাই নারীদের জীবন এবং শিক্ষার বিকাশে অবরোধ মোচন করা যে আবশ্যিক রোকেয়া তা তাঁর বিভিন্ন রচনায় জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু অবরোধ মোচন করতে হবে, তার চেয়েও বড়ো কথা নারীসমাজকে মুক্ত করতে হবে বহু শতাব্দীর দৃঢ়মূল বন্ধন থেকে – এ চেতনা তিনি কোথায় পান, তা বলা শক্ত। যে অকিঞ্চিৎকর তথ্য আমার হাতে আছে, তা থেকে নিশ্চিত হদিস দেওয়া অসম্ভব। অনুমান হয়তো সম্ভব। রোকেয়া সম্পর্কে কয়েকখানা বই এবং তাঁর কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হলেও, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রধান অংশই এখনো অজ্ঞাত। বর্তমান রচনা মূলত রোকেয়ার রচনাবলীর ওপর নির্ভরশীল। এবং এর লক্ষ্য প্রধানত তাঁর চিন্তার বিবর্তন দর্শানো।

তাঁর বিয়ে হয় সে যুগের তুলনায় বেশ পরিণত বয়সে – সম্ভবত প্রায় আঠারো/উনিশ বছরের সময় অর্থাৎ ১৮৯৫ সালের দিকে। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিলো প্রায় চোদ্দো বছর – এ কথা তিনি নিজেই লিখেছেন। সরলা রায়ের মতে, রোকেয়া বেঁটে হলেও দেখতে সুন্দরী ছিলেন। অপর পক্ষে, তাঁর বিয়ে হয় যাঁর সঙ্গে, তিনি ছিলেন খুব লম্বা এবং কালো।[৩] তা ছাড়া, তাঁর বয়স ছিলো প্রায় ৪০ বছর এবং তিনি ছিলেন বিপত্নীক। আগের পক্ষের, এক বয়স্কা কন্যাও ছিলেন তাঁর। রোকেয়ার সঙ্গে এই বিয়ের যোগসূত্র ছিলেন রোকেয়ার দুই বড়ো ভাই। তাঁদের সঙ্গে রোকেয়ার ভবিষ্যৎ স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের পরিচয় ছিলো। সাখাওয়াত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভাগ্যের কী পরিহাস! পরবর্তী কালে যিনি হন নারীমুক্তি আন্দোলনের এতো বড়ো অগ্রদূত, তাঁর বিয়ে হয় তাঁর চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বয়সী এক দোজবরের সঙ্গে। তবে আপাতদৃষ্টিতে যতোটা দুর্ভাগ্যজনক মনে হোক না কেন, বাস্তবে বিয়েটা রোকেয়ার জন্যে তেমন শোচনীয় ছিলো না। বরং আমার ধারণা, বিয়েই হঠাৎ রোকেয়াকে মুক্তি দেয় পৈতৃক পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে, যেখানে তাঁর সত্যিকার অর্থে কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন, কিন্তু মনে হয়, সাখাওয়াতের সাহচর্যই তাঁকে অসাধারণ ঔদার্য দান করে।

প্রথম দিকের সরকারি কাগজপত্রে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ১৮৫৫ সালের শেষ দিকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে এটাকে শুধরে ১৮৫৬ সালের ১১

জুলাই বলে লেখা হয়েছে। ১৮৭৫ সালে পাটনা কলেজ থেকে তিনি এফএ পাশ করেন, দ্বিতীয় বিভাগে। তারপর হুগলি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন ১৮৭৮ সালে। পাশ করেই তিনি কোনো চাকরি করেছিলেন কিনা অথবা করে থাকলে কী করেন, তা জানা যায় না। কিন্তু সরকারি কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তিনি সপ্তম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে মালদায় কাজ আরম্ভ করেন।[৪]

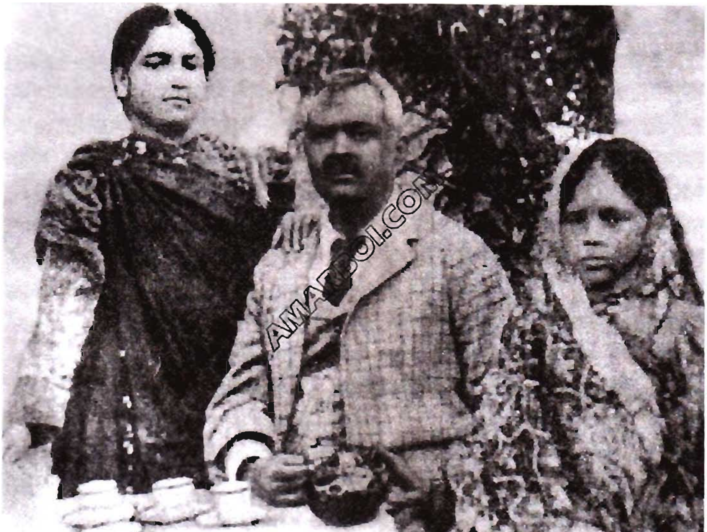
১৮৮০ সাল থেকে সরকার কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে বৃত্তি দিতে আরম্ভ করে। এই বৃত্তি নিয়ে তিনি কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন। একই বৃত্তি নিয়ে গিরিশচন্দ্র বসু এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও বিলেতে গিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালের পর প্রায় তিন বছরের জন্যে তাঁর চাকরি ডিরেক্টর অব অ্যাগ্রিকালচারের অধীনে বদলি করা হয়েছিলো। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ১৮৮৫ সালের শেষ দিকে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতে যান। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে যাওয়াই সম্ভব, কারণ এ সময়ে নতুন শিক্ষা বছর শুরু হয়। তাঁর বিলেতে অধ্যয়নের ফলে তিনি এম.আর.এ.সি. – মেম্বার রয়্যাল কলেজ অব অ্যাগ্রিকালচার হয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি কটকে কাজে যোগদান করেন কনিকা ওয়ার্ড এস্টেটের ম্যানেজার হিশেবে। পরের বছর হুগলিতে সপ্তম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে কাজে ফিরে যান ১৪ অগস্ট তারিখে। প্রায় বছরখানেক কটকে ছিলেন। শাহাবাদ, চম্পারন, বীরভূম এবং বর্ধমানেও তিনি অল্পকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তবে চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি তাঁর জন্মস্থান ভাগলপুরে কাটিয়েছিলেন। চাকরিতে উন্নতি করে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটি পর্যন্ত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আর–একটি কথা উল্লেখযোগ্য – সে হলো : গিরিশ বসু কৃষিবিদ্যা শিখে এসে যে–পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, সাখাওয়াতও বিলেত থেকে ফেরার পর সেই পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন – তবে বাংলায় নয়, ইংরেজিতে।[৫]

পাশ্চাত্য সমাজে এবং সেখানকার শিক্ষায়ই সাখাওয়াত সম্ভবত নারীমুক্তির আদর্শ প্রত্যক্ষ করেন। কেবল তত্ত্ব হিশেবে জানাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাকে তিনি নারীমুক্তির ধারণা দিয়ে রীতিমতো অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অশিক্ষিত প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে হয়তো তিনি এই নবলব্ধ আদর্শে সংস্কৃত করতে ব্যর্থ হন। অপর পক্ষে, রোকেয়াকে তিনি পেয়েছিলেন উৎসুক এবং আগ্রহী শিষ্যা হিশেবে। বিয়ের আগে রোকেয়া ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু বেশি শিখেছিলেন বলে কোনো তথ্য জানা যায় না। বিয়ের পরে সাখাওয়াত তাঁকে যত্নের সঙ্গে ইংরেজি শেখান। তা ছাড়া, পত্রিকায় লেখার অনুপ্রেরণাও দিয়েছিলেন তিনিই, নয়তো রোকেয়ার পরিবারে অন্য কেউ পত্রপত্রিকায় লেখেননি।

রোকেয়া যে নারীদের স্বাধীনতা এবং নারীপুরুষের সমকক্ষতার কথা অমন জোর দিয়ে লিখতে পেরেছিলেন, আমার ধারণা, তার পেছনেও ছিলো স্বামীর সমর্থন। সাখাওয়াত যখন বিলেতে ছিলেন তখন সেখানে চলছিলো নারীদের ভোটাধিকার,

উচ্চশিক্ষার অধিকার এবং স্বামীর সম্পত্তিকে অধিকার নিয়ে আন্দোলন। মনে হয়, এই আন্দোলন তিনি কাছ থেকে লক্ষ করেছিলেন এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিয়ের পর সেই অনুপ্রেরণাই তিনি রোকেয়ার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। সে জন্যে, আমার মতে, রোকেয়ার বিয়ে আপাতদৃষ্টিতে যতই বেমানান হোক না কেন, আসলে এ হয়েছিলো তাঁর জন্যে একটা আশীর্বাদ।

মতিচূর–এর (দ্বিতীয় খণ্ড) উৎসর্গপত্রে করিমুন্নেসাকে উদ্দেশ্য করে রোকেয়া বলেন, তিনিই তাঁকে বর্ণপরিচয় পড়তে শিখিয়েছিলেন। ভাগলপুরে উর্দুভাষী পরিবারের স্ত্রী হিশেবে চোদ্দো বছর এবং কলকাতায় উর্দু স্কুলের পরিচালিকা হিশেবে নিরন্তর উর্দু বলেও তিনি যে বাংলা ভাষার চর্চা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন, সে কেবল করিমুন্নেসারই আশীর্বাদে। পদ্মরাগ উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেন ইবরাহিম



স্বামী সাখাওয়াতের সঙ্গে রোকেয়া

সাবেরকে। এতে তিনি বলেন : পিতা, গুরু ইত্যাদি কেমন, তিনি তা জানেননি, জেনেছেন কেবল ভ্রাতাকে। এবং সেই ভাইই তাঁকে আপন হাতে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এই দুই উক্তি সত্ত্বেও মনে হয়, তাঁর উচ্চশিক্ষিত এবং স্নেহশীল স্বামীই অনুক্ষণ তাঁকে লেখাপড়া করতে উৎসাহ দেন। সাখাওয়াত উর্দুভাষী ছিলেন, আনুষ্ঠানিক বাংলা হয়তো সামান্যই জানতেন। তবে তিনি হুগলিতে লেখাপড়া করেছেন এবং ক বছর বঙ্গদেশে চাকরি করেছেন। সেই সুবাদে তিনি মৌখিক বাংলা হয়তো জানতেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে বাংলা বলা হতো না। স্বামীর বাড়িতে রোকেয়া যে কখনো বাংলা বলার

সুযোগ পাননি, নিজেই তা বলেছেন মতিচূরে। কিন্তু সাখাওয়াত তবু তাঁকে বাংলা লিখতে এবং তা পত্রিকায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন, এ অনুমান সমীচীন। অন্তত Sultana's Dream পড়ে সাখাওয়াত যে উৎসাহিত হন, রোকেয়ায় তা উল্লিখিত আছে।

রোকেয়া নিজে যেসব পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থাদির উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া তিনি আর কী পড়তেন, পড়েছিলেন, জানা নেই। সমকালীন পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থাদি তিনি যে নিয়মিত পড়তেন, তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার উল্লেখ আছে। প্রধান প্রধান ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকের নাম ছাড়াও, John Howard Payne, Ellen Hooper প্রমুখ অপ্রধান কবি-সাহিত্যিকের উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি আছে তাঁর রচনায়। সেকালের খ্যাতনামা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। এমন কি, কামিনী সেন, মানকুমারী বসুও বাদ যাননি। কিন্তু যা বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো : সমকালীন ইংরেজি আর উর্দু পত্রপত্রিকার নাম।

স্থায়ী খ্যাতি লাভে ব্যর্থ হলেও, মেরি করেলি (Marie Corelli, ১৮৫৫-১৯২৪) ছিলেন সেকালের বেস্ট সেলার। তাঁর আসল নাম মেরি ম্যাকায়। মানুষের কোমল বৃত্তিগুলোকে নাড়া দিয়ে কী করে জনপ্রিয় লেখিকা হওয়া যায়, কোন ইস্যুগুলো সমসাময়িক সমাজকে স্পর্শ করবে, এসব তিনি খুব ভালো জানতেন। ধর্মীয় আবেগকে, যেমন, তিনি খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু নারীর স্বাধীনতা, নারীর আপন পরিচয় ইত্যাদি কোনো কোনো থীম ছিলো তাঁর একেবারে নিজস্ব বিষয়। বস্তুত, চিরকুমারী মেরি নারীমুক্তি সম্পর্কে কেবল যে অবহিত ছিলেন, তাই নয়, তাঁর অনেকগুলো উপন্যাসেই এই ভাবনাকে, পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহকে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন। The Murder মত Delicia (১৮৯৬) উপন্যাসেও নারীমুক্তির ধারণা বিশেষভাবে কাজ করেছিলো।

এ রকম একটা কাহিনী ইংরেজি না-জানা বাঙালি মহিলারা জানবেন না, এটা রোকেয়া চাননি। সে জন্যে এ উপন্যাসের কাহিনীটাকে সংক্ষেপে তিনি পরিবেশন করেছিলেন বাংলা ভাষায়। সেই সঙ্গে তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ডেলিসিয়ার সঙ্গে দাসত্ব মনোভাবাপন্ন বাঙালি নারীর তুলনা করেন। মেরি করেলির সঙ্গে, আরও সরাসরি ভাবে বললে, ডেলিসিয়ার সঙ্গে, রোকেয়ার বক্তব্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। রোকেয়া নিজেও তা স্বীকার করেছেন। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, এ সাদৃশ্য যখন প্রকাশ পায় তখনো পর্যন্ত তিনি দ্য মার্ডার অব ডেলেসিয়া পড়েননি। বই না পড়লেও, পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং ভাবধারা থেকেই নারীমুক্তির আদর্শ তিনি স্বীকরণ করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

পাশ্চাত্যের আর-একটি অসাধারণ প্রভাব পড়েছিলো রোকেয়ার ওপর – সেটি বিজ্ঞানের। একে একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী বলে আখ্যায়িত করতে হবে। কারণ, ১৮৭০-এর দশকেও বিজ্ঞান তো দূরের কথা, গণিতকেও নারীদের শিক্ষার জন্যে অনুপযোগী বিষয় বলে গণ্য করা হতো। সেকালের কোনো বাঙালি নারীর রচনায়

পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন সম্পর্কিত তথ্য তথা বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের এমন সরল প্রকাশ এবং তার প্রতি কৌতূহল – এক কথায়, বিজ্ঞানমনস্কতা লক্ষ করা যায় না। হয়তো বিলেতে কৃষিবিদ্যায় প্রশিক্ষিত স্বামীর সাহচর্যেই বিজ্ঞানে রোকেয়ার হাতে–খড়ি হয়েছিলো। কিন্তু হাতে–খড়িতেই তা সমাপ্ত হয়নি। বিজ্ঞান বিষয়ক গভীর আগ্রহ এবং সাধারণ জ্ঞান তাঁর চিন্তাকে সমুজ্জ্বল করেছিলো। বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ছাপ মুদ্রিত বিশেষ করে তাঁর সুলতানার স্বপ্নে।

পথে নারী বিবর্জিতা – এ বহুকালের পুরোনো লোকোক্তি। বাঙালিদের মধ্যে অবশ্য কেবল নারী নয়, পুরুষেরাও ভ্রমণে অপটু এবং কৌতূহলবর্জিত। সৌভাগ্যক্রমে রোকেয়া উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত ব্যাপকভাবে ঘুরেছিলেন। এমন কি, বিমানেও চড়েছিলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভ্রমণ তাঁর দৃষ্টিকে প্রশস্ত করে থাকবে। মোট কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করলেও, রোকেয়া স্বগঠিত এবং স্বশিক্ষিত মানুষ। এর পেছনে ছিলো ব্যাপক অধ্যয়ন, সযত্ন পরিশীলন, আর বিয়ের পরে স্বামীর আনুকূল্য।

দুই

'আমাদের সব কার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়, সিদ্ধি করতালী লাভে।' – বাঙালিদের সম্পর্কে রোকেয়ার এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে সত্যের অভাব নেই। অন্তত নারীমুক্তি সম্পর্কে যে–মহিলারা সেকালে ধীরে ধীরে সচেতনতা লাভ করছিলেন, এমন কি, কমবেশি সচেতনতার ছাপ রাখছিলেন তাঁদের রচনায়, তাঁদের সম্পর্কে এ কথা আদৌ অপ্রযোজ্য নয়। তাঁরা কেউ রোকেয়ার মতো একই সঙ্গে তাঁদের রচনায় এবং বাস্তব জীবনে নারীজাগরণের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়োজিত করেননি, বোধ হয় কৃষ্ণভাবিনী দাস অথবা সরলা ঘোষালও নন।

উন্নতি এবং মুক্তির প্রথম শর্ত শিক্ষা, নিজেকে এবং জগৎকে জানা – এ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সে জন্যেই পণ করেছিলেন যে, অশিক্ষিত নারীদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক যতোটুকু পারেন ছড়িয়ে দেবেন আপন সীমিত শক্তি নিয়ে। সম্ভবত স্বামীর জীবদ্দশাতেই তিনি এ সংকল্প করেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং পরিচালনার জন্যে স্বামী তাঁকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। মাত্র ৩১/৩২ বছর বয়সে – ১৯০৯ সালের তেসরা মে রোকেয়া বিধবা হন। শেষ দিকে সাখাওয়াত দীর্ঘদিন ডায়াবেটীস রোগে কষ্ট পান। ১৯০৮ সালের জানুআরি মাসে তিনি দেড় বছরের জন্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি নিয়েছিলেন। কিন্তু ছুটি শেষ হবার অল্প আগেই তিনি একেবারে স্থায়ী ছুটি নেন।[৬]

বয়সের বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রোকেয়া তাঁর স্বামীকে যে আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায়। রোকেয়ার পদ্মরাগ উপন্যাসের নায়িকার উক্তি এ রূপ :

> বিধবার স্বামী–স্মৃতিরূপ বহুমূল্য সম্পদ থাকে। পতিধ্যান তাহার নিত্যসহচর। ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ সংসারে পতিস্মৃতি তাহার একমাত্র সহায়। ...দেবর, ভাশুর এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ছলে কৌশলে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এই 'সতীর দেবতা পতি, জীবনের সার/ তেঁই যাচি পূজিবারে চরণ তোমার' – ভাবটুকু অপহরণ করিতে পারে না! ইহাই বিধবার জীবনসর্বস্ব।

আত্মীয়রা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিলেও, রোকেয়া জীবনে অতঃপর কিন্তু স্বামীস্মৃতিই সর্বস্ব হয়নি; সেই স্মৃতিকে সম্বল করে তিনি সংসারের ছোট্টো একটি কোণে হাতে–কলমে নারীমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিন্তু সাখাওয়াতের পূর্বপক্ষীয় কন্যা এবং সেই কন্যার স্বামীর পীড়নে অল্পকালের মধ্যে তিনি চিরকালের জন্যে ভাগলপুর ছাড়তে বাধ্য হন। নিজের দুই শিশুকন্যার কবর দেখতেও তিনি আর কখনো ভাগলপুরে যেতে পারেননি। আত্মীয়দের এই প্রতিকূলতার দরুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তবে বাধা পেলেও নিরুৎসাহ হননি তিনি। কলকাতায় গিয়ে এক বছর পাঁচ মাস পরে, ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ তিনি আর–একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন। এবারে ছাত্রী সংখ্যা আট। আর স্বামীর স্মৃতি জাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের নাম দেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল'। বিদ্যালয়টি ১৯১৫ সালে উচ্চপ্রাথমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়, আর নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয় ১৯১৭ সালে। তখন ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭–এ।[৭] উচ্চ শ্রেণীতে কন্যাদের পাঠাতে তখনো মুসলমানদের ঘোর আপত্তি। ছাত্রীর অভাবে তাই ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত বিদ্যালয়টি রীতিমতো মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক পটভূমি কী এবং পরিচালক এবং পৃষ্ঠপোষক কারা, আমার তা জানা নেই – একটি দুটি ক্ষেত্র ছাড়া। গোড়াতে উদারপন্থী রাজনীতিক এবং ব্যারিস্টার গোলাম রসুল এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁরা কন্যাদের এ স্কুলে পাঠাতেন তাঁর মধ্যে একজনের পরিচয় জানি – পাবনার এক পুলিশ কর্মকর্তা তিনি, মোহাম্মদ ইয়াসীন। এ প্রবন্ধের শেষে এঁকে লেখা বেগম রোকেয়ার কয়েকটি চিঠি থেকে বোঝা যাবে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে রোকেয়া কেমন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে তিনি কিভাবে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। মনে হয় কলকাতার এবং দু–একটি ক্ষেত্রে মফস্বলের শিক্ষিত, অভিজাত এবং তুলনামূলকভাবে কম রক্ষণশীল মুসলমানরাই এই বিদ্যালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা ছিলো উর্দু। এমন কি – পাবনার পুলিশ কর্মকর্তার যেমন – মাতৃভাষা বাংলা হলেও, সেকালের আভিজাত্যের শর্তস্বরূপ দাবি করতেন তাঁদেরও মাতৃভাষা উর্দু। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠিকা এবং সেবিকা হওয়া সত্ত্বেও রোকেয়া তাই তাঁর বিদ্যালয়ে কোনো দিন বাংলা পড়াতে পারেননি। ১৯২১ সালে প্রকাশিত মতিচূরের দ্বিতীয় খণ্ডের

উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায়, তখনো তাঁর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং কর্মচারী ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী। তাঁর নিজের জবানিতে জানতে পারছি – সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত তাঁকেও তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হতো উর্দুতে।

১৯২৭ সালে তিনি ঘোষণা করেন, ৪০ জন বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রী পেলেই, বিদ্যালয়ে তিনি একটি বাংলা শাখা খুলবেন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্যে তখনো কলকাতায় কোনো বিদ্যালয় ছিলো না। তা সত্ত্বেও বাংলা শাখা খোলার বাসনা তাঁর কখনো সফল হয়নি। বেথুন স্কুলে দীর্ঘদিন মুসলমান ছাত্রীদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিলো না।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে তখনো সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। এমন কি কারো ইচ্ছে থাকলেও, সে সুযোগ ছিলো না। বেথুন বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছি – সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও হিন্দু আর ব্রাহ্ম ছাড়া আর কারো সেখানে অধ্যয়নের নিয়ম ছিলো না। অবশ্য সেটা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অসাধারণ ছিলো না। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮৫৪ সালের আগে পর্যন্ত কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্যে সংরক্ষিত ছিলো। কলকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজও এমনি সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নমুনা। ১৮৮০ সালে প্রথম খ্রিস্টান ছাত্রী গৃহীত হয় বেথুনের কলেজ শাখায়। তা সত্ত্বেও, ১৮৯৫ সালে একজন মুসলমান ছাত্রী বেথুনে ভর্তি হবার আবেদন করেও ভর্তি হতে ব্যর্থ হন। প্রথম যে মুসলমান বালিকাকে বেথুনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়, তিনি ছিলেন রোকেয়ার আত্মীয়া। ১৯২৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন। ফজিলতুন্নেসাও বেথুনের কলেজ বিভাগে ১৯২০-এর দশকে স্থান পেয়েছিলেন।

১৮৯০-এর দশকে কলকাতায় দুটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয় বটে, দীর্ঘজীবী হয়নি কোনোটাই। রোকেয়ার বিদ্যালয়কে, এ জন্যে, আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক মনে হলেও, আসলে তাঁর ভূমিকা ছিলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং সেভাবে বিবেচনা করলে জন বেথুন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, অ্যানেট অ্যাক্রয়েড – সবাই কমবেশি সাম্প্রদায়িক স্কুলই খুলেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত – একুশ বছর ন মাস, রোকেয়া তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনায় আপন সামর্থ্য এবং প্রয়াস প্রায় সবটুকুই ব্যয় করেন।

তিন

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বিতর্কাতীত মহাপুরুষ বলে স্বীকৃত ছিলেন, যদিও সাম্প্রতিক মার্কসবাদী দৃষ্টিতে এখন তাঁদের কর্মকাণ্ড খর্বিত হয়েছে। মানবিকতা এবং সহানুভূতিতে অতুলনীয়, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কোনো কোনো মার্কসপন্থীর পুনর্মূল্যায়ন এমন যে, কুলীন ব্রাহ্মণদের অধঃপাত থেকে রক্ষা করাই ছিলো নাকি তাঁর কর্মপ্রয়াসের মূল লক্ষ্য। এ ধরনের সমালোচনায় রোকেয়া

মতীচূর।

(প্রথম খণ্ড)

মিসেস্ আর, এস, হোসেন প্রণীত।

কলিকাতা,—

কড়েয়া,—নবনূর কার্য্যালয় হইতে
ম্যানেজার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১১।

মতিচুরের প্রথম সংস্করণের নামপত্র

মতীচূর প্রথম সংস্করণ

সাম্প্রদায়িক নিঃসন্দেহে, কারণ বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজের কথা তিনি বারবার করে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে তিনি চিহ্নিতও করেছেন মুসলমান বলে। কোরান পাঠের প্রয়োজনীয়তা, তার চেয়েও বড়ো কথা, সকল শিক্ষাই কোরানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে – বার্ধক্যে উপনীত রোকেয়ায় এমন আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য উক্তিও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও রোকেয়াকে ধর্মীয়, সামাজিক অথবা লিঙ্গের কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডি দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভবত অসঙ্গত।

১৯০৪ সালের জানুআরি মাসে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম হলেও তাতে সেকালের মহিলাসুলভ মনোভাব একেবারে অনুপস্থিত। বস্তুত, তাঁর আলোচ্য বিষয় স্ত্রীশিক্ষা, শিশুপালন, গৃহকর্ম এসব নয় – যেমনটা সাধারণত সেকালের লেখিকারা করতেন। ধারালো বিদ্রুপের ভাষায় এবং তীব্র ব্যঙ্গে তিনি আক্রমণ করেন বাঙালি চরিত্রকে। তিনি বলেন, বাঙালি নিরীহ, কোমল, দুর্বল এবং কাব্যিক, আরামপ্রিয় এবং কাপুরুষ; কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই তাঁদের উৎসাহ নেই।

'কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিমা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা – এক কথায় বিশ্ব জগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে।' 'যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একটা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা!'

> এই 'তৈলসিক্ত, নবগঠিত' বাঙালি প্রধানত পাস বিক্রয় করেন উন্নতির জন্যে। 'আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।' অতঃপর রোকেয়া ফর্দ দিয়েছেন, পরিশ্রমবিমুখ বাঙালি কী করে উন্নতির অভিনব পথ আবিষ্কার করেছেন।

চাকুরি যে বাঙালির শিক্ষার এবং জীবনের প্রধান লক্ষ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি করে সে সম্পর্কে তিনি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন – 'চাকুরি মা তোর চরণদুটি নিত্য পূজা করি/এই অফিসে চাকুরি যেন বজায় রেখে মরি।' চাকুরি না থাকলে শিক্ষিত বাঙালি যে জীবনকে অর্থহীন গণ্য করেন। তিনি বলেন, পরবর্তী শ্লোকে – 'চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি মাথার মাণিক! চাকুরি বিনে বঙ্গবাসীর জীবন ধারণ ধিক!' কর্ম নয় বাগ্মিতাই যে বাঙালির প্রধান গুণ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান নয়, অন্নসংস্থানের কৌশল আয়ত্ত করাই যে প্রথম লক্ষ্য, তিনি তাও উল্লেখ করেন শাণিত ভঙ্গিতে। নবাব, রাজা ইত্যাদি খেতাব পেয়ে অমরত্ব লাভের প্রয়াস পান উপর তলার বাঙালিরা এবং তারই জন্যে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের তোশামোদে তাঁরা প্রাণপাত করেন, এ–ও তাঁর উপহাসের বিষয়বস্তু। এঁরা ইংরেজদের পদলেহন, সংশোধন করে পুনরায় বলেন, জুতালেহন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। রোকেয়ার আগে ভিন্নতর ভাষায়

এবং মেজাজে এ ধিক্কার কেউ কেউ – যেমন রবীন্দ্রনাথ, দিয়েছেন। কিন্তু যা লক্ষযোগ্য তা হলো, সেই ধিক্কারদাতারা কেউ মহিলা ছিলেন না।

এই লেখা প্রকাশিত হবার ৮৫ বছর আগে রামমোহন রায় দুঃখের সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাঁরা কেবল মাত্র পাচিকা, পরিচারিকা, গৃহরক্ষিকা এবং শয্যাসঙ্গিনীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, পুরুষরা মনে করেন যে, মহিলাদের কোনো মেধাশক্তি নেই। তিনি সেই রক্ষণশীল বাঙালি পুরুষকুলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নারীদের মেধা আছে কিনা, তাঁরা তার কোনো পরীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা। নারীদের আদৌ মেধা আছে কিনা পুরুষরা এ সন্দেহ করেন, এমন কথা রামমোহন লেখেন ১৮১৯ সালে। তার ৫০ বছরের মধ্যেই কৈলাসবাসিনী দেবী, বামাসুন্দরী দেবী প্রমুখ বই লিখতে আরম্ভ করেন। শতাব্দীর শেষ নাগাদ সরলা ঘোষাল উপযুক্ত পুরুষ খুঁজে পাননি বিয়ে করার জন্যে; আর ১৯০৪ সালে রোকেয়া পুরুষদের তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপে বিদ্ধ করেন। এ কথা বিবেচনা করলে বলতে হবে যে, বাঙালি নারীরা আশি বছরের মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে বাঙালি মহিলাদের প্রগতির একটা অভ্রান্ত এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

এ লেখা যে–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাতে তা খুব বেশি সংখ্যক পাঠকের হাতে পড়েছিলো, আমার মনে হয় না। তা ছাড়া, এর পাঠকদের মধ্যে কতোজন এটাকে সত্যি সত্যি মহিলার রচনা বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তাও আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে এ লেখা পড়ে সেকালের পুরুষদের পক্ষে একে যে নিতান্ত বেয়াদব এবং সকল মূল্যবোধে অবিশ্বাসী এক মহিলার রচনা বলে গণ্য করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখিনে।

বস্তুত, সেকালের মহিলাদের তুলনায় রোকেয়ার সচেতনতা ছিলো সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী। গৃহকর্ম এবং সন্তানলালন মহিলাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও, তাঁর ভাবনা কেবল এ সবে সম্পৃক্ত ছিলো না। তাঁর বিবাহিত জীবন সংক্ষিপ্ত ছিলো এবং তিনি তাঁর দুটি সন্তানকেই তাদের শৈশবে হারিয়েছিলেন, হতে পারে তা তাঁকে নিরাপোশ হতে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু কারণ যাই হোক, দেয়াল–তোলা সংকীর্ণ গৃহে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটালেও, তাঁর চিন্তা বোরকা অথবা অন্তঃপুরের পর্দা দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত নয়; সাম্প্রদায়িকতা অথবা ভদ্রলোকসুলভ গণ্ডির দ্বারাও আবদ্ধ নয়।

তিনি যখন বলেন : 'কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের ভারতবর্ষ নহে, মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে।' – তখন বুঝতে পারি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কতো আধুনিক ছিলো। ১৯০৫ সালের পরে রবীন্দ্রনাথও একই বক্তব্য রেখেছিলেন। রোকেয়া তাঁর কথা পড়ে বলেছিলেন কিনা, জানি না, কিন্তু বলেছিলেন একই কথা। এবং পর্দার অন্তরাল থেকে উচ্চারিত এ কণ্ঠ পাঠককে সচকিত না করে পারে না। সচকিত পাঠককে রোকেয়া আরও স্পষ্ট করে বলেন, চাষাই সমাজের

মতিচূর।

(প্রথম খণ্ড)

মিসেস্ আর, এস্, হোসেন প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
এবং
৩৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।

১৩১৪।

মতিচুরের দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র

মেরুদণ্ড। এ উক্তিতেও মৌলিকত্ব অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর সমাজ সচেতনতা এবং তেজ উভয়ই এ থেকে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়। চরকা এবং এন্ডিসহ অন্যান্য কুটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের জন্যে আবশ্যিক, ভদ্রলোকদের তাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

রোকেয়ার মধ্যে ছিলো যাকে বলা যায় vision। সমাজের যেসব সমস্যা তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন এবং সম্ভাব্য সমাধানের নির্দেশ দেন, সে সবেও একটা প্রশস্ত দূরদৃষ্টি প্রতিবিম্বিত। এমন কি, হালকা চালে তিনি যখন সৌরশক্তিকে সংসারের কাজে লাগানোর কথা বলেন, তখনো তাঁর আশ্চর্য ভবিষ্যদ্দর্শন প্রকাশ পায়। তাঁর কল্পিত নারীস্থানের নারীরা যে পুরুষদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখে দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করতে পেরেছেন, সেটা বিজ্ঞানে তাঁদের অধিকতর অধিকারবশত। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা রান্না থেকে যুদ্ধ জয় – সবই করা সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রোকেয়া যখন এ কথা লেখেন, তখন একে অবাস্তব মনে হলেও, একুশ শতকের শুরুতে এসে সৌরশক্তির অসাধারণ সম্ভাবনা কাজে লাগাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে রোকেয়ার দূরদৃষ্টি কতোটা বাস্তবিক, সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

Sultana's Dream–এ যে নারীস্থান এবং নারীর আধিপত্যের কল্পনা, তা অভিনব অথবা মৌলিক নয়। এরিস্টোফেনিসের Lysistrata এর সর্বপ্রথম নিদর্শন, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। উপন্যাসে এভাবের প্রতিফলন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়। তা সত্ত্বেও বলা যায়, Sultana's Dream নামে স্বপ্ন, উচ্চতর কোনো দাবি বা ভানও নেই লেখিকার, তবু তাঁর স্বপ্ন একেবারে আজগুবি নয়। বরং তার মধ্যেও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রতিবিম্বিত। ইতিমধ্যে মহিলাদের সামাজিক এবং পরিবারিক ভূমিকায় যে বিবর্তন এসেছে, তা থেকে এই মন্তব্যই সমীচীন।

চার

বিবিধ ক্ষেত্রে অবদান সত্ত্বেও রোকেয়ার সবচেয়ে বড়ো পরিচিতি নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মী এবং প্রেরণাদাতা হিশেবে। আপন অবস্থা দেখেই তিনি নারীর সার্বিক বন্ধন এবং অসম্মান প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করেছিলেন। দাসব্যবসা নিষিদ্ধ হলেও, তাঁর মতে, প্রত্যেকের ঘরেই এ ব্যবসা পুরোদমে বিরাজ করছে। কারণ নারীদের অবস্থা তাঁর বিবেচনায় ক্রীতদাসীদের চেয়ে কোনোক্রমে উন্নত নয়। পার্থক্য এই যে, দাসরা যদি বা মুক্তির স্বপ্ন দেখে, অথবা একদিন কোনোক্রমে কেউ কেউ মুক্তিও লাভ করে, মহিলারা তাও আশা করতে পারেন না। কারণ, তাঁরা কেবল ক্রীতদাসী নন, তাঁদের মন পর্যন্ত চিরদাসীতে পরিণত হয়েছে। সমাজের প্রচলিত ভাষা এবং মূল্যবোধে এই দাসত্ব স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত।

এ জন্যেই নারীর বিবাহিত জীবনসঙ্গীকে বলা হয় স্বামী বা প্রভু। এবং নারী এই প্রভুর গৃহপালিত পশু, মূল্যবান আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা অথবা অন্য পাঁচটা সম্পত্তিরই অন্যতম বলে বিবেচিত। নারীও আপনাকে 'পরের' অধীনস্থ বলে বিবেচনা করেন এবং নিজের গৃহকে 'পরের' বাড়ি বলে গণ্য করেন। অপর পক্ষে, স্বামীও গৃহকে একমাত্র তাঁরই বলে মনে করেন। সম্পদ, আনন্দ, সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে স্বামী নিজের জীবনকে অনেক বেশি পরিপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু এসব বিবর্জিত বলে এবং মূল্যবান অলঙ্কার বা জড়পিণ্ডের মতো জীবনধারণ করতে হয় বলে স্ত্রী বেঁচে থেকেও মৃত। তাঁর 'ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট।' আদর্শ চরিত্র বলে গৌরবারোপিত সীতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, সীতা আদৌ আদর্শ অথবা অনুকরণীয় নন। যুক্তি এবং ঔচিত্যবর্জিত রামের তিনি ক্রীড়নক মাত্র। রোকেয়ার মতে :

> ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে ভারতনারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে; তাই যত্রতত্র 'পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি' দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও ভূভারতে নাই।

তাঁর মতে, উড়তে শেখার আগেই পিঞ্জরাবদ্ধ এই নারীদের ডানা কেটে দেওয়া হয়। এবং তারপর সামাজিক রীতিনীতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয় তাঁদের। এ শিক্ষা তাঁদের মনে দৃঢ়মূল যে, স্বামী মাথা কেটে ফেললেও 'আহ' বলতে নেই। ইংরেজ নারীদের সঙ্গে এঁদের তুলনা করে তিনি বলেন, পুরুষ যখন গুরুতর অপরাধ বা বিশ্বাসঘাতকতা করেন, দেশীয় নারী তখন আপন দুর্বহ দুঃখে পিষ্ট হন, প্রতারক পুরুষের পদপ্রান্তে লুটিয়ে দয়া ভিক্ষা করেন, তবু তাঁর প্রতি ভক্তি ফিরিয়ে নিয়ে ঘৃণা করতে পারেন না। স্বামীর ব্যভিচার অধঃপতন দেশীয় নারীর লজ্জা বা অসম্মানের কারণ বলে বিবেচিত হয় না, অথচ স্ত্রীর সামান্যতম পদস্খলনে স্বামী লজ্জিত হন এবং তাকে একটা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত করেন।

নারীর এই অসীম দাসত্ব এবং অপমানের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, নারী অকর্মণ্য। কর্মময় যে জীবন মানুষকে উপযোগিতা দান করে, নারী সেই ভূমিকাবর্জিত। হয়তো নারীর কৃপা লাভের জন্যে অতীত কালে পুরুষ তাঁকে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া থেকে মুক্তি দান করেন। ফলে নারী ক্রমশ অকর্মণ্য হয়ে পড়েন এবং তার ফলে এক সময়ে অনুগ্রহের পাত্র বলে বিবেচিত হন। দাসত্বের আর-একটি কারণ নারীর আত্মসম্মানের অভাব। দীর্ঘকালের কুশিক্ষাবশত নারী নিজেকে নিকৃষ্ট এবং পুরুষকে নিজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এ শিক্ষা নারীর মজ্জাগত। তাই, যে-সম্পত্তি নারীর নিজস্ব এবং যার ওপর তার স্বামী পুরোপুরি নির্ভরশীল, নারী তাকেও স্বামীর সম্পত্তি বলেই গণ্য করেন এবং স্বামীকে নয় - নিজেকেই বিবেচনা

করেন কৃপার পাত্র বলে। রোকেয়ার মতে, ধর্মের নাম করে পুরুষশাসিত সমাজ নারীর দাসত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তাকে চিরস্থায়িত্বও দিয়েছে অলৌকিক মহিমা দিয়ে।

নারীর জীবনকে অর্থবান করার জন্যে এই শোচনীয় দাসত্ব থেকে তাঁদের মুক্তি আবশ্যিক – এ বিষয়ে রোকেয়ার ভাবনায় কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিলো না। সমকালীন অন্য নারী সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তাঁরা নারীর দুর্দশা লাঘব করতে চেয়েছেন মাত্র। তা ছাড়া, তাঁরা লেখাপড়া, গৃহকর্ম, সন্তানলালন–পদ্ধতি শিখে নারীদের আরও ভালো মা এবং স্ত্রী হওয়ার প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ, ঐতিহ্যিক ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রেখে নারী হিশেবে পুরুষদের হাতে আরও বেশি শোষিত হওয়ার, পুরুষদের জন্যে তাঁদের আরও উপযোগী হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। আত্মবিকাশ নয়, সমাজের নামে আত্মত্যাগের আদর্শে তাঁরা বিশ্বাসী। গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানলালন, পরিজনের যত্ন ইত্যাদিকে রোকেয়াও নারীর কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু নারীর জীবন যে এতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, পুরুষ লেখকরা নারীদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেন। একে তিনি পুরুষদের স্বার্থপরতা বলেই অভিহিত করেন। কারণ নারীদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা আসলে পুরুষ সমাজের শোষণ এবং দুর্ব্যবহারেরই সমর্থন। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যিনি স্বামী এবং সংসারের সেবায় আত্মত্যাগ করেন, সমাজের চোখে সেই নারীই আদর্শ।

রোকেয়ার চোখে নারীমুক্তির অর্থ পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন।

> জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।

এই সংজ্ঞায় রোকেয়া যে পুরুষের কথা বলেছেন, সে পুরুষ অথবা সব পুরুষই আদর্শ স্থানীয় কিনা, তিনি সে সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। সে জন্যে পাদটীকায় আপন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

> আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা করিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা।

২৩/২৪ বছর বয়সে, ১৯০৪ সালে রোকেয়া যখন পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের দাবি জানান, তখন বাঙালি সমাজে এ ধারণা অভিনব ছিলো। আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কবি কামিনী সেন, নারীর অধিকার সচেতন কৃষ্ণভাবিনী দাস অথবা সরলা দেবী প্রমুখ যাঁরা তখন পর্যন্ত নারীজাগরণের কথা বলেছেন, তাঁরা লেখাপড়া শিখে ঐতিহ্যিক ভূমিকা আরও নিপুণভাবে পালন করার কথায়ই জোর দিয়েছেন। সমকক্ষতা লাভের দাবি তাঁরা তোলেননি। বস্তুত, নারীর মুখে এ দাবি অসঙ্গত এবং

অবাস্তব বলেই গণ্য হতো। রোকেয়া সেটাই করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, তিনি তার চেয়েও বেশি করেছিলেন। কারণ, তিনি পুরুষের সমকক্ষতা চাননি, তাকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথসহ সেকালের কোনো নাম-করা লেখক যে তাঁর কথা কোথাও উল্লেখ করেননি, সে কি কেবল তাঁর লেখা বহুলপ্রচলিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি বলে, নাকি তাঁর বক্তব্যকে তাঁরা তখন নিতান্ত আজগুবি বলে আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, বলা মুশকিল। সমকালের অনেক অপ্রধান এবং কনিষ্ঠ লেখকের রচনা রবীন্দ্রনাথ পাঠ করতেন এবং পাঠ করে তার প্রতি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি কী করে রোকেয়ার রচনা একেবারে না-দেখে থাকলেন, তা আশ্চর্যের বিষয়।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজন হলে, রোকেয়ার মতে, তাই করতে হবে। কেরানি থেকে আরম্ভ করে মহিলারা জজ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট – সব কর্মেরই উপযুক্ত। একদিন তাঁরা হয়তো ভাইসরয়ও হবেন। যে শ্রম মহিলারা স্বামীর সংসারে নিয়োজিত করেন, সেই শ্রম দ্বারা স্বাধীন ব্যবসা করাও আদৌ অসম্ভব নয়। এমন কি, কৃষিক্ষেত্রেও তাঁরা কাজ করবেন না কেন? মোট কথা, তাঁরা যেন অন্নবস্ত্রের জন্যে কারো গলগ্রহ না হন। ১৯০৪ সালে বাঙালি মহিলাদের চাকরি করার দৃষ্টান্ত মোটেই অজ্ঞাত ছিলো না। প্রকৃত পক্ষে, ১৮৮০-এর দশক থেকেই চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, মোহিনী খাস্তগির, কুমুদিনী খাস্তগির, সরলা দেবী প্রমুখ ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান মহিলারা চাকরি করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মহিলাদের চাকরি করার দৃষ্টান্ত সমাজে আদর্শ অথবা বাঞ্ছনীয় বলে গৃহীত হয়নি। ১৯০১ সালে বঙ্গদেশে ইংরেজ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাসহ মাত্র ১১৫৬ জন মহিলা শিক্ষক, ৬৭ জন কেরানি, ৮৪৯ জন নার্স এবং ১৫১ জন চিকিৎসক হিশেবে কাজ করছিলেন (তুলনায় অনেক বেশি নারী – ৪৫,৪৯১ জন – নিয়োজিত ছিলেন বেশ্যাবৃত্তিতে)[৮]। রোকেয়ার কথা মতো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ব্যারিস্টার ছিলেন না একজনও। সুতরাং তাঁর উক্তি সে পর্যায়ে ছিলো অবাস্তব দুরাশা এবং দুঃসাহসের, এমন কি, উপহাসের।

সমকক্ষতা লাভের দ্বিতীয় শর্ত, রোকেয়ার বিবেচনায়, আত্মার বিকাশ। এবং আত্মার বিকাশ নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। তাঁর মতে, 'শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন।' এই শিক্ষার যথার্থ বিকিরণেই নারীহৃদয় বিকশিত এবং পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে।

বোঝা না হয়ে সংসারে রমণী যাতে পুরুষের সহচরী, সহকর্মী এবং সমধর্মিণী হবেন – এটাই রোকেয়ার প্রত্যাশা। তাঁর মতে, নারী পুরুষের partner, better half। এবং পুরুষ নারীর স্বামী নয়, অর্ধাঙ্গ, জীবনসঙ্গী। বঙ্গসমাজে নারী-অংশ

পুরুষ–অংশের চেয়ে নিকৃষ্ট। এর ফল অনাসৃষ্টি। একটি চাকা বড়ো, একটি ছোটো হলে গাড়ি যেমন সামনে যেতে ব্যর্থ হয়, নারী ও পুরুষের অসমান অবস্থাও তেমনি বঙ্গসমাজের উন্নতির প্রধান বাধা। তা ছাড়া, বঙ্গসমাজে স্বামী এবং স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা আপতিক, অগভীর। তারও কারণ নারী ও পুরুষের বিষম উন্নতি।

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা–সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালাবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন।

রোকেয়ার বিবেচনায় এটাকে মোটেই সুখী অথবা আদর্শ জীবনের চিত্র বলে ধরে নেওয়া যায় না। জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্যে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে। নারী ও পুরুষের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়, সম্পূরক; কারণ পুরুষের উন্নতিও নির্ভরশীল নারীর উন্নতির ওপর।

কল্যাণ ও প্রগতি বাঞ্ছনীয় হলেও, মানুষ অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় তাকে অস্বীকার করে। ঔচিত্য এবং প্রচলিত আচার অনেক সময়েই মিতালি করে না। নারীমুক্তি তাই অভীষ্ট হলেও, ঐতিহ্যিক সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ তার সহায়ক নয়। 'জাগিয়া উঠা সহজ নহে, সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে, ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য কৎল–এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানলের ব্যবস্থা দিবেন', এমন কি, 'ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই...।' কিন্তু সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্যে নারীজাগরণ আবশ্যিক এবং একবার জাড্য ঘুচিয়ে আন্দোলন শুরু করতে পারলে, রোকেয়া মনে করেন, ক্রমশ সমাজের অনুমোদনেরও অভাব হবে না। অন্তত পশ্চিম ভারতের পার্সি সমাজে তিনি সেটাই দেখতে পেয়েছেন।

পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে মীথ সমাজের পরতে পরতে বিদ্যমান, তা তাঁর মতে মূল্যহীন, শ্রদ্ধার অযোগ্য। যে ধর্ম পুরুষরচিত এবং যার কারণ তাঁদের স্বার্থ রক্ষা, তা–ও এমনি মূল্যহীন এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য। পুরুষসমাজ ধর্মের নামে, প্রকৃত পক্ষে, স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতারণা করে এসেছেন নারীদের। সে জন্যেই নারীহন্তা পুরুষদের জন্যে কোনো দণ্ডের বিধান নেই। নিজের জানা কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়ে রোকেয়া দেখিয়েছেন, পুরুষ কিভাবে নারীদের প্রতারণা এবং পরোক্ষত হত্যা করে; অথচ সংসারে তার কোনো প্রতিবিধান হয় না। জীবিকা উপার্জন করেন বলে পুরুষদের যে অহঙ্কার, রোকেয়ার মতে, সেও পূর্ববর্তী পদ্ধতির অন্তর্গত। তাঁর মতে, নারীর ন্যায্য অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে বলে মুসলমানরা যে দাবি করেন, তা অবাস্তব। কারণ, তত্ত্বত ইসলাম মেয়েদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করলেও, মুসলমানরা অম্লান বদনে কন্যাদের মনন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি আজও অবাধে হত্যা করছেন। কন্যাকে জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত করা এবং চার দেয়ালের মধ্যে

আবদ্ধ রেখে বিবেককে পঙ্গু করা অনেক মুসলমান কেবল যে অন্যায় বলে মনে করেন না, তাই নয়, বরং তাকেই গণ্য করেন আভিজাত্যের পরিচায়ক বলে।

নারীদের শোষণ করার সুবিধাজনক অবস্থা থেকে পুরুষ সমাজ বিনা বাধায় সরে যাবেন, তা অপ্রত্যাশিত। বস্তুত, সুকঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নারীমুক্তি আসা সম্ভব। এর জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন পুরুষের অন্যায় কর্তৃত্ব এবং দুঃশাসন অগ্রাহ্য করা। এই শক্তির প্রেরণা দিতে পারে আত্মশক্তির সম্যক উদ্বোধন। পুরুষের কাছে দয়া ভিক্ষা নয়, অধিকার আদায়; বঞ্চনার ক্রন্দন নয়, প্রতিবাদ – রোকেয়ার এই আদর্শই তাঁকে তাঁর সমকালীন নারীদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। সমাজশোষিত নারীর করুণ অবস্থা দর্শনে বিচলিত মানকুমারী বসু সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিলেন,

কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি ক ফোঁটা নয়নবারি
ভগিনী! তোদের তরে বিজনে ঢালিব।'

–এ মনোভাব রোকেয়ার প্রশংসা আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। বরং তিনি একে প্রায় ধিক্কার দিয়ে বলেন :

> আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কাঁদিয়া মরিতে ব্যয় করিলেন। ব্যস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়াইত আমরা এমন অকর্মা হইয়া পড়িয়াছি।

তাঁর সমাধান ভিন্ন, আহ্বানও ভিন্ন।

> বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! জড়াউ অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, 'আমরা মানুষ।'

আত্মসম্মানের শোচনীয় অভাব যে বঙ্গদেশীয় নারীর প্রধান সীমাবদ্ধতা, The Murder মত Delicia কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গেও রোকেয়া তা উল্লেখ করেন। অথবা বলা যেতে পারে, এবং তাই বোধ হয় বলা উচিত, বঙ্গদেশের নারীদের আত্মসম্মানের অভাব প্রকটনের জন্যেই রোকেয়া ডেলিসিয়া চরিত্রের সঙ্গে বাংলাভাষাভাষী নারীদের পরিচয় করিয়ে দেন। ডেলিসিয়ার সঙ্গে দেশীয় নারীর তুলনা করে তিনি বলেন, ডেলিসিয়ার জীবন সমর–প্রাঙ্গণে অমিততেজ বীরের ন্যায়। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দেশীয় রমণী এ ক্ষেত্রে বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে নাকি কান্না ধরেন, প্রভো! দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে অথবা দাসীর প্রতি সদয় হও। শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ ধুইতে বসিয়া পুনঃপুন পদাঘাত লাভ করিবেন। – ডেলিসিয়া আর বঙ্গনারীতে এই প্রভেদ।

তাঁর মতে, এদেশে নারী যতোদিন আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করে তাঁদের পদলেহন করতে প্রস্তুত, ততোদিন তাঁদের প্রশংসা; কিন্তু আপন অধিকার সচেতন হলেই তাঁদের নিন্দা এবং কলঙ্ক। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'এ দেশে

স্ত্রীশিক্ষার অভাব।' দেশীয় নারী ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনতে পান, নারী দাসী এবং চিরকাল দাসীই থাকবেন। সুতরাং তাঁর মন পর্যন্ত দাসীতে পরিণত হয়। নারীর সুপ্ত মানসিক শক্তিকে শিক্ষাই কেবল জাগরূক করতে পারে। শিক্ষার আলোক অন্ধ নারীকে দেবে যথার্থ দৃষ্টিশক্তি। আর সে দৃষ্টি দিয়েই নারী বুঝে নেবেন মানুষ হিশেবে তাঁর মৌলিক অধিকার। এমন কি, ঐতিহ্যিক যেসব ভূমিকা নারীর পক্ষে আবশ্যিক – আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগ্নী, আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মাতা – সেসবের জন্যেও শিক্ষাই তাঁকে তাদের জন্যে উপযুক্ত করে তুলবে।

শিক্ষাই যেহেতু নারীমুক্তির প্রথম শর্ত, রোকেয়ার বিশ্বাস, সে কারণেই পুরুষ সমাজ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি এতো বিরূপ। পুরুষের ধারণা, শিক্ষা নারীকে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুললে চিরকালীন শোষণে ছেদ পড়বে। সে জন্যেই অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ নির্বিকার চিত্তে ক্ষমা করলেও, শিক্ষিত মহিলার সামান্যতম দোষকে শতগুণে বাড়িয়ে স্ত্রীশিক্ষার নিন্দা করে। উন্নতির প্রত্যাশায় সমাজ নানা সভাসমিতি স্থাপন করে, আন্দোলন করে, অথচ স্ত্রী–কন্যাদের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে। তাঁর কথায়, এর তুলনা গাছের গোড়া কেটে আগায় সুশীতল বারিসেচনের। তাঁর মতে, মুসলমান সমাজ এর আশ্চর্য নিদর্শন। বিদ্যালয়ের অভাব নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়; কিন্তু রোকেয়া মনে করেন, ইচ্ছে থাকলে নিজের আন্তরিক চেষ্টাতেই নারী শিক্ষিত হতে পারেন। সেই আন্তরিক প্রযত্নই বড়ো কথা; কারণ সেই প্রযত্ন যেখানে অনুপস্থিত, এমন কি, ঈশ্বরও সে ক্ষেত্রে সাহায্যে পরাঙ্মুখ।

যেশিক্ষার কথা রোকেয়া বলেছেন, তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা অথবা সেকালের নারীসুলভ সীমাবদ্ধতা ছিলো না। সব বিদ্যাই মেয়েদের উপযুক্ত কিনা, তাঁর সমকালে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিলো। অনেকেরই ধারণা ছিলো, মেয়েদের সব কিছু শেখার দরকার নেই এবং সবকিছু তাঁদের জন্যে ভালোও নয়। কিন্তু রোকেয়া মনে করতেন, সব বিদ্যাতেই মহিলাদের সমান অধিকার – এমন কি, বিজ্ঞানেও। সংগীত এবং চিত্রবিদ্যার প্রতি মুসলমান সমাজের বিরূপতা সুবিদিত। কিন্তু এ দুটিও তাঁর শিক্ষাক্রম থেকে বাদ যায়নি। কবিতা রচনা সম্ভবত শিক্ষা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু রোকেয়া তাকেও নারীশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে, নারীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে সুমার্জিত এবং পূর্ণবিকশিত একটি ব্যক্তিতে রূপায়িত করাই ছিলো তাঁর বাসনা।

পাঁচ

যদিও ভাবুক এবং কর্মী হিশেবেই তাঁর প্রধান পরিচিতি, রোকেয়া নারীও। অন্তরের অন্তস্তলে সেই নারী প্রেমে ভালোবাসায় পারিবারিক জীবনের আদর্শে কতোটা আধুনিক, তাঁর প্রবন্ধগুলো সে দিকে বড়ো একটা ইঙ্গিত দেয় না। সৌভাগ্যক্রমে

তিনি একখানা উপন্যাসও রচনা করে গেছেন। সে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তার লেখিকার অন্তরকে বোধ হয় অনেকাংশে অনাবৃত করেছে। এ উপন্যাসের অংশবিশেষ যে আত্মজৈবনিক, তা প্রায় সন্দেহাতীত। পদ্মরাগ উপন্যাসের (প্রকাশ ১৯২৪–২৫, রচনাকাল ১৯০২–০৩) প্রধান দুটি চরিত্র দীনতারিণী এবং সিদ্দিকা ওরফে পদ্মরাগ। দীনতারিণী এবং পদ্মরাগ – উভয় নামই তাদের চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। বিবাহিত এবং বিধবা রোকেয়া যেন যথাক্রমে পদ্মরাগ আর দীনতারিণীতে প্রতিবিম্বিত।

দীনতারিণী বিধবা হন তরুণ বয়সে, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার স্বামী অকালে দেহত্যাগ করায়। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দীনতারিণী। সন্তানহীন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি একটি বিধবা আশ্রম এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, আত্মীয়স্বজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। রোকেয়ার স্বামী ব্যারিস্টর নন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং রোকেয়া বিধবা আশ্রম নয়, কেবল মাত্র বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন – দীনতারিণীর সঙ্গে রোকেয়ার পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে এইটুকু।

দীনতারিণী ব্রাহ্ম, কিন্তু তাঁর আশ্রম এবং বিদ্যালয় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান – সকলেরই এক ইউটোপিয়ান মিলনস্থান। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কর্মীরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা খ্রিস্টান; এবং প্রায় অবাস্তব এক সদ্ভাব তাঁদের মধ্যে বর্তমান। বাস্তবে রোকেয়া যে সেক্যুলার পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি তাঁর সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে, তারিণীভবন তা-ই। এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনের প্রশস্ত অসাম্প্রদায়িক আদর্শই প্রতিফলিত হয়। তারিণীভবনের ছাত্রীদের দু পাতা পড়তে শিখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢেলে বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠন করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, গণিত সবই শেখানো হয় তাদের। বিকৃত ইতিহাস শিখিয়ে স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করার মনোভাব তাদের গঠন করা হয় না। উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী, সুমাতা হওয়ার এবং দেশ ও ধর্মকে ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয় আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের ওপর। ছাত্রী এবং কর্মীরা সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, তাঁতে কাপড় বোনেন, বই বাঁধান এবং মিষ্টি তৈরি করেন। কেউ বা শিক্ষিকা হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেন। টাইপিং এবং নার্সিংও শেখেন কেউ কেউ।

তারিণীভবনের প্রধান কর্মী চারুবালা, সৌদামিনী, হেলেন, জাফরি, রাফিয়া, সাকিনা, রসিকা, ঊষা প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী এবং বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত। কিন্তু এক জায়গাতে তাঁদের মিল আছে – তারা সবাই স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা বা নির্দয়তার শিকার। উপন্যাসের নায়িকা পদ্মরাগ ওরফে সিদ্দিকাও বিবাহের করুণ শিকার। স্বার্থপর পুরুষ সমাজ যে নির্মমভাবে নারীনির্যাতন করে, এই মহিলাদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনীতে তা বিবৃত।

পদ্মরাগ ওরফে সিদ্দিকা নানা গুণে গুণান্বিত– রোকেয়ার অকৃপণ সহমর্মিতা প্রকাশিত তার মধ্যে, রোকেয়ার স্বপ্নই হয়তো। অপরূপ সুন্দরী সে। সুশিক্ষিত।

ইংরেজ মহিলাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ইংরেজি কবিতার জন্যে সে তিন তিনবার পুরস্কার পেয়েছে। সেকালের শিক্ষিত এবং অভিজাত মুসলমান মহিলাদের মধ্যে যা একেবারে বিরল – সিদ্দিকা সংগীতজ্ঞ। টাইপিংও জানে সে (আদৌ কোনো বাঙালি মহিলা সেকালে টাইপিং জানতো কিনা, সে বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে।) কিন্তু এহ বাহ্য। তার আসল ঐশ্বর্য ভেতরে – সে স্বাবলম্বী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বামী, সংসার, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীন, এমন কি, দ্রোহী। বিভিন্ন রচনায়, বিশেষত The Murder মত Delicia কাহিনী পরিবেশনের সময়ে রোকেয়া দেশীয় নারীর যেসব অভাবের বর্ণনা করে ধিক্কার দিয়েছেন, ক্ষতিপূরণস্বরূপ সিদ্দিকাকে যেন তার সবকিছু দিয়ে রচনা করেছেন।

সুশিক্ষিত, সুদর্শন ব্যারিস্টার লতীফ আলমাসকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও এবং কৈশোরে তার সঙ্গে ধর্মীয় রীতিতে বিবাহিত হয়েছিলো, তা আবিষ্কার করার পরেও, লতীফের সঙ্গে ঘর করতে রাজি হয়নি সিদ্দিকা। কারণ, মাঝখানে অভিভাবকের চাপে লতীফ আর একটি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলো। সে স্ত্রী অবশ্য মৃত। কিন্তু দোজবরের সঙ্গে ঘর করার কথা সে ভাবতে পারে না। সমাজ সংস্কারক রোকেয়া যদি দীনতারিণীতে প্রতিফলিত হয়ে থাকেন, প্রেমিকা নারী রোকেয়া তা হলে সিদ্দিকায়। বিপত্নীক সাখাওয়াতের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে কিশোরী রোকেয়ার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিলো কিনা, তা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর নায়িকা সিদ্দিকার মর্যাদা বোধ এ ব্যাপারে টনটনে। সম্ভবত বাস্তব জীবনে সমাজ এবং সংসারের চাপে রোকেয়া যা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি, তা করেছে তাঁর নায়িকা।

সিদ্দিকা বলে

> আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? .. আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকটে ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, 'আর রাখ তোমার পণ ও তেজ – ঐ দেখ না এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব (সিদ্দিকা) আবার স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।' আর পুরুষ সমাজ সগর্বে বলিবেন, 'নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার আমাদের পদতলেই পড়িবেই পড়িবে।' আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে।

বিবাহ এবং লতীফ – উভয়ের প্রতিই সিদ্দিকার আন্তরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও, যেন দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সে তাদের প্রত্যাখ্যান করে। প্রেম এবং আত্মমর্যাদার মধ্যে জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত আত্মমর্যাদাই। অতঃপর সারা জীবন নারীজাগরণের জন্যে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে সিদ্দিকা।

পদ্মরাগ উপন্যাস হিশেবে কাঁচা হাতের লেখা। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী নায়ক-নায়িকার বিয়ে হয় বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু তাদের কোনো দিন দেখা হয়নি এবং ইতিমধ্যে বর ও কন্যাপক্ষের মধ্যে বিষয়সম্পত্তির কলহ নিয়ে বিরোধ হেতু অভিভাবকের চাপে পড়ে নায়ক অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য হয়। আহত, শয্যাশায়ী অপরিচিত নায়কের সেবা করতে গিয়ে নায়িকা তাকে ভালোবেসে ফেলে। ক্রমে এ-ও আবিষ্কার করে যে, আসলে এরই সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু এ সত্য অজ্ঞাত থেকে যায় নায়কের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার সঙ্গে এখানটায় প্লটের মিল দুর্লক্ষ নয়। রোকেয়ার ভাষাও খানিকটা বঙ্কিমী।

প্রবন্ধ আর উপন্যাসের মধ্যে ভাষার যে পার্থক্য থাকে, রোকেয়া অবশ্য তা বজায় রাখতে পারেননি। আর শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়, পদ্মরাগের ভাব থেকেও বোঝা যায়, পদ্মরাগ রোকেয়ার প্রবন্ধেরই প্রক্ষেপ। সমাজ সংস্কার, বিশেষ করে নারীজাগরণের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন, উপন্যাসের উদ্দেশ্যও তাই। উপন্যাসের কোনো কোনো স্থানে পাদটীকায় নিজের প্রবন্ধেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। স্ত্রীর নিকটে স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা, যৌনবিষয়ে স্বার্থপর পুরুষসমাজের দ্বৈতমান এবং নারীর ক্রমবর্ধমান আত্মমর্যাদা এ উপন্যাসের থীম। শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকার মাধ্যমে নারীর আত্মমর্যাদাই জয়ী হয়েছে। এ উপন্যাসের এটাই উল্লেখযোগ্য দিক। সমকালে রচিত অন্য কোনো বাংলা উপন্যাসে নারীর এ ধরনের বিদ্রোহ জয়ী হয়নি। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ-এ কুমুর আত্মমর্যাদা কম ছিলো না; শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য অথবা গুণও নয়। কিন্তু পরিণতিতে সে ঐতিহ্যিক সমাজের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পদ্মরাগের যদি কোনো অভিনবত্ব অথবা অবদান থাকে তো তা এইখানে।

ছয়

রোকেয়ার রচনাবলীর অন্যতম বিষয়বস্তু স্বরূপের অন্বেষা। তাঁর প্রথম এবং সর্বশেষ রচনা প্রকাশিত হয় আটাশ বছরের ব্যবধানে। বঙ্গদেশের পটভূমিকায় ১৯০৪ থেকে ১৯৩২ সাল সংক্ষুব্ধ নিঃসন্দেহে। রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ এ সময়ে বহু সংবর্তের সৃষ্টি করে। তদুপরি ব্যক্তিগত জীবনে দুই ভাই, বড়ো বোন, পিতা-মাতা এবং স্বামীর মৃত্যু, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা এবং রচনা প্রকাশ ও বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রবল বিরোধিতা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হন তিনি। কোন ঘটনা তাঁকে কতোটা প্রভাবিত করেছিলো, তা বলা কঠিন; কিন্তু স্বরূপের প্রশ্নে আলোচ্য কালে তাঁর মনোভাবের বিবর্তন সুস্পষ্ট।

১৯০৪ সালে একটি মুসলিম পরিচালিত পত্রিকায় তিনি লেখেন যে, ধর্ম অলৌকিক নয়, ধর্ম আসলে পুরুষ মানুষের তৈরি।

> পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা বলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... যদি ঈশ্বর কোন দূত-রমণী শাসনের

জন্য প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণীজাতিকে নরের অধীনে থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ...আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেই খানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, যেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।

এই অনুচ্ছেদে রোকেয়া কোনো বিশেষ ধর্মের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু এশিয়ার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এশিয়ায় প্রচারিত তিন বিখ্যাত ধর্মের – ইহুদী, খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের কথা তাঁর মনে ছিলো। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তবে তিনি নিজেকে প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করেননি। অপর পক্ষে, হিন্দু ধর্ম বিশেষ কোনো পয়গম্বর এসে প্রচার করেননি। সুতরাং সেটা তাঁর মনে ছিলো কিনা, বলা শক্ত। তবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রধান ধর্মের কথা তিনি উল্লেখ করবেন না, বিশেষ করে যে ধর্মে নারীদের প্রতি পুরুষসমাজের শোষণের সুযোগ মনুসংহিতার সুবাদে অনেক বেশি – এটা মনে করা কঠিন। এখানে একটা বিষয় লক্ষযোগ্য : ধর্মের অলৌকিকত্ব আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর এবং দূত–এর মতো এমন সব শব্দ নির্বাচন করেছেন, যা থেকে ধর্মটিকে শনাক্ত করা না যায়।

ইসলামকে যে বাদ দেননি, এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁর রচনার সমালোচনা যে হয়েছিলো, তার দুটি প্রমাণ পাওয়া যায়। সমালোচনার মুখে, এবং আমার ধারণা স্বসম্প্রদায়ের সমালোচনার মুখে, পরের মাসে একই পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত নরম সুরে এবং ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে তিনি লেখেন, মানসিক উন্নতির জন্যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ত্যাগ করার দরকার নেই। ঔদার্যই আসল কথা। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করেও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। ঝাঁজ কম হলেও, এ বক্তব্যেও জোরের অভাব নেই, অস্পষ্টতাও নেই। তবে প্রথম রচনায় প্রায় নাস্তিক্যের যে স্বর শোনা যায়, তা এখানে অনুপস্থিত।

সমালোচনার দ্বিতীয় প্রমাণ, এক বছর পরে তিনি যখন মতিচূর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে 'আমাদের অবনতি' নামে এ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন এই প্রবন্ধের ধর্মের অলৌকিকত্ব সম্পর্কিত বিতর্কিত এবং সবচেয়ে বলিষ্ঠ অংশটি বর্জন করেন অথবা বর্জন করতে বাধ্য হন। সম্প্রদায় অথবা সাম্প্রদায়িক / প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু ধর্ম যে লৌকিক এবং সাম্প্রদায়িকতা যে ঔদার্যের পরিপন্থী, এটাই তাঁর বক্তব্য। সীমাবদ্ধতা জেনে নিয়েও নিজেকে কেউ যদি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ বলে বিবেচনা করেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে উদারতার প্রতিই তাঁর ঝোঁক। বস্তুত, ধর্মের অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে মোহমুক্ত, সুতরাং ধর্ম ও সম্প্রদায়, পুরুষ ও নারী ইত্যাদি সম্পর্কে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ তাঁর কাছে তেমন মূল্যবান নয়। তবে একই সঙ্গে এও লক্ষ করা যায় যে, তিনি আপোশও করতে বাধ্য হচ্ছেন। সে জন্যেই ধর্মকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে, পরে আবার তা বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত অপর একটি রচনায় সাম্প্রদায়িক পরিচয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর – সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতা উভয়কেই তিনি সেখানে নিন্দা করেছেন। দেশ এবং জাতীয়তার নামে চিহ্নিত হওয়াই তাঁর মতে বাঞ্ছনীয়।

> আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী বা খৃষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি – আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘোষণা অসাধারণ। সকল ধর্মীয় এবং প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে উঠে এই পরিচয়কেই একমাত্র পরিচয় করার আহ্বান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং বিপিন পাল ছাড়া সমকালে আর কোনো বাঙালিই জানাননি। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও না। তিনি বরং ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল ধর্মাবলম্বীকেই হিন্দু বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে ভারতবর্ষ আর হিন্দুত্ব একই কথা। অবশ্য এখানে হিন্দু শব্দটিকে তিনি যে ধর্ম অর্থে নয়, জাতীয়তা অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, সেটা মনে রাখা সঙ্গত।

রোকেয়ার পক্ষে ভারতীয় বলে চিন্তা করতে পারা আরও বেশি অসাধারণ এই জন্যে যে, তখনকার মুসলমানদের মধ্যে এ ভাবনা আদৌ দেখা দেয়নি। তখনকার বেশির ভাগ শিক্ষিত মুসলমানই নিজেদের ভারতবর্ষীয় বলে বিবেচনা করতেন না, তাঁরা নিজেদের মনে করতেন আরব-ইরান থেকে আসা প্রবাসী বলে। সে জন্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও তাঁদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে হয়নি। তাঁদের এই মানসিকতার স্বরূপ আরও বোঝা যায়, মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব থেকে। তাঁরা বাংলাকে তাঁদের মাতৃভাষা বলে জ্ঞান করতেন না, নিজেদের তাই বাঙালি বলেও ভাবতেন না। তাঁদের বিবেচনায়, তাঁদের মাতৃভাষা ছিলো ফারসি, নিদেন পক্ষে, উর্দু। বাংলা ভাষায় তাঁদের দুর্বলতায় তাঁরা লজ্জিত বোধ করতেন না। বরং সেটাকেই বিদেশী হিশেবে স্বাভাবিক বলে মনে করতেন। ১৯৩০-এর দশকের আগে পর্যন্ত এই মনোভাবে তেমন ব্যাপক পরিবর্তন আসেনি।

উপরে যে তিনটি প্রবন্ধের কথা বললাম, এগুলো যখন তিনি লেখেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫/২৬ বছর। তারুণ্যের স্বভাবদ্রোহিতাই কি তাঁর একমাত্র সম্বল, নাকি ভিন্নতর শিক্ষাবশত গভীরতর কোনো বিশ্বাসে উদ্বোধিত তিনি? নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে আমার ধারণা, তারুণ্য এবং উদার শিক্ষা উভয়ই ক্রিয়াশীল ছিলো তাঁর মননে। কিন্তু ব্যক্তির সীমানা তাঁর ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়। আগেই লক্ষ করেছি, বই প্রকাশের সময়ে তাঁর আপোশ করতে হয়েছিলো। তারপর স্বামীর মৃত্যুর আগে চার বছর এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে ন বছর তিনি আর লেখেননি। সে কি এই আপোশ করতে হলো বলে? স্বামীর মৃত্যুর পরে শোক, আত্মীয়দের সঙ্গে বিরোধ এবং বিদ্যালয়ের কাজে লেখা ব্যাহত হওয়া সম্ভব ছিলো, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর আগের চার বছর? স্বামীর মৃত্যুজনিত আঘাত অথবা বয়সবৃদ্ধিজনিত মৃত্যুভীতি, সামাজিক অথবা

/এবং ব্যক্তিগত কী কারণে জানিনে, ১৯১৮ সাল থেকে তিনি যখন আবার লিখতে আরম্ভ করেন, আগ্নেয়গিরির উত্তাপ তখন প্রায় স্তিমিত, অবশিষ্ট কেবল নারীজাগরণের আন্তরিক প্রয়াস।

রক্ষণশীল মনে হয় রোকেয়াকে, যখন তিনি বলেন, যতোদিন মেয়েদের জন্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততো দিন পাস–করা বিদ্যা না হলেও চলবে। শিক্ষয়িত্রী এবং স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকলে পর্দা মেনেও উচ্চশিক্ষা সম্ভব – এই উক্তিতেও একই রক্ষণশীলতা প্রতিফলিত। বোরকা প্রবন্ধে ১৯০৪ সালের প্রারম্ভে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় একটি মুসলিম পরিচালিত পত্রিকায়। সম্ভবত পর্দানশিন মুসলমান সমাজের মহিলাদের কথা মনে রেখেই তিনি এ মন্তব্য করে থাকবেন। এমনও হতে পারে পর্দা সম্পর্কে তাঁর পেছু টান তখনো বর্তমান। বস্তুত, এই প্রবন্ধে রোকেয়া বোরকা পরাকে যেভাবে সমর্থন করেছেন, তা তাঁর পরবর্তী মনোভাবের সঙ্গে অতুলনীয় নয়। কিঞ্চিদধিক কুড়ি বছর পরে অবরোধবাসিনী লিখে যিনি সুকঠোর পর্দা প্রথা এবং তার ব্যাপক অপকারিতার কথা সোচ্চার কণ্ঠে প্রচার করেন, এমন কি, সমকালেও পর্দাপ্রথার অমানবিকতা প্রতিপন্ন করেন, 'বোরকা' তাঁর রচনা বলে মনে হয় না।

তবে, ধারণা করি, তিনি বোরকা আর অবরোধে বিশেষ পার্থক্য করতেন। বোরকাকে তিনি ভদ্র অথবা শালীন পোশাকের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। বলেছেন, দেশভেদে সভ্যতাভেদে দেহকে কমবেশি আবৃত করে রাখার জন্যে বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ধরনের পোশাক প্রচলিত। কিন্তু নিজের দেহকে উপযুক্ত আবরণের দ্বারা ঢেকে রাখার রীতি সভ্যতার নিদর্শন। দেশের নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা, বিনা বাধায় এবং বিনা পর্দায় যাঁরা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, তিনি তাঁদের সভ্য বলে গণ্য করেননি। অনুমান করি, privacy এবং ব্যক্তিগত পর্দা সম্পর্কে তাঁর একটা রক্ষণশীলতা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিলো। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি এবং সভাসমিতিতে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বোরকা পরেই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। তবু বোরকা কোনো দিন তিনি ত্যাগ করেননি। বোরকা ছেড়ে দিলে তাঁর স্কুলে রক্ষণশীল মুসলমানরা তাঁদের কন্যাদের পাঠাবেন না, তাঁর মনে এ আশঙ্কা ছিলো, নিজেই তিনি এ কথা লিখেছেন।

যে পরিচয়কে একদিন তিনি সবচেয়ে বরণীয় বলে গণ্য করেছিলেন ধর্ম এবং প্রাদেশিকতার পরিবর্তে ভারতবর্ষীয়, পুনরুল্লেখের অভাবই তাকে প্রকট করে তোলে। ধারণা হতে পারে, তাঁর এ পরিচয়কেই তিনি শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে পারেননি। পদ্মরাগ উপন্যাসে একটা অসামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেলেও, তাঁর মুসলমান পরিচয়ই শেষ জীবনে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তখন মুসলমান শব্দের সমার্থক। একদা যিনি ধর্মীয় উৎসবের দিনেও হিন্দু ভাইদের ভুলে থাকতে পারেননি, বলেছেন, সমুদয় বাঙ্গালি এক বঙ্গের সন্তান; তাঁর পক্ষে নিজেকে কেবলমাত্র মুসলমান বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস সে জন্যেই বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

তবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে যে মানসিক ঔদার্যের কথা এক কালে তিনি বলেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত তাঁর আয়ত্তে ছিলো।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চার দশকে হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক দারুণ তিক্ত হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও, তিনি যে এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দানা বাঁধতে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে। উচ্চ অবস্থানে থাকা প্রতিবেশী হিন্দুদের তরফ থেকে সব সময়ে তিনি যে ব্যাপক সহায়তা অথবা স্বীকৃতি পেয়েছেন, তেমন কোনো প্রমাণ অন্তত আমার হাতে নেই। আমি তাঁকে নারীমুক্তি সম্পর্কিত একজন অসাধারণ লেখিকা বলেই বিবেচনা করি এবং সে দিক দিয়ে দেখলে সমকালে তাঁর কোনো তুলনা ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেকালের কোনো হিন্দু সাহিত্যিক অথবা সমালোচক কোথাও তাঁর উল্লেখ পর্যন্ত করেছিলেন, এমন নজির আমার জানা নেই। সে যাই হোক, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখলেও, স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি, সংস্কার – এসব তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়। এমন কি, খ্রিস্টানরা নানা কৌশলে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছেন – এ–ও তাঁর রচনার বিষয়ভুক্ত হয়েছে।

য়োরোপীয় আধুনিক চিন্তায় যিনি প্রভাবিত, তিনি এ কথাও বলেছেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়।' এ তাঁর কয়েক দশক আগেকার – সবই বেদে আছে – এই হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। তাঁর এই বিবর্তনের কারণ কী? আমার জানা নেই।

কিন্তু ধর্ম প্রসঙ্গে এ বিবর্তন সত্ত্বেও, এক জায়গায় তিনি অসামান্য বোধ হয় – বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আপনার সে পরিচয়কে তিনি পুরোপুরি ক্ষুণ্ন করতে পারেননি। কন্যা নন, স্ত্রী নন, মা নন, তিনি যে একজন ব্যক্তি, এ পরিচয় তাঁর মধ্যে অকম্পিত। দিনান্ত বেলায়ও ব্যক্তি হিশেবে বিকশিত হবার নারীর মৌল অধিকার সম্পর্কে তিনি সোচ্চার।

তবে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মনে বোধ হয় আগাগোড়াই একটু দ্বিধা ছিলো। ঐতিহ্যিক ভূমিকা এবং লিঙ্গনিরপেক্ষ ব্যক্তির ভূমিকা – এর মধ্যে সাধারণ নারীর জন্যে কোনটা আদর্শ – এ বিষয়ে তিনি সম্ভবত নিঃসংশয় হতে পারেননি। তাই সুশিক্ষিত হয়ে ঐতিহ্যিক ভূমিকা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার কথা তিনি একদিকে যেমন বলেছেন, তেমনি অন্য দিকে বলেছেন, ঘরের কাজ, রান্নাবান্না, সন্তানলালন ইত্যাদি তাঁদের প্রধান কাজ নয়। এমন কি, তাঁদের জীবন পতিদেবতার মনোরঞ্জনের জন্যে উৎসর্গিত হবার বস্তুও নয় অথবা বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিধান করে পুতুল সাজাতেও গৌরব নেই।

যথাসম্ভব ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ঐতিহ্যিক ভূমিকার সঙ্গে আপোশ – এমন কোনো সংশ্লেষণ তিনি করতে পেরেছিলেন কিনা, তারও কোনো স্পষ্ট ছবি তাঁর

রচনায় পরিস্ফুট নয়। অনুমান করি, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের মধ্যে আবাল্য লালিত বলে তার জাড্য কাটাতে পারেননি। তবে যে দ্রোহিতা তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিলো, তা তাঁকে সকল পেছুটান–নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের উন্মেষে উদ্‌বোধিত করেছে। বিবাহ সম্পর্কিত ইংল্যান্ডীয় আইন, বিবাহবিচ্ছেদে নারীর অধিকার, নারীর ভোটাধিকার, সমান কাজের জন্যে স্ত্রীপুরুষের সমান পারিশ্রমিক ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা ঐতিহ্যিক মূল্যবোধনিরপেক্ষ। অপর পক্ষে, গৃহিণী, মাতা, কন্যার চিরকালীন ভূমিকার উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে আদর্শ বিশেষণ জুড়ে দিয়ে তিনি যেন আকস্মিক সন্ধিতে সম্মত হন। ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ এবং মুক্তির মন্ত্র – এই দুয়ের টানাপোড়েন, বস্তুত, তাঁর শেষ দিকের রচনায় দুর্লক্ষ নয়। বহু আয়োজন, অনেক দ্রোহিতা শেষ পর্যন্ত যেন সমাজের প্রেক্ষিতে কিঞ্চিৎ প্রশমিত; এমন কি, ইসলামের নামে। অথচ একদিন ধর্মকে তিনি অলৌকিক বিশেষণ আরোপিত নারীশোষণের হাতিয়ার বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহ্যের কাছে এ তাঁর পরাজয় হয়তো নয়, এ হয়তো ব্যক্তিরই সীমাবদ্ধতা।[৯]

---

১ রোকেয়া একথা লিখেছিলেন নবনূর পত্রিকার পাতায় ১৯০৪ সালের আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে। ঐ বছর যখন প্রবন্ধটি মতীচূর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তখন এই অংশটিসহ পাঁচ প্যারাগ্রাফ বর্জিত হয়। তার বদলে রোকেয়া সাতটি নতুন প্যারাগ্রাফ লেখেন। বোঝা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরেই কেউ কেউ রোকেয়ার ধর্মবিরোধী মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু *মতীচূর* তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে। এটা সেকালের যে কোনো নারীর জন্যেই শ্লাঘার বিষয়। বোঝা যায় তাঁর গ্রন্থটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। এবং এই পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই রক্ষণশীল ধর্মমতের সঙ্গে রোকেয়ার মত যে মিলছে না, তা বলে থাকবেন।

২ মাজেদা সাবের, *রোকেয়ার উত্তরসূরি* (ঢাকা : আরডিআরএস বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ৩৮।

৩ ঐ, পৃ. ৩০।

৪ *History of Services of Gazetted and other Officers* (Calcutta : B. S. Press, 1896), p. 738; Quarterly Civil List, 1908.

৫ দ্রষ্টব্য : আমার লেখা *কালাপানির হাতছানি : বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* (ঢাকা : অবসর, ২০০৮), পৃ. ১১৩।

৬ সাখাওয়াত হোসেন চিকিৎসা ছুটি নেন ১৯০৮ সালের ১৩ জানুয়ারি আর মারা যান ১৯০৯ সালের মে মাসের ৩ তারিখ।

৭ লায়লা জামান সম্পাদিত *দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) গ্রন্থে ১৯১১ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৮ *Report on the Census of India, 1901*, Vol. VIA, pt. ii (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1902), p. 428, 431, 433.

৯ রোকেয়ার হাতের লেখা বাংলা চিঠিটির মূল প্রতিলিপি পেয়েছি মোশফেকা মাহমুদ রচিত *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬) থেকে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বেগম রোকেয়ার কয়েকটি চিঠি

রোকেয়া এ চিঠিগুলো লেখেন পাবনার মোহাম্মদ ইয়াসীনকে। ইনি ছিলেন একজন সিনিয়ার পুলিস ইনসপেক্টর। তিনি ১৯১৩ সালে সাঈদা নামে তাঁর একটি কন্যাকে বেগম রোকেয়ার স্কুলে ভর্তি করাতে চান। তখনো এই স্কুলের কোনো ছাত্রীনিবাস ছিলো না। অথচ এই কন্যাকে অন্য কোথাও রাখার মতো জায়গাও মোহাম্মদ ইয়াসীনের ছিলো না। পরের বছর রোকেয়া একজন মহিলার কথা জানান যিনি সাঈদাকে রাখতে রাজি হন। কিন্তু চিঠিগুলো থেকে বোঝা যায় না, শেষ পর্যন্ত এই মেয়েকে মোহাম্মদ ইয়াসীন সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে ভর্তি করাতে পেরেছিলেন কিনা। তবে ভর্তি করাতে পারুন অথবা নাই পারুন, বেগম রোকেয়ার সঙ্গে মোহাম্মদ ইয়াসীনের আন্তরিক বন্ধুতা জন্মে। এবং স্কুল পরিচালনার কাজে মোহাম্মদ ইয়াসীনের ওপর রোকেয়া কখনো কখনো নির্ভর করতেন। তার চেয়েও বড়ো কথা নিজের অনেক সমস্যার কথা এঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতেন এবং সান্ত্বনা চাইতেন। আরও লম্বা চিঠি লিখতে বলতেন।

এই চিঠিগুলো থেকে জানা যাচ্ছে, রোকেয়া তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কী রকমের বিরক্ত এবং তিক্ত ছিলেন। এই আত্মীয়-স্বজনরা যে রোকেয়াকে তাঁর ন্যায্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং তার ফলে রোকেয়া যে আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন—এই চিঠিগুলো থেকে এ যাবৎ অজানা এই তথ্যটিও জানা যায়। তবে তাঁর এই আত্মীয়-স্বজন কারা, তিনি কোথাও তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি যে এঁদের বিশ্বাস করতেন এবং সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেন, তা বোঝা যায়। আমার ধারণা, এঁরা রোকেয়ার স্বামীর আগের পক্ষের কন্যা এবং সেই কন্যার স্বামী।

এই প্রতিকূলতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ খবর জানা যায়, তাঁর সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা কী ছিলো, সে সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, আমি ভাগ্যহত এটা আমি মনে করবো না, যদি আমার স্কুল ঠিকমতো চলে আর আমার সাহিত্যিক অভিলাষকে আমি বিকশিত করতে পারি। এক কবিতা প্রতিযোগিতায় একটি কবিতা লিখে তিনি যে দেশী এবং ইংরেজ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে পুরস্কার পেয়েছিলেন, বেশ সন্তুষ্টির

সঙ্গেই সেটা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে গ্র্যাজুয়েট ছিলেন না, সে সম্পর্কে মনে কি তাঁর একটু ক্ষোভ এবং হীনমন্যতা ছিলো?

রোকেয়ার আর একটা তথ্য এই চিঠিগুলো থেকে জানা যাচ্ছে—সে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা। তিনি যে একাধিক বার দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তা আমরা তাঁর জবানি থেকে জানতে পারছি। রাঁচিতে বায়ু বদলের ফলেও খুব একটা উপকার পাননি।

স্কুল পরিচালনায় তাঁর যে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করতে হতো এবং ছাত্রীদের অভিভাবকরাও এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি যে এক-একজন সহৃদয় সহানুভূতিশীল ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর চিঠি থেকেই তা জানা যাচ্ছে—তাঁর স্কুলের সেক্রেটারি মি. আলি আহমদ এবং মোহাম্মদ ইয়াসীনকে তিনি সেই দুর্লভ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্কুলের ছাত্রীনিবাস শুরু করার জন্যে ১৮ মাস ধরে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, কয়েকজন ছাত্রী পাওয়ার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পর তার জন্যে বাড়ি নিলেন, আসবাবপত্র কিনলেন, কিন্তু সময় মতো সে ছাত্রীরা আর এলো না—এ ধরনের কোনো কোনো বিষয়ের বিস্তারিত খবর পাওয়া যায়, এসব চিঠি থেকে। আর জানা যায়, স্কুলের জন্যে প্রোস্পেক্টাস তৈরি করছেন, পাঠক্রম ছাপছেন, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করছেন—ইত্যাদি খবর। মাত্র ১০টি চিঠি, তবু তার মধ্য দিয়েই তাঁর মনের, ব্যক্তিগত জীবনের, সমস্যার, স্কুলের নানা খবর জানা যাচ্ছে। আমার ধারণা রোকেয়ার পূর্ণতর জীবনী রচনার জন্যে এ চিঠিগুলো খুব মূল্যবান দলিল হিশেবে বিবেচিত হবে।

১

Sakhawat Memorial Girls' School
13 Wallyulla's Lane
Calcutta the 8th Octr., 1912

Sir,

Many thanks for your kind letter dated the 14th inst., The money (Rs 10/-) reached me yesterday. Kindly let me know in whose name shall I put this sum in the account book.

As regards your girl, I shall be glad to take her charge. We have prepared a prospectus which we expect to get printed shortly. I shall send you a copy when it is ready for distribution.

Our boarding arrangement is not completed yet. Therefore you will have to wait for a month or two. At present only one girl is living with me; she is 8 years old.

I shall send you a formal receipt for the sum of Rs 10/-on hearing from you. Please accept my best thanks for your kind help. I wish there were a few more gentlemen like you, whom I could call friends of poor helpless women, who are no better than the animals kept imprisoned in a zoological garden!

Trusting this will find you in better health and good spirits; and with best salams.

Yours Truly
R.S. Hossein

Moulavi Md. Yasin Sahib
Patritala

Mr Yasin's note bellow : Replied with a promise of sending a balance of Rs 25/-as soon as possible.
M. Yasin 20.10.12

২

13, European Asylum Lane
Calcutta
10-9-13

Dear Sir,

Your letter of the 30th ultimo reached me in time. I am sorry I could not reply to you earlier.

You will agree with me that anything done in a large scale is done well. I have been advertising in the papers since 18 long months that I would try to keep boarders if I got applications from 15 girls. But the mufussil people kept silence. Then I prepared myself at least for 6 girls and subsequently removed to a bigger house—purchased some furniture such as iron beds (each costing Rs 20/-)—so on. Six months elapsed but no girl excepting one came. Now I repent the waste of the money which has been done in buying furniture. I wonder if my community will be answerable on the day of judgement for the waste of money I suffered for nothing!

No separate establishment can be made for a single girl; therefore the whole burdon of the girl falls on me—which I find too

Sakhawat Memorial Girls' School.

13, Wallyulla's Lane.

Calcutta, the 18th Octr. 1912.

Sir,

Many thanks for your kind letter dated the 14th inst. The money (Rs 10/-) reached me yesterday. Kindly let me know in whose name shall I put this sum in the account book.

As regards your girl, I shall be glad to take her charge. We have prepared a prospectus which we expect

Hoping this will find you & yours in good health & spirit. Can Zeenat smile now? She will have to learn many things!

Yours sincerely

R. S. Hossein.

Moulvi Md Yasin Sahib

Rajshahi

heavy. I am not intended (by God) for bringing up children : had I been so, God would have blessed me with my own.

Oh! the responsibility and trouble one suffers with a single girl! It makes one a regular "কাউয়া হাঁকানি"!!

However, every rule has its exceptions. At present there is a good friend living with me; she is looking after your daughter. She is just now urging me to ask you to send your girl here.

I hope you won't misunderstand me and would rather pity me. I believe you would be a sincere friend otherwise I won't have written all these things.

Hoping to be excused for any part of my letter which may displease you. There is not a single person, who is unfortunate like me.

More on hearing from you.

Yours sincerely
R.S. Hossein

৩

13, European Asylum Lane
Calcutta
10-9-13

Dear Sir,

Many thanks for you very kind letters, received yesterday. These letters worked like some medicine which I required for my soul. Sometimes we yarn to tell somebody of our sorrows and difficulties. I hope you will come to Calcutta soon. I would like to tell you some of my [page 3 missing]

page 3

1-10-13

I could not finish this letter yesterday, so I take up the writing again today. Fortune and misfortune are seldom in our hands, and not very often, as you say. Failure of a bank, for instance, can never be under

86-A, Lower Circular Road,
Calcutta

30 - 4 • 31.

পরম স্নেহাস্পদা মোনা,

করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গত বৎসর এমনই বকর ঈদের সময় নয়ন পুতুলি মোশতাক আমাদের ছেড়ে গেছে; এবার গেল নূরী।

নূরী যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলের কাছে মাফ চেয়ে গেছে। সকলকে আদাব লিখতে বলে গেছে।

ভগিনি! আমার আশা নৈরাশ্যের কথা আর কি বলব? — আমি ত জানিই যে —

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে?

× × × ×

ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়
তাপ দগ্ধ জীবনের অশ্রু বায় প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে!"

আহা! 'কোথা স্থিতি, কোথা স্থিতি কে জানে!" কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য মানুষ, তার আবার আশা ভরসা! সুতরাং যে কয় দিন বেঁচে আছি, খাই দাই — আরাম করি, হাসি খেলি, বাস! আর যদি পারি ত প্রাণ ভরে একটু আল্লাহ্ কে ডাকি। তা ছাই ডাকতেও ত পারি না। আমার মত দুর্ভাগিনী, অপদার্থ বোধ হয়, এ দুনিয়ায় আর একটা জন্মায় নি।

শৈশবে বাপের আদর পাই নি; বিবাহিত জীবনে [redacted] কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ urine পরীক্ষা

one's control, but at the same time the poor depositor has to suffer the consequence for no fault of his own. We may very well advise the depositor not to mind his loss! But who is to meet his unavoidable expenses? We cannot expect a hungry person to be satisfied and happy. Can you?

No, I am not unfortunate provided this school works well and I can achieve my literary talents. Only the other day I became very happy when I won the first prize in rhyme-competition, There were some undergraduates " graduates and above all some English lady graduates too among the lady competitors. I enclose herewith a copy of my composition, which...

৫

20-9-13

Dear Sir,

You are keeping silence : perhaps you did not like my last letter. But I expected sympathy from you.

Can you kindly remit me any sum whichever you may have realised by the sale of some books? I enclose herewith Messrs. S.K. Lahiri " Co's letter for your information. Please return it after perusal. They have been writing since 5 long years : and I cannot ask them to wait any more.

Hoping this will find you and your enjoying good health & prosperity.

Yours truly
R.S. Hossein

৬

11-3-14

Dear Sir,

I got your letter dated the 18th, yesterday evening. I am sorry you did not get last letter.

I am really very sorry to learn that you are not keeping well. Life is short, what is the use of pining over this & that? Human life dose not always find smooth paths, but still I think a gentleman of your

position need not be disheartened with life. After all, Life is a very valuable thing and should not be wasted for nothing.

It is a pity you feel so lonely. But I fear your selection was not correct in choosing an ill-fated person like me whose life has been "lost in misadventure", to write to.

Since two months I am suffering from some kind of fever—the fever is not much as the temp. never rises above 100 but I have become very weak. The weakness seems almost unbearable. I dread pen and paper; don't like even reading. I attend school with great difficulty : speaking to the girls tires me so much that many a time I let them have their own ways. I would very much like to write a nice letter to you, but unfortunately I am unable to do so now.

More after hearing from you. Let me assure you that your letters are always welcome; so please write to me as often as you please. It was very kind of you to select me out of your so many friends; I feel honoured—rather proud of it, though I fear I do not deserve it.

Yours very truly
R.S. Hossein

৭

19-4-14

My dear Sir,

I am so thankful to you for your very kind letters dated the 19th & 31 st March respectively. Your kind enquiries about me overjoyed me so much that I could not help addressing you as "my dear Sir" and I hope I did no wrong in doing so. You are such a good friend, may God bless you with a long life and prosperity. I am so helpless and friendless; even my nearest relatives are so heartless that they do not hesitate in trying to deprive me of my daily food! In this state of affairs friends like you and Mr Ahmed Ali (the Secretary of our School) are blessings of heaven.

Dear friend! Kindly pray to God to save me from my relatives.

Well, I must stop talking rubbish now. Our prize distribution has been postponed to the end of this month.

I do not get fever now but am dreadfully weak. I look 15 years older than my actual age! I will consult a lady doctor again tomorrow.

Yes, the Prize distribution of Suhrawardi Purdanashini (পর্দ্দানশিনী)

পরীক্ষা করেছি; পথ্য বেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম — তাদের ও প্রাণভরে কোলে নিতে পারি নি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত [redacted] বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি। সুতরাং দুঃখী আর আমাকে বেশী কি কাঁদাবে? সে ত বোবার ৫ বছর থাকার আশা মাত্র ছিল। আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুনছি।

শ্রীমান আমির ও হুমু ভাল আছে। আমি ও ভাল আছি। আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কুশল কামনা করি। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, তাতেই আমার সুখ।

শ্রীমান দুলা মিয়াঁকে দোয়া জানাই। তাঁকে আর স্বতন্ত্র চিঠি লিখতে পারলেম না। এই খানাই তাঁকে দেখাইও। শ্রীমতী নুরুর গালে একটি মিঠা চুমো দিয়ে বল যে তার খালা কলকাতা থেকে ঐ চুমো তার জন্য পাঠিয়েছেন।

দোয়া ইতি।

তোমার স্নেহের —

আশা।

Madrassa is over. Have you read all the correspondence and note in the "Mussalman" and "Comrade"?

Yes, God is sufficient for those only, who know how to rely on Him. The difficulty is, that we do not know how to stick to Him. In my opinion I won't care for anything else even if God were not sufficient!

The person about whose death Taifur & Baizid wrote to me was a first...

৮

First 2 pages missing

so I did not miss my former teacher. This is all I know about her.

Thank God, our Prize distribution is successfully over. You will certainly get a copy of the report in due course.

Your letter is neither long nor tiring. I wish it was a little longer.

My feelings towards my relations are very bitter. Fancy they cheated & robbed me when I trusted them blindly. I am thankful that I have no children. I can't forget this amount of money & hope God will not forgive them! They know very well my financial condition, they know too that I am unable to earn a single pice! If God be true, I shall get back the money.

With kindest regards.

Very sincerely yours
R.S. Hossein

৯

86A, Lr. Circular Road
Calcutta
23-7.15

Dear Sir,

I own you some apology for not replying to your kind letter earlier. I thought you would be in Calcutta soon & that I should get an opportunity of telling you everything in detail.

I sent a copy of our Annual Report & Syllabus for your kind perusal. It took a long time & botheration to get the Report printed. I hope one will excuse this unnecessary delay remembering

that we are Mohamedans and the job was done by a Mohamedan Press!

I cannot understand why you want to resign your post. Do you find the dept. very wicked? This world as a whole is wicked but the presence of some people like you is necessary to make oasis in this desert.

Hoping this will find you & yours in good health & spirit.

Can Zeenat smile now? She will have to learn many things!

Sincerely yours
R.S. Hossein

১০

Sakhawat Memorial Girls' School
86A, Lower Circular Road
Calcutta, the 14th Septr, 1919.

Dear Sir,

I am in receipt of your kind letter dated the 7th inst. I am extremely sorry that I could not sent you a letter of consolation on receipt of you last letter received in April. I am ashamed of myself.

I think your daughter Saeeda is about 15 now. How fast the time passes! It was only the other day you were trying to put her in this school!

As I do not understand any refined riddle of religion I had better... ... ... that matter. My late husband advised me not to discuss religion with anybody.

I had been very ill lately. During summer vacation, I went to Ranchi for a change. I am still ailing but strong enough to go on with my daily routine work.

The school is not flourishing to my full satisfaction. The guardians of the students do not co-operate fully with me.

With blessings to your children—poor motherless children!

Yours sincerely
R.S. Hossein

নির্বাচিত নির্ঘণ্ট

ভ

ম

য

র